



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাস্থ্যখন সংস্কার কমিশন

প্রতিবেদন

এপ্রিল ২০২৫



Date 01/08/2024

মা, আমি মিছিলে যাচ্ছি। আমি নিজেকে আব আর্টিকিল্যু
যুগ্মত পাবলাম না, মৃত্যি আবুজান। তোমার কথা অমান্ড
কেবে যের হোলাম। স্বার্থপত্রে গতো ছাত্র তোমে থাকত
দাবলাম না, আমাদের তাই বুং আমাদের ডিষ্ট্রিভ প্রজন্মের
জন্য ক্ষেত্রে কাপড় মাহায় যেখে শাজপাথে নেমে সংগ্রাম
কেবে যাচ্ছি। অবগতবে নিষ্ঠারে জীবন বিবর্জন মিছু, একটি
প্রতিবন্ধি কিঞ্জির, ৭ বছরের লিটু, ল্যান্ড মানুষ ঘানি সংগ্রাম
নামতে পাবে, তাহলে আমি তেনা তোমে থাকতো ঘড়ি। একদিন
তা মুরতে হবেই, তাই মৃত্যুর ডয় কেবে স্বার্থপত্রে গতো দ্বারে
তোমে না থেকে সংগ্রামে নেমে গুলি খেয়ে ফীরেব মতো মৃত্যুও
অধিক গ্রেচ, যে অন্যের জন্য নিজের জীবনকে বিলিয়ে দ্বয়
মৰ্হ প্রকৃত মানুষ। আমি যদি এচে না ফিরিবি তবে কৰ্ষ না
দায়ে সর্বিত হয়ো, জীবনের প্রতিটি ঝুলেব জন্য জ্ঞান চার্ষ।

আনাম

Apetiz

উৎসর্গ

চবিশের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে প্রাণ উৎসর্গকারী জুলাই শহিদ আনাসসহ
অন্যান্য জুলাই শহিদ ও অসম সাহসী জুলাই যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে এই প্রতিবেদনটি
আমরা উৎসর্গ করছি।

* পূর্বের পৃষ্ঠার চিঠিটি চবিশের জুলাই-আগস্টের
গণঅভ্যুত্থানে নিহত শহিদ আনাসের মায়ের কাছে লেখা শেষ চিঠি।

প্রকাশক

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

প্রচ্ছদ

চৰিষের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে ব্যবহৃত গ্রাফিতি চিত্র আলোকে

মুদ্রণ সমষ্টয়

মহাপরিচালক, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

বর্ণ বিন্যাস

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

বাঁধাই

বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস)

মুদ্রণ

বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস)

মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

* এই বইয়ের কোনো কপিরাইট নেই। যে কেউ
কোনোরকম পরিবর্তন/পরিমার্জন/পরিবর্ধন ছাড়া
প্রতিবেদনের মূল লেখা প্রকাশ ও বিতরণ করতে পারেন।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা মহোদয়ের শুভেচ্ছা বাতা

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের ছাত্রজনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ একটি ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান ঘটিয়েছে। এই আনন্দের সাফল্য লাভ করেছে এক অভ্যন্তরীণ জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠার মাধ্যমে। এই অভ্যুত্থানের একটি অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে দেশে এমন এক শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেখানে সকলের অধিকার সুনির্ণিত হবে, কোনও ব্যক্তি বা দল দেশের মানুষের জীবন ও দেশের সম্পদ নিয়ে ছিনমিনি খেলতে পারবে না, সকলের ভোট দেবার অধিকার আর কোনও দিন লুণ্ঠিত হবে না এবং নাগরিকদের সম্মতিতে দেশ পরিচালনার এই পদ্ধতি তৈরি করতে হলে দরকার বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার।

জুলাই ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের বীর শহিদরা, যাঁরা আহত হয়েছেন তাঁরা তাঁদের আত্মানের মধ্য দিয়ে এই সংস্কারের দায়িত্ব আমাদের সকলের ওপরে অর্পণ করেছেন। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ১১টি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে। এইসব কমিশনের সদস্যরা নিরলস পরিশ্রম করে সংস্কারের সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করছেন। কমিশনগুলোর এইসব প্রতিবেদন মূল্যবান সম্পদ। এই সম্পদ বাংলাদেশের ইতিহাসে রক্ষিত হবে। এখান থেকে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে কতটুকু গ্রহণ করবো, কোনটা কখন কাজে লাগাতে পারব, কিভাবে অগ্রসর হবো তা নির্ধারণের জন্য দরকার দেশের সব মানুষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা। সে আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রথম পর্যায়ে গঠিত ৬টি সংস্কার কমিশন সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, দুর্নীতি দমন কমিশন, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে গঠিত ৫টি সংস্কার কমিশন গণমাধ্যম, নারী বিষয়ক, স্থানীয় সরকার, শ্রম এবং স্বাস্থ্যক্ষাত সংস্কার বিষয়ক কমিশনগুলোর প্রতিবেদনসমূহ প্রকাশ করা হল।

জুলাই অভ্যুত্থানে যাঁরা আত্মাহতি দিয়েছেন, তাঁদের স্বপ্ন ছিল একটা নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলা। এ-দায়িত্ব পালনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এই সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়েছে। এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ গড়ে উঠবে। এখন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং তা বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হতে হবে। আমাদের এই বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দ্রুত এবং মসৃণ হোক এই কামনা করে এই সুপারিশমালা দেশবাসীর নিকট তুলে দিলাম।



প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনুস

প্রধান উপদেষ্টা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাননীয় কমিশন প্রধানের ভূমিকা

স্বাধীনতার পরবর্তী দশকগুলোতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা খাতে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা (Universal Health Coverage বা UHC) অর্জনে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে রয়েছে। দেশে মানুষের গড় আয় বেড়েছে, মাত্র ও শিশুমৃত্যু হ্রাস পেয়েছে এবং সংক্রামক রোগের প্রকোপ ও বিস্তার কমেছে তবে এর বিপরীতে অসংক্রামক রোগ এখন প্রাধান্য বিস্তার করছে।

স্বাস্থ্য সেবার অপ্রতুলতা, দুর্বল মান এবং শ্রেণি, গোষ্ঠী, অঞ্চল ও লিঙ্গভেদে ব্যাপক বৈষম্য দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় প্রকট সংকট তৈরি করেছে। এতে অনেক মানুষকে চিকিৎসার জন্য ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে, এমনকি বিদেশেও যেতে হচ্ছে। আবার অন্যদিকে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিবর্তে বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার অনিয়ন্ত্রিত এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক বিকাশ ঘটেছে যেখানে, সেবার মান ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ একটি চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি করেছে।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এই সমস্যাগুলোর অন্তরালে রয়েছে সুশাসনের অভাব, যেমন অপ্রতুল সরকারি বরাদ্দ ও বিনিয়োগ, অপর্যাপ্ত জনবল এবং অনিয়ন্ত্রিত দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা। উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে, ২০২৪-এ ছাত্র-জনতার জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যন্তরের মূল চেতনার স্তৰে ধরে, বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন গঠন করে। সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী এ কমিশনের মূল উদ্দেশ্য হলো স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে জনমুখি, সহজলভ্য ও সর্বজনীন করা।

উপরোক্ত উদ্দেশ্য সামনে রেখে প্রায় চার মাস ধরে কমিশনের সদস্যগণ তাদের সম্মিলিত চিষ্টা-ভাবনা ও মতামতের প্রতিফলন হিসেবে বর্তমান প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করেছেন। কমিশন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, জবাবদিহিমূলক এবং টেকসই স্বাস্থ্যব্যবস্থার রূপরেখা তৈরি করতে কাজ করেছে। এই প্রক্রিয়ায় কমিশন এদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, এবং সেবাগ্রহণকারী বিবিধ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে মত বিনিয়োগ করেছে। উল্লেখ্য যে, এ সংস্কারের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে স্বাস্থ্যের জৈবিক নিয়ামকগুলোর বাইরেও সামাজিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক, জলবায়ু ও প্রযুক্তিগত নিয়ামকগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করা হয়েছে এবং কমিশন প্রথাগত স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও অংশীজনদের বাইরেও সরকারি-বেসরকারি নানান প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করেছে। পরামর্শগুলোর পর্যালোচনায় ‘হেলথ ইন অল পলিসি’ ও ‘ওয়ান হেলথ পলিসি’- র সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনে চারটি কৌশলগত অগ্রাধিকারকে ভিত্তি করে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে: প্রাথমিক সেবা শক্তিশালীকরণ, সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা (UHC) অর্জন, প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ। রোগী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সন্তুষ্টি, আন্তর্জাতিক মানসম্মত চিকিৎসা শিক্ষা এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর সেবার মাধ্যমে দেশে বিশ্বস্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলার রূপরেখা এই প্রতিবেদনের মূল উপজীব্য।

বাংলাদেশের সরকারি-বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও জনবল সৃষ্টি কার্যক্রম নানান কারণে কিছুটা অসংলগ্ন। এই কার্যক্রমগুলো অপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের অধীনে ছড়িয়ে থাকায় উপরোক্ত নীতিমালার বাস্তবায়নে, একটি একক নীতি নির্ধারক ও সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে এবং কমিশন কর্তৃক এ বিষয়ে সুস্পষ্ট সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া প্রথাগত ব্যবস্থার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী ও বিশেষজ্ঞদের দ্বারা স্বাস্থ্য-পুষ্টি-জনসংখ্যা বিষয়ক নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন এ সংস্কার প্রস্তাবনার একটি প্রধান বিষয়। স্বাস্থ্য সেবায় কাঞ্চিত উন্নয়নের প্রধানতম বিষয় হিসেবে সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কাঠামোবদ্ধ রেফারেল পদ্ধতির দ্বারা রোগীর সেবার মাধ্যমে সেকেন্ডারি ও উচ্চতর ক্লিনিক্যাল সেবা প্রদানের ব্যবস্থাকে কমিশন বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে।

এই প্রতিবেদন প্রণয়নে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার উদ্যোগ এবং মাননীয় স্বাস্থ্য উপদেষ্টা, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ সহকারী ও সকল অংশীজনের সুচিত্তি তথ্যাদি ও পরামর্শ এই কমিশন কৃতজ্ঞ চিঠ্ঠে স্বীকার করছে। সকলের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াস ও পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়িত হবে - এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছি। সেই সঙ্গে এই প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়নে কোনো সহায়তার প্রয়োজন হলে কমিশনের সদস্যগণ সানন্দে অংশগ্রহণের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করছে।



জাতীয় অধ্যাপক ডা. এ কে আজাদ খান

কমিশন প্রধান
স্বাস্থ্যখাত সংকার কমিশন
এবং সভাপতি,
বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি

স্বাস্থ্যখন সংস্কার কমিশন - সদস্যবৃন্দ

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ডক্টর আবু মোহাম্মদ জাকির হোসেন

সদস্য, এবং

সভাপতি, কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট

প্রফেসর লিয়াকত আলী

সদস্য, এবং

চেয়ারম্যান, পথিকৃৎ ফাউন্ডেশন

প্রফেসর ডাঃ সায়েবা আক্তার

সদস্য, এবং

গাইনোকলজিস্ট

প্রফেসর ডাঃ নায়লা জামান খান

সদস্য, এবং

শিশু স্নায়ুতন্ত্র বিভাগ

এম এম রেজা

সদস্য, এবং

সাবেক সচিব

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মোজাহেরুল হক

সদস্য, এবং

সাবেক আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অধ্যক্ষ),
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

ডাঃ আজহারুল ইসলাম খান

সদস্য, এবং

কনসালট্যান্ট, আইসিডিআরবি

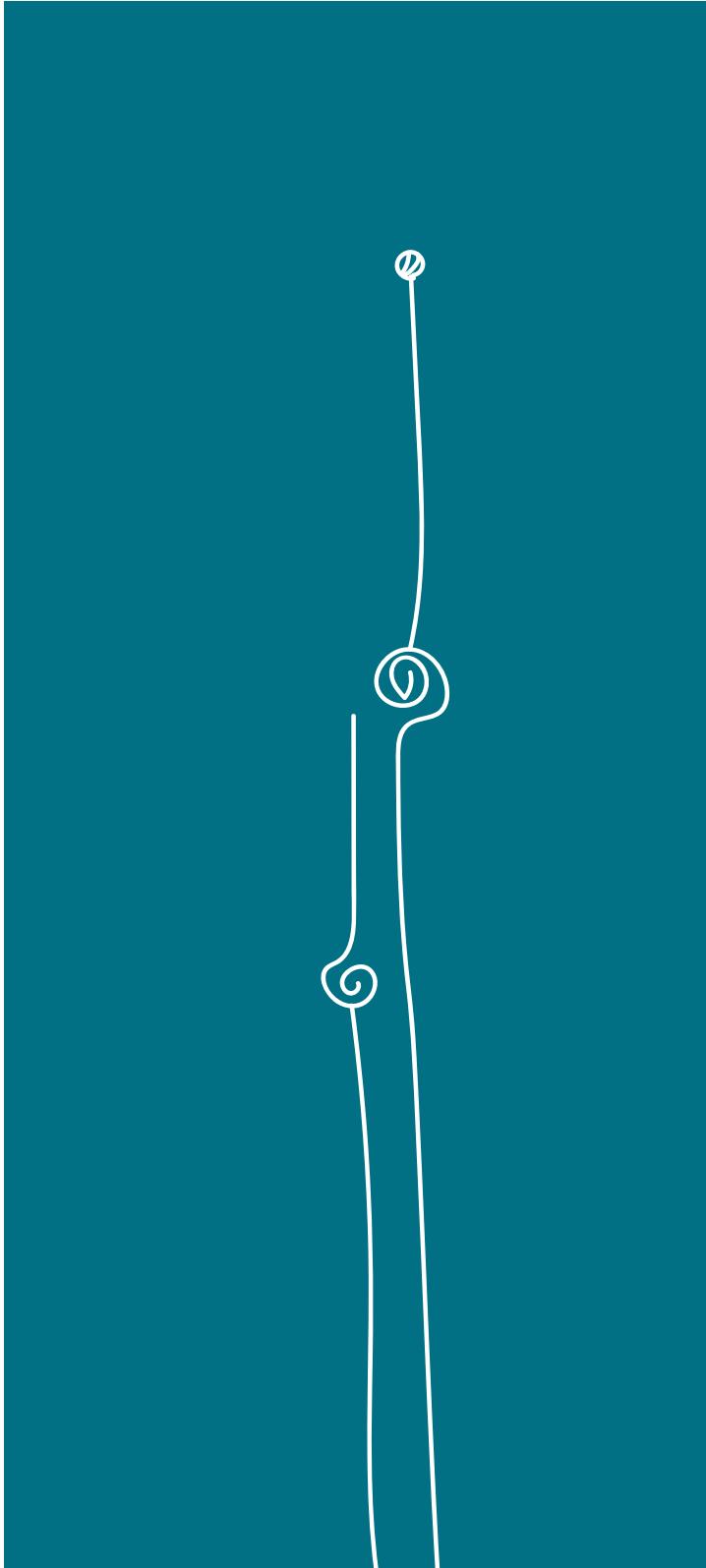
স্বাস্থ্যখন সংস্কার কমিশন - সদস্যবৃন্দ

অধ্যাপক ড. সৈয়দ মো: আকরাম হোসেন
সদস্য, এবং
ক্ষয়ার ক্যান্সার সেন্টার, ক্ষয়ার হাসপাতাল

প্রফেসর ডা. সৈয়দ আতিকুল হক
সদস্য, এবং
চিফ কনসালটেন্ট, গ্রীন লাইফ সেন্টার ফর রিউম্যাটিক কেয়ার
অ্যান্ড রিসার্চ

ড. আহমদ এহসানুর রহমান
সদস্য, এবং
বিজ্ঞানী, আইসিডিআর, বি

উমাইর আফিফ
সদস্য, এবং
শিক্ষার্থী, ৫ম বর্ষ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ



স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন প্রতিবেদনের একটি সংক্ষিপ্ত সংক্রান্ত

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা মহোদয়ের শুভেচ্ছা বার্তা	v
মাননীয় কমিশন প্রধানের ভূমিকা	vii
আদ্যাক্ষর ও শব্দ সংক্ষেপ	xv
নির্বাহী সারসংক্ষেপ	১-১০
মুখ্য সুপারিশসমূহ	১১-৭৯
পরিচ্ছেদ ১ : ভূমিকা	২৩
পরিচ্ছেদ ২ : পদ্ধতি	২৪-২৬
পরিচ্ছেদ ৩ : স্বাস্থ্য সেবাদান ও ভৌত অবকাঠামো	২৭-৩৫
পরিচ্ছেদ ৪ : নেতৃত্ব, সুশাসন ও কর্মসংস্কৃতি	৩৬-৪৭
পরিচ্ছেদ ৫ : স্বাস্থ্য জনবল ব্যবস্থাপনা	৪৮-৫০
পরিচ্ছেদ ৬ : স্বাস্থ্য জনবলের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ	৫১-৫৩
পরিচ্ছেদ ৭ : অত্যাবশ্যকীয় ঔষধপত্র, চিকিৎসা প্রযুক্তি ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ	৫৪-৫৮
পরিচ্ছেদ ৮ : স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা	৫৯-৬১
পরিচ্ছেদ ৯ : স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়ন	৬৩-৭৭
পরিচ্ছেদ ১০ : স্বাস্থ্যব্যবস্থার রূপান্তর ও উন্নয়ন পরিকল্পনা	৭৮-৭৯

আদ্যাক্ষর ও শব্দ সংক্ষেপ

API	Active Pharmaceutical Ingredient	HTA	Health Technology Assessment
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics	ICMH	Institute of Maternal and Child Health
BCGP	Bangladesh College of General Practitioners	IEDCR	Institute of Epidemiology, Disease Control and Research
BCPS	Bangladesh College of Physicians and Surgeons	IPH	Institute of Public Health
BDHS	Bangladesh Demographic and Health Survey	IPHN	Institute of Public Health Nutrition
BHC	Bangladesh Health Commission	mHealth	Mobile Health
BHCI	Bangladesh Health Care Improvement	MICS	Multiple Indicators Cluster Survey
BHFS	Bangladesh Health Facility Survey	MOHFW	Ministry of Health and Family Welfare
BHS	Bangladesh Health Services	MRP	Maximum Retail Price
BICE	Bangladesh Institute of Health Care Excellence	NDN	National Diagnostic Network
BMDC	Bangladesh Medical and Dental Council	NEMEW	National Electromedical Equipment Workshop
BMEAC	Bangladesh Medical Education Accreditation Council	NICVD	National Institute of Cardiovascular Diseases
BMMS	Bangladesh Maternal Mortality Survey	NIKDU	National Institute of Kidney Diseases and Urology
BMRC	Bangladesh Medical Research Council	NIMH	National Institute of Mental Health
BNMWC	Bangladesh Nursing and Midwifery Council	NILMRC	National Institute of Laboratory Medicine and Referral Centre
BUHS	Bangladesh Urban Health Survey	NIPORT	National Institute of Population Research and Training
CASH	Centre for Advanced Specialized Healthcare	NIPSON	National Institute of Preventive and Social Medicine
DGDA	Director General of Drug Administration	NINS	National Institute of Neurosciences
DGFP	Director General of Family Planning	NITOR	National Institute of Orthopedics, Traumatology and Rehabilitation
DGHS	Director General of Health Services	OOP	Out-of-Pocket Expenditure
DHIS	District Health Information System	OTC	Over the Counter
DGME	Director General of Medical Education	PPP	Public-Private Partnership
EDCL	Essential Drugs Company Limited	PFM	Public Financial Management
eMIS	Electronic Medical Information System	RDI	Research, Development and Innovation
eLMIS	Electronic Laboratory Management Information System	RTC	Regional Training Centre
EML	Essential Medicine List	SCMP	Supply Chain Management Portal
FDA	Food and Development Agency	SDOH	Social Determinants of Health
FWVTI	Family Welfare Visitor Training Institute	SHI	Social Health Insurance
GMP	Good Manufacturing Practice	SVRS	Sample Vital Registration System
HED	Health Engineering Department	TRIPS	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
HRIS	Human Resource Information System	UHC	Universal Health Coverage
HiAP	Health in All Policies	WFME	World Federation for Medical Education
HSRC	Health Sector Reform Commission	WHO	World Health Organization

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

ক) ভূমিকা

স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে অনেক প্রশংসনীয় অগ্রগতি হয়েছে। মূলত টিকাদান, পুষ্টি, মা-শিশু স্বাস্থ্য, সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। একই সাথে নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা ইত্যাদি সহায়ক কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাস্থ্যক্ষেত্রের বিভিন্ন সূচকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে দেশের সংবিধান এবং বিভিন্ন জাতীয় নীতিমালা ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার অনুসারে (বিশেষত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি) সকল নাগরিকের জন্য সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করতে বাংলাদেশ প্রতিশুতুরিবদ্ধ। তবে অগ্রগতির ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিগত বছরগুলিতে স্বাস্থ্য খাতে এ দেশের অগ্রগতি শুধু হয়েছে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পুরোপুরি থেমে গেছে কিংবা পশ্চাদমুখী হয়েছে। ফলে প্রতিশুতুর সময়ের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্য অর্জন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ এখনো একটি ন্যায় (equitable), মানবিক ও টেকসই স্বাস্থ্যব্যবস্থা গঠনের পথে দৃশ্যমান বাধাগুলোকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, ক্যানসারসহ অসংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি, মানসিক স্বাস্থ্যসেবার ঘাটতি, জরুরী চিকিৎসা ও মানসম্মত সেবার অপ্রতুলতা, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং স্বাস্থ্যসেবা গ্রহনে ব্যক্তি-পর্যায়ে খরচ জনগণের ওপর তীব্র চাপ তৈরি করছে। পাশাপাশি দুর্নীতি, সক্ষমতার ঘাটতি, ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা এবং চিকিৎসা শিক্ষায় নিম্নমান ভবিষ্যতের জন্য একটি গুরুতর হমকি হয়ে উঠেছে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশ স্বাস্থ্যখাতে আজ এক জটিল বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছে।

জুলাই ২৪-এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্যখাতকে জনমুখী, সহজলভ্য ও সর্বজনীন করার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার স্বাস্থ্যখাত সংস্কার করিশন গঠন করেছে। এ সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য করিশন নিয়লিখিত বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করেছে: ১) একটি ন্যায় ও অধিকার-নির্ভর সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলা; ২) প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামো ও জনবল শক্তিশালী করা; ৩) জরুরী চিকিৎসা সেবার উন্নয়ন, ৪) স্বাস্থ্যব্যবস্থায় সুশাসন, আর্থিক স্বচ্ছতা ও দুর্নীতির প্রতি শূন্য সহনশীলতা নীতি প্রবর্তন; ৫) মানসম্পন্ন চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রযুক্তিনির্ভর চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধি; ৬) জনসাধারণের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনতে রোগী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সমুষ্টি এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; এবং ৭) স্বাস্থ্যসেবা গ্রহনে ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যয় উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিয়ে নিয়ে আসা।

এই প্রতিবেদন তৈরির কাজটি একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয় ছিল, যেখানে দীর্ঘ দিনের দুর্নীতি, অনিয়ম, পক্ষপাত, রাজনীতি প্রভাবিত কর্মকাণ্ড, অযোগ্য লোকদের নিয়োগ এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পরিসংখ্যান ও বিকৃত তথ্য পুরো স্বাস্থ্যখাতের ক্ষতি করেছে। এসব চ্যালেঞ্জিং দিক তথ্য সংগ্রহে বড় বাধা সৃষ্টি করেছে। প্রচলিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করিশন তথ্য সংগ্রহের ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছে।

খ) পদ্ধতি

এই প্রতিবেদন প্রণয়নে একটি বহুমাত্রিক ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে তথ্য-প্রয়াণ ভিত্তিক বিশ্লেষণ, অংশীজনের মতামত এবং নীতিনির্ধারণে প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

একটি বহুমাত্রিক ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে এই প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণী প্রাসঙ্গিক বিবিধ তথ্য-উপাত্ত, অংশীজনের মতামত, জরিপ থেকে প্রাপ্ত জনমত এবং সরেজমিন পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য ও মতামত বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্যখাত সংস্কার করিশন বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুপারিশ প্রণয়নে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেছে। প্রথমত, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা, গবেষণা, কৌশলপত্র এবং গাইডলাইনগুলির পর্যালোচনা করা হয়, যাতে থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাজ্যসহ সফল দেশগুলোর অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে প্রমাণিতিক সুপারিশ তৈরি করা যায়। এছাড়া, করিশনের কার্যালয়ে নীতি প্রণয়ন, গবেষণা, সাংবাদিকতা এবং সামাজিক কর্মকাণ্ড সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা করা হয়, যাতে তারা তাদের মতামত এবং পরামর্শ প্রদান করতে পারে। মাঠপর্যায়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়, যেখানে প্রাসঙ্গিক মতামত সংগ্রহ করা হয়। তথ্য সংগ্রহের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি উৎস থেকে বিশ্লেষণ করা হয় এবং এভাবে অসংক্রামক রোগ, মাতৃস্থুত্য, স্বাস্থ্য ব্যয় ইত্যাদি বিষয়ে গভীর ধারণা লাভ করা হয়। এছাড়া, বিশেষ করে দুর্গম এবং অবহেলিত অঞ্চলের স্বাস্থ্যকর্মী ও সেবাগ্রহীতাদের মতামত সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শনও পরিচালিত হয়।

এছাড়া, জনমত জরিপের মাধ্যমে দেশের আটটি বিভাগে ৩৪৪টি নমুনা এলাকায় প্রায় ৮,২৫৬ জন নাগরিকের মতামত সংগ্রহ করা হয়। জরিপের ফলাফল অনুযায়ী, ৯৭% মানুষ মনে করেন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিনামূল্যে হওয়া উচিত, এবং ৯৫%-৯৭% উত্তরদাতা ঔষধ, পরিষ্কা ও চিকিৎসার ফি নির্ধারণের পক্ষে। ৭২% উত্তরদাতা চিকিৎসা, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য আলাদা কাঠামো চান এবং ৬৮% মনে করেন এমবিবিএস ছাড়া অন্য কেউ অ্যান্টিবায়োটিক না লিখুক। ৯২% মানুষের মত, সরকারকে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বহনে ভূমিকা পালন করা উচিত এবং ৭৯% স্বাস্থ্যহানিকর পণ্যে কর আরোপের পক্ষে। আরও, ৭১% নাগরিক স্বাস্থ্যবীমায় আগ্রহী এবং ৬৭% সেবা একীভূত করার পক্ষে। এই জরিপের ফলাফলগুলো কমিশনের সুপারিশ তৈরির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

গ) পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং চ্যালেঞ্জসমূহ :

১) স্বাস্থ্য সেবাদান ও অবকাঠামো

বাংলাদেশের সরকারি স্বাস্থ্য খাতে মোট অনুমোদিত ২,৩৬,৮২৮টি পদের মধ্যে কর্মরত আছেন ১,৭৩,২৬১ জন, ফলে ৬৩,৫৭১টি পদ (প্রায় ২৭%) শূন্য রয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় এই শূন্যতার হার কিছু শ্রেণির ক্ষেত্রে ৪০% পর্যন্ত। শহরাঞ্চলেও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার অবকাঠামো দুর্বল। ২০২২ সালে প্রতি ১০ হাজারে সেবাদানকারী ছিলেন মাত্র ১১.৭ জন, যেখানে ২০২৫ ও ২০৩০ সালের লক্ষ্য যথাক্রমে ৩১.৫ ও ৪৪.৫ জন। চিকিৎসক ঘাটিতি প্রকট—সাধারণ চিকিৎসকে ২৫% এবং বিশেষজ্ঞে ৫৮% ঘাটিতি। শহরে ১,৫০০ জনে একজন চিকিৎসক থাকলেও গ্রামে তা ১৫,০০০ জনে একজন। এসবের পেছনে রয়েছে নিয়োগের জটিলতা, স্বচ্ছতার অভাব ও পদোন্নতিতে স্থুরিতা, যার ফলে সেবার মান কমছে এবং গ্রামীণ জনগণ স্বাস্থ্যসেবা থেকে বাস্তিত হচ্ছে।

স্বাস্থ্য সেবা অবকাঠামো: বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সুদৃঢ় স্বাস্থ্য অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। দেশের প্রতিটি বিভাগের একটি করে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের পরিচালকের দপ্তর রয়েছে। এর পাশাপাশি, ৬৪টি জেলা সদর হাসপাতাল, ৪৩২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ১,৩৬২টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্র, এবং ৩,২৯১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর পরিচালিত ২৮৮টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মধ্যে ১৬২টি ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত। এসব কেন্দ্রগুলো বর্তমানে ১০ শয্যা বিশিষ্ট হলেও ক্রমাগত ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হচ্ছে। তবে, এসব প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে রোগীকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বা জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মোট কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ৫৫,০০০, এর মধ্যে ৬০৩ পদ সাধারণ ক্যাডারে, যার মধ্যে ৩৩০ জন কর্মরত আছেন, এবং ১,১২০টি পদ টেকনিক্যাল ক্যাডারে রয়েছে।

স্বাস্থ্য সেবায় প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ: স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলো প্রায়ই প্রশাসনিক কর্মকর্তারা নেন, যারা সরাসরি চিকিৎসা পেশায় অভিজ্ঞ নন। এর ফলে, সিদ্ধান্তগুলো যথাযথ অগ্রগণ্যতা এবং সময়ের পর্যাপ্ত বিচার থেকে বিচ্যুত হতে পারে। তাছাড়া, বেসরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানে লাভের দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়া হয় এবং তাদের তদারকি করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যথেষ্ট সক্ষমতা নেই। সরকারি হাসপাতালগুলোর সেবার মান নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা রয়েছে, যেখানে উন্নত সেবা প্রদানে এক্রেডিটেশন (স্বীকৃতি পদ্ধতি) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও এটি দেশে কম পরিচিত। এক্রেডিটেশন পদ্ধতি ব্যবহার করে সেবা মান উন্নয়ন করা পৃথিবীজুড়ে ব্যবহৃত প্রমাণিত পদ্ধতি হলেও আমাদের দেশে তা অপর্যাপ্ত।

স্বাস্থ্যসেবায় সমস্যাসমূহ: বাংলাদেশে বর্তমানে স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতা, সহজলভ্যতা, সমানুপাতিকতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করা হয়নি। মানুষজনের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞান কম, যার ফলে অনেক সময় সেবা গ্রহণে সমস্যা সৃষ্টি হয়। অতীতে, সেবা ব্যবস্থাপনায় যে দুর্বলতাগুলো দেখা গেছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে অবকাঠামোগত দ্বৈততা, ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা, উপকরণের অভাব, ঔষধের উচ্চমূল্য, ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সেবা প্রদানকারীদের পরিপূর্ণ আগ্রানিয়োগের অভাব। এছাড়া, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা না থাকায় সেবার মানের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। স্বাস্থ্য প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা, কর্মচারীদের মধ্যে পদ শূন্যতা, এবং রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষাগারের দুর্বলতা এমন কিছু বিষয়, যা সেবা ব্যবস্থাকে আরও কঠিন করে তুলেছে।

স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বড় সমস্যা: বাংলাদেশের প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা এখন মূলত অসংক্রামক রোগভিত্তিক। দেশে প্রতিবছর প্রায় ৬৭% মৃত্যু ঘটে অসংক্রামক রোগের কারণে, যেমন স্ট্রোক, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, ক্যাল্সার, মানসিক সমস্যা, স্তুলতা এবং শাস্তিতের দীর্ঘমেয়াদি রোগ। আরও কিছু স্বাস্থ্য সমস্যা রয়েছে, যেমন সড়ক দুর্ঘটনা, শারীরিক অক্ষমতা, এবং অস্ত্রোপচার পরবর্তী পুনর্বাসনের অসুবিধা। যদিও কিছু সংক্রামক রোগ এখনও প্রভাব ফেলছে, তবে সেগুলোর মাত্রা কমে এসেছে। ক্যাপ্সার রোগের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রায় প্রতিটি পরিবারে ক্যাপ্সার রোগী রয়েছে। রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দেরি হওয়া এবং স্ক্রীনিং বা পর্যবেক্ষণের অভাব পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছে। তবে, ক্যাপ্সারের প্রকৃত চিত্র জানার জন্য দেশের মধ্যে কোন নির্ভুল রেজিস্ট্রি নেই, যা সঠিক পরিকল্পনা ও প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করছে।

বিভিন্ন দেশে চিকিৎসার জন্য রোগীদের যাওয়া: বাংলাদেশি রোগীরা প্রতি বছর চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাতায়াত করে। আনুমানিক ৮ লাখ রোগী বছরে বিদেশে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে যান, বিশেষত ভারত, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরে। এর মধ্যে অনেকেই ক্যান্সার, হৃদরোগ, অঙ্গ প্রতিষ্ঠাপন, এবং জটিল কিডনি রোগের চিকিৎসার জন্য বিদেশে যান। এর ফলে, বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাপকভাবে অপচয় হচ্ছে, যা দেশের অর্থনীতির উপর চাপ সৃষ্টি করছে। ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭-২০২২ সাল পর্যন্ত ভারত চিকিৎসার জন্য যাওয়ার বাংলাদেশি নাগরিকের সংখ্যা ৪৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, অনেক রোগী যথাযথ চিকিৎসা ভিসা না নিয়ে ভ্রমণ ভিসায় অথবা অবৈধভাবে চিকিৎসার জন্য বিদেশে যান।

স্বাস্থ্য বিভাগ বিভাজন ও সমস্যা: ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় দুটি পৃথক বিভাগে বিভক্ত করা হয়: স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ এবং চিকিৎসা শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ। যদিও এই বিভাজন ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনার উন্নতি করার কথা ছিল, তবুও এর ফলে বেশ কিছু নতুন সমস্যা তৈরি হয়েছে। শহর এবং গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্য সমস্যা কিছুটা ভিন্ন। শহরের অস্বাস্থ্যকর জীবন্যাপন, কর্মপরিবেশ, অপর্যাপ্ত সবুজ স্থান, শব্দ দূষণ, এবং হাঁটা বা সাইকেল চালানোর জন্য পর্যাপ্ত জায়গার অভাবের কারণে শহরের হৃদরোগ, হাঁপানি, ক্যান্সার, এবং ডায়াবেটিস রোগ আরও জটিল হয়ে উঠেছে।

জাতীয় আরবান হেলথ স্ট্রাটেজি ২০২০-এ শহরভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবায় বিভিন্ন অংশীজন ও অবকাঠামোর দায়িত্ব ও ভূমিকা নির্ধারণ, সেবা ব্যবস্থাপনার কাঠামো এবং অর্থায়নের প্রস্তাবিত কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে এই নীতিমালাটি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য আরও স্পষ্টীকরণ ও আইনগত ভিত্তি প্রদান জরুরী।

সম্প্রতি জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের অধীনে বিবিএস পরিচালিত জরিপে দেখা যায়, গত এক বছরে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে ৭৮.২% এমবিবিএস চিকিৎসকের কাছ থেকে, ৫.৭% ফার্মাসির বিক্রেতার কাছ থেকে, এবং অন্যান্যরা বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদানকারীর কাছ থেকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছেন। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৯৭% মনে করেন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিনামূল্যে দেওয়া উচিত এবং ৯২% চান শহরের ওয়ার্ডগুলোতে ইউনিয়ন পর্যায়ের মতো প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন হোক। এছাড়া ৭২% উত্তরদাতা পৃথক অবকাঠামোর মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যসেবা পরিচালনার পক্ষে মত দিয়েছেন, এবং ৬৬% চান হাসপাতাল ও মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বায়ত্তশাসন। একজন ডাক্তার যেন অন্তত ১০ থেকে ২০ মিনিট সময় দেন—এমনটাই প্রত্যাশা ৭২% উত্তরদাতার, যাঁদের মধ্যে ২৮.৫% ২০ মিনিট সময়ের পক্ষে। বিশেষজ্ঞ সেবা শুধুমাত্র জরুরি রেফারেন্সের ভিত্তিতে দেওয়া উচিত বলে মনে করেন ৭২% এবং সপ্তাহের সাতদিন ২৪ ঘণ্টা সরকারি অ্যাম্বুলেন্স সেবার ব্যবস্থা থাকা উচিত বলে ৯৯% মত দিয়েছেন। একই ধরনের সেবা পরিচালনাকারী স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কার্যক্রম একীভূত করার পক্ষে ৬৭% উত্তরদাতা মত প্রকাশ করেছেন।

২) নেতৃত্ব, সুশাসন ও কর্মসংস্কৃতি

স্বাস্থ্য - একটি মৌলিক রাজনৈতিক প্রতিশুভি: স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা কোনো রাষ্ট্রের মৌলিক রাজনৈতিক প্রতিশুভি হিসেবে বিবেচিত হয়। কার্যকর স্বাস্থ্য শাসন কাঠামো গড়ে তোলা এবং একটি স্বাস্থ্য-বান্ধব শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকারের প্রতি দায়িত্ব থাকে। এ লক্ষ্যে সরকারকে নিয়মিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং কখনো কখনো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এসব সিদ্ধান্তের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকার, সেবার মান এবং রোগীর আর্থিক বোৰা কমানো সম্ভব হয়। তবে, এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া প্রায়ই কাঠামোগত দুর্বলতার কারণে জটিল হয়ে পড়ে, যা প্রত্যাব ফেলে নাগরিকদের সেবার অভিজ্ঞতায়।

চ্যালেঞ্জ ও বাস্তবতার ফারাক : বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে, যা মোকাবিলা করতে হলে রাজনৈতিক প্রতিশুভিকে বাস্তব পদক্ষেপে বৃপ্তির করতে হবে। কেবল পরিকল্পনাগত চেষ্টাই যথেষ্ট নয়; এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ঘাটতি, অনাকাঙ্ক্ষিত ফলাফল, দুর্বীলি, প্রশাসনিক অদক্ষতা এবং রাজনৈতিক বা আর্থিক সিদ্ধান্তহীনতা—এসব কারণে অনেক ভালো স্বাস্থ্যনীতি সফল হয়নি। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে একটি সংহত ও সুশাসিত কাঠামো অপরিহার্য।

শাসন কাঠামোর গুরুত্ব : স্বাস্থ্য খাতে শাসন কাঠামো শক্তিশালী করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমেই একটি সমাজ তার স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় যুক্ত সমস্ত দ্বন্দ্ব মোকাবিলা করে, সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত নেয় এবং প্রয়োজনীয় কর্তৃত প্রয়োগ করে। এজন্য বিভিন্ন অংশীজন—যেমন সামাজিক বীমা তহবিল, পেশাজীবী সংগঠন, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, সরকার, এনজিও, এবং বেসরকারি খাত—একত্রিত হয়ে একটি অভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে হবে। তবে শাসন কাঠামো দুর্বল হলে তার ফলস্বরূপ বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয় যেমন দুর্বীলি, পরিকল্পনার অকার্যকর বাস্তবায়ন, স্বজনন্পীতি, অদক্ষতা এবং জনবিশ্বাসের অভাব।

দুর্বল শাসনের পরিণতি : দুর্বল শাসন কাঠামো থেকে একাধিক সমস্যা সৃষ্টি হয়, যার মধ্যে রয়েছে দুর্নীতি, ভুলভাবে পরিকল্পিত নীতি, অদক্ষতা, স্বজনপ্রীতি, জনবিশ্বাসের অভাব এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অভাব। এর ফলে, স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা কমে যায়, এবং জনগণের কাছে স্বাস্থ্যসেবার মান প্রশংসিত হয়ে পড়ে। এই দুর্বলতা দূর করার জন্য শাসন কাঠামোকে আরো কার্যকর, স্বচ্ছ এবং দায়িত্বশীল হতে হবে।

ভাল শাসনের মৌলিক নীতিমালাসমূহ : একটি কার্যকর এবং সমৰ্পিত স্বাস্থ্য শাসন ব্যবস্থার জন্য কয়েকটি মৌলিক নীতি অপরিহার্য। এসব নীতির মধ্যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ, সততা এবং সক্ষমতা প্রধান। **স্বচ্ছতা (Transparency)** নিশ্চিত করে যে নীতি, সিদ্ধান্ত এবং সম্পদের ব্যবহার জনগণের কাছে উন্মুক্ত ও সহজবোধ্য হয়, যার মাধ্যমে জনবিশ্বাস বাড়ে এবং দুর্নীতি কমানো সম্ভব হয়। **জবাবদিহিতা (Accountability)** স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী, নীতিনির্ধারক ও প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে, যাতে সেবার মান বৃদ্ধি পায় এবং সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়। **অংশগ্রহণ (Participation)** জনগণ, সুশীল সমাজ এবং অন্যান্য অংশীজনদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করার মাধ্যমে সেবাকে আরো কার্যকর ও প্রাসঙ্গিক করে তোলে। **সততা (Integrity)** স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় নেতৃত্বকৃত বজায় রাখতে সহায়তা করে এবং জনগণের আস্থা সৃষ্টি করে। **সর্বশেষে, ক্ষমতা (Capacity)** ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক পর্যায়ে নীতি বাস্তবায়ন, সেবা ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সক্ষমতা নির্দেশ করে। এই পাঁচটি নীতির সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী, দক্ষ এবং জনগণের চাহিদা অনুযায়ী সাড়া দেওয়া স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

স্বাস্থ্য খাতে সংস্কার ও টেকসই শাসন কাঠামো : স্বাস্থ্য খাতে টেকসই, ন্যায্য এবং কার্যকর শাসন কাঠামো গড়ে তুলতে হলে জরুরি ভিত্তিতে একটি সুসংগঠিত সংস্কার প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। এই প্রক্রিয়া অবশ্যই শাসনের মৌলিক নীতিগুলোর—স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ, সততা এবং সক্ষমতার ওপর ভিত্তি করতে হবে। এভাবে একটি "জনমুখী" স্বাস্থ্যসেবা কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে, যেখানে সেবা হবে সহজলভ্য, মানসম্পন্ন, সমতাভিত্তিক এবং জনগণের আস্থার প্রতীক। এর মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্যসেবায় বিশ্বাস বাড়বে এবং স্বাস্থ্য খাতে বিদ্যমান দুর্বলতা ও অসাম্য দূর হয়ে একটি টেকসই ও মানবিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাত - শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতার বাস্তব চিত্র: বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতা একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও সংবিধানের ১৫ ও ১৮ অনুচ্ছেদে স্বাস্থ্যসেবাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্থীরূপ দেওয়া হয়েছে, বাস্তবে এই অধিকার কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। স্বাস্থ্য খাত দীর্ঘদিন ধরে অর্থনৈতিক সংকট, অতিনিয়ন্ত্রণ, এবং দুর্বল প্রশাসনিক কাঠামোর শিকার, যার ফলে দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা কার্যকরভাবে কাজ করতে পারেনি। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (MOHFW) কর্তৃক পরিচালিত হলেও, এটি বারবার রাজনৈতিক প্রভাব, কর্তৃতের খণ্ডতা, এবং স্বাধীন পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে প্রশংসিত হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারী এই কাঠামোগত দুর্বলতাগুলোকে আরও প্রকট করে তোলে, এবং এটি স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ চেইন, ক্রয় প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুতর দুর্বলতা প্রকাশ করে। অতিরিক্ত ব্যয়, ভুয়া নথিপত্র এবং অসং কার্যকলাপের কারণে জনমনে ব্যাপক অনাস্থা সৃষ্টি হয়েছে। কিছু উচ্চপ্রোফাইল মামলায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হলেও তা মূলত প্রতীকী ছিল এবং ব্যবস্থাগত পরিবর্তন আনতে পারে না।

শাসন ব্যবস্থার ঘাটতির পথসমূহ: বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে শাসন ব্যবস্থার ব্যর্থতা ব্যাপক এবং এটি ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক—দুই স্তরেই বিদ্যমান। ব্যক্তিগত স্তরে, সরকারি খাতের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের মধ্যে দুর্নীতি, অবহেলা এবং পেশাদারিতের অভাব মারাত্মক অদক্ষতার সৃষ্টি করেছে। এর ফলে জনস্বাস্থ্য সেবার মান হাস পেয়েছে এবং জনগণের আস্থা নষ্ট হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে, ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতার মধ্যে রয়েছে বাজেট পরিকল্পনা, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ, ক্রয় প্রক্রিয়া এবং লজিস্টিক ব্যবস্থাপনার অসঙ্গতি। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবে সরঞ্জাম ক্রয়ে বিলম্ব, সম্পদের অপ্রয়োগ এবং গুরুতর স্বাস্থ্য অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে ব্যর্থতা দেখা গেছে। এর ফলে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সময়মত ও মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

শাসন ব্যবস্থার ঘাটতির কারণসমূহ: বাংলাদেশের স্বাস্থ্য শাসনে প্রাতিষ্ঠানিক এবং নেতৃত্বের দুর্বলতা সবচেয়ে বড় কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। নেতৃত্বের দুর্বলতা নীতি বাস্তবায়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। প্লোবাল তেলথ সিকিউরিটি ইনডেক্স ২০২৩ অনুযায়ী, স্বাস্থ্য শাসনের দিক থেকে বাংলাদেশ ১৯৫টি দেশের মধ্যে ১১৩তম অবস্থানে রয়েছে, যা ভারত (৬৬তম) এবং শ্রীলঙ্কা (৭২তম) এর তুলনায় অনেক পিছিয়ে। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপও একটি বড় সমস্যা; ২০২২ সালে বাংলাদেশ ইনসিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (BIDS)-এর এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, ৬০% স্বাস্থ্য নেতৃত্বের পদ রাজনৈতিক প্রভাবে পূর্ণ হয়েছে, যোগ্যতার ভিত্তিতে নয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণে ধীরতা এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের (DGHS) বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া যেমন—ডেঙ্গু মহামারী কিংবা কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন সংগ্রহে—এসবও শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতা প্রতিফলিত করে।

স্বাস্থ্য অর্থায়নের অব্যবস্থাপনা চিত্র: বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা এবং ক্রয় দুর্বীতি একটি বড় সমস্যা। বিশ্বব্যাংকের ২০২৩ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্য খাতে অনিয়মের কারণে প্রতি বছর প্রায় ৩০% বাজেট অপচয় হয়। এছাড়া, কোভিড-১৯ চলাকালীন কিছু হাসপাতালে প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জামের দাম ৩০০% পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল, যা মূল্যাঙ্কিতির একটি উদাহরণ। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (ADB)-এর ২০২৪ সালের গবেষণায় দেখা যায়, নতুন কেনা ৪০% চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়নি, যা কেবল পরিকল্পনার অভাবকেই নয়, বরং অপচয় এবং ব্যবস্থাপনা সমস্যা প্রকাশ করে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেটের বড় অংশ বিদেশি মুদ্রায় যন্ত্রপাতি এবং ওষুধ ক্রয়ে ব্যয় হয়, তবে স্থানীয় এজেন্ট ও রাজনৈতিক প্রভাবশালীরা দরপত্র প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে থাকে, যার ফলে উচ্চমূল্যের যন্ত্রপাতি কেনা হয়। যেমন, খুলনার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দশ বছর ধরে অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি পড়ে ছিল এবং বরিশালের একটি হাসপাতালে এক কোবাল্ট মেশিন প্রায় নয় বছর ধরে মেরামত ছাড়াই পড়ে ছিল।

ক্রয় অনিয়মের একটি দৃষ্টিত্ব: এক বড় দাতাসমর্থিত প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালকের অদক্ষতা এবং সরকারি আর্থিক নিয়ম না জানার কারণে অনিয়ম ঘটেছিল, যার ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়। এই অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দেয় যে, দক্ষ ব্যবস্থাপক এবং নেতৃত্বের অভাবে স্বাস্থ্যখাতে বড় ধরনের ব্যর্থতা ঘটে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনে দেরি হওয়ার কারণে পরিবার পরিকল্পনার উপকরণ, বিশেষত কনডমের সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেয়। এর ফলে, গ্রাহকরা বাজার থেকে এসব উপকরণ কিনতে বাধ্য হন, যা দীর্ঘদিনের সফল কর্মসূচি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বিশ্বব্যাংকের ২০২৪ সালের পাবলিক এক্সপেনডিচার রিভিউ অনুযায়ী, নবনির্মিত হাসপাতালগুলোর প্রায় ৪৫% জনবল ও মৌলিক ইউটিলিটির অভাবে চালু হতে বিলম্ব করেছে। অনেক সময় স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নয়ন রাজনৈতিক বিবেচনায় পরিচালিত হয়, ফলে জনগণের স্বাস্থ্য চাহিদার পরিবর্তে এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। অনেক জায়গায় জাতীয় ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণের অভাব রয়েছে, যার ফলে সঠিকভাবে সেবা প্রদান সম্ভব হয়নি।

রাজনৈতিক প্রভাব ও দুর্বীতি: রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে বহু ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় স্থানে হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে চিকিৎসক, যন্ত্রপাতি বা কর্মী নেই। অনেক স্থাপনা কাগজে সম্পূর্ণ হলেও, তারা ব্যবহারযোগ্য নয়, ফলে জনগণ স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হয় এবং ঠিকাদারদের লাভ হয়। গত ২৫ বছরে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেট বেড়েছে, এবং রাজনৈতিক মহল নির্মাণ প্রকল্পে লিবিং শুরু করেছে, যার ফলে নির্মাণের স্থান এবং প্রকৃতি নির্ধারণে রাজনৈতিক সুবিধা ব্যবহৃত হয়, এবং নিয়মান্বেশনের স্থাপনা নির্মিত হয়।

৪) স্বাস্থ্য জনবলের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ :

যে কোন স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্য স্বাস্থ্য জনবল একটি অপরিহার্য উপাদান। যথাযথ স্বাস্থ্য জনবল পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ক্যাটেগরিয়ের যথেষ্ট সংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা যে কোনো স্বাস্থ্যব্যবস্থার সফলতার জন্য অপরিহার্য। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিদর্শিত হলেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের মধ্যেও জনসংখ্যার অনুপাতে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য জনশক্তির সংখ্যা সবচেয়ে কমা পরিমাণের সঙ্গে জনবলের মানের কথা চিন্তা করলে এই সমস্যাটি আরো প্রকট হয়ে ওঠে। স্বত্বাবতই দেশের স্বাস্থ্য সমস্যাগুলোর আলোচনা করতে হলে স্বাস্থ্য জনবলের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ইস্যুগুলি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেয়। প্রথম চ্যালেঞ্জই হচ্ছে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক-প্রশিক্ষক ও গবেষকের ঘাটতি। অন্য চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে রয়েছে দক্ষ এবং ন্যায্যভাবে শিক্ষক-প্রশিক্ষক নিয়োগ, এই জনশক্তিকে সঠিক স্থানে রাখা রাখতে পারা, দক্ষতার যথাযথ মিশ্রণ, সামর্থ্য ও কর্মদক্ষতার মূল্যায়ন, জবাবদিহিতা, সমন্বয় দক্ষতা এবং নীতি নির্ধারণের সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি পরিকল্পিত সুপরিকল্পিত তথ্য ব্যবস্থাপনা।

শিক্ষক-প্রশিক্ষক-গবেষক ইস্যু ছাড়াও ভোট অবকাঠামো এবং অন্যান্য সহায়ক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রচুর সংখ্যক চ্যালেঞ্জ রয়েছে এক্ষেত্রে। গত বছরে দেশে একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে। সেই সঙ্গে দেশের জনগণ এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিটি আশা করছি যে টেকসই লক্ষ্যমাত্রার লক্ষ্য ৩ (উত্তম স্বাস্থ্য ও সুস্থতা) অর্জনে সরকার আরো দুট সফল হবে। তবে ২০৩০ সালের পূর্বে যে সামান্য কয়েকটি বছর রয়েছে তার মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অর্জন (যা এসডিজি ৩ অর্জনের আবশ্যিক অঙ্গ) অর্জনে, বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বাস্তবতায়, কঠিন হয়ে পড়বে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সংস্কারে অভিষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনে এই বাস্তবতা, বিশেষ বিশেষ চ্যালেঞ্জ, ও গৃহীত পদক্ষেপগুলিকে সমর্পিতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্য জনবল সৃষ্টির সামর্থ্য : বাংলাদেশে ৩৭টি সরকারি (৫৩৮০ আসন সংখ্যা), ৬৭টি বেসরকারি (৬২৯৮ আসন সংখ্যা), একটি আর্মড ফোর্সেস (১২৫ আসন সংখ্যা) এবং ৫টি আর্মি মেডিকেল কলেজ (২৫০ আসন সংখ্যা) রয়েছে। ডেন্টাল কলেজের ক্ষেত্রে ১টি সরকারি ডেন্টাল কলেজও ৪টি ডেন্টাল ইউনিট এবং ২৬টি বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ রয়েছে যেখানে যথাক্রমে ৫৪৫ ও ১৪০৫ আসন সংখ্যা রয়েছে। বিএমডিসি-র তথ্য অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ উভয় ক্ষেত্রে ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ সেশন থেকে ছাত্রী সংখ্যা ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীর সংখ্যানুপাত বেশি। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট শাখাগুলির তথ্য অনুযায়ী, নারী চিকিৎসকদের সংখ্যা বেশি।

বিভিন্ন শাখায় বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিশেষজ্ঞের সংখ্যা অনেক কম, তাদের মধ্যে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা আরো কম। বর্তমানে, বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের (যেমন হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা, অসংক্রান্ত ব্যাধি, কমিউনিটি মেডিসিন, রোগতত্ত্ববিদ্যা, রিপ্রোডাক্টিভ ও চাইল্ড হেলথ, এনভায়রনমেন্টাল ও অকুপেশনাল হেলথ, হেলথ প্রমোশন ও হেলথ এডুকেশন ইত্যাদি) মোট সংখ্যা মাত্র ৩,৫৬৩ জন।

দেশে ডিগ্রিধারী ক্লিনিক্যাল বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (MD, MS, FCPS, MCPS) বিশেষজ্ঞদের চাহিদা দেশের জনসংখ্যা এবং রোগের বর্ধিত প্রাদুর্ভাবের কারণে অনেক বেশি বেড়েছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শতকরা মাত্র ২৩ শতাংশ প্রতিষ্ঠান পাবলিক সেক্টরে রয়েছে এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনায় সেগুলিতে খরচ যৎসামান্য। বিগত বছরগুলিতে প্রাইভেট সেক্টরে স্বাস্থ্যকর্মী সৃষ্টির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে অতি দুর্বল। ফলে, প্রায় সকল ধরনের ডিগ্রি ও কোর্সের জন্য প্রাইভেট সেক্টরের তুলনায় আসন সংখ্যার অনুপাত অনেক গুণ বেশি।

২০২১ সালে বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সংখ্যা সম্পর্কিত একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে যেখানে দেশের স্বাস্থ্য জনবলের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের সঙ্গে স্বাস্থ্যকর্মী সৃষ্টির তুলনা করে করা হয়েছে। এর সঙ্গে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য জনবল সংক্রান্ত তথ্যসংক্ষেপে মিলিয়ে দেখা যায় যে, ২০৩০ সালের মধ্যে প্রকৃত প্রয়োজন পূরণ করতে হলে চিকিৎসকের সংখ্যা ১.৮ গুণ বৃদ্ধি করতে হবে। এই অনুপাত কিছুটা রক্ষণধর্মী কারণ বিদ্যমান জনবল পরিকল্পনার ভিত্তিতে সেটি করা হয়েছে এবং সেটি কিছুটা কম হতে পারে। এই হিসাব অনুসারে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কর্মীদের সংখ্যা ১.৫ গুণ ও নার্সিং-সহযোগী সহযোগী কর্মীদের সংখ্যা ৩ গুণ বৃদ্ধি করতে হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য-সহায়ক কর্মীদের সংখ্যা (যারা মূলত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পর্যায় কর্মরত তাদের সংখ্যা) প্রায় ছয় গুণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এদেশে। বাংলাদেশ স্বাস্থ্য জনবলের কর্মক্ষেত্রের পর্যায় খুব সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত নয়।

এদেশের প্রয়োজন এই হারে স্বাস্থ্য জনবল সৃষ্টির মাধ্যমে মেটানো সম্ভব নয়। বর্তমান আসন সংখ্যা অনুযায়ী চিকিৎসক-এর সঙ্গে নার্স-মিডওয়াইফ- এর সৃষ্টির অনুপাত ১:১.৫, অথবা স্বাস্থ্যকর্মীর ষ্টক-এর ভিত্তিতে সেই অনুপাত ১:০৭, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত অনুপাতের অনেক কম। লক্ষণগীয় যে, স্বাস্থ্য প্রশাসক, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং বায়োস্ট্যিশিয়ান-এর মত স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের সংখ্যা অনেক হওয়া উচিত, অথবা খুব কম সংখ্যক প্রতিষ্ঠানে এই পেশাজীবীদের সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং বিশেষণে তাদের বিবেচনা করা হচ্ছে না।

শিক্ষক-প্রশিক্ষক-গবেষক-এর এর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন সম্পর্কে সংখ্যা নির্ণয়ের চ্যালেঞ্জ: দেশে শিক্ষক-প্রশিক্ষক-গবেষকের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের প্রয়োজনভিত্তিক সংখ্যা নির্ণয়ের সমস্তি কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। বিভিন্ন নীতিমালা ও দাপ্তরিক আদেশের মাধ্যমে বিভিন্ন শাখায়, কিছুটা অপরিকল্পিতভাবে, শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাতের একটি সাধারণ ধারণার ভিত্তিতে শিক্ষক-প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে এবং সেটিও বহু বছর একই অনুপাতে রয়ে গেছে।

যথাযথ দক্ষতার মিশ্রণ সহ জনবল সৃষ্টি: এই সংক্রান্ত দক্ষতার যথাযথ মিশ্রণ সংক্রান্ত কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই, সাধারণভাবে স্বাস্থ্য জনবলের সৃষ্টি পরিকল্পনা করা হয়।

বর্তমানকালে স্বাস্থ্য জনশক্তি সৃষ্টিতে গবেষণা, উন্নয়ন ও উন্নাবন (innovation), সংক্ষেপে RDI, একটি গুরুতর্পূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উন্নততর জ্ঞান, দক্ষতা এবং উন্নাবক তৈরীর ক্ষেত্রে, এবং সেই সঙ্গে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভ্যাস তৈরির জন্য এ কাজগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত, উচ্চতর জনশক্তি সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই উপাদান অপরিহার্য। কিন্তু বাংলাদেশে এ ধরনের পদক্ষেপ অত্যন্ত অপ্রতুল। স্বাস্থ্যনির্তন পর পরই ‘বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল’ সৃষ্টি করা হয়েছিল এই উদ্দেশ্যে; কিন্তু যথাযথ আইনগত ভিত্তি এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও পর্যাপ্ত জনবলের অভাবে প্রতিষ্ঠানটি সেভাবে অগ্রসর হতে পারেনি। এই ত্রুটির ফলে প্রতিষ্ঠানটি দেশে একটি গবেষণা সংস্কৃতি সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে।

স্বাস্থ্য জনবল স্বাস্থ্য জনবল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় ও পরিচালনায় সুদক্ষ পেশাজীবীদের অন্তর্ভুক্তির অভাব: স্বাস্থ্য জনবল সৃষ্টির ক্ষেত্রে ও প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় দক্ষ পেশাজীবীদের অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত আবশ্যিক। বাংলাদেশ এ বিষয়ে এ পর্যন্ত নেতৃত্বান্বিত কর্মসূচি অনেকেরই এই বিশেষ বিষয়গুলিতে তেমন কোন শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ছিল না।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন শাখায় সমন্বয় এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা ও সমন্বয়: স্বাস্থ্য জনবল সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা ও উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সঙ্গে পরিকল্পনাগত এবং বাস্তবায়ন সহযোগিতা এবং সমন্বয়ের অভাব রয়েছে।

এক্রেডিটেশন: বাংলাদেশের শিক্ষা (বিশেষত উচ্চতর শিক্ষা)-র বিশ্বব্যাচী স্থীরতির জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় কিন্তু সেটির কোন সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। সাম্প্রতিককালে একটি কাউন্সিল করা হয়েছে, কিন্তু এটিও শুধুমাত্র এমবিবিএস প্রোগ্রামের জন্য এবং এখন পর্যন্ত সেভাবে সক্ষমতা সৃষ্টি করা হয়নি।

বিগত বছরগুলিতে শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণের সমস্যা : সারা বিশ্বেই সাম্প্রতিক বছরগুলিতে স্বাস্থ্য জনবলের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এক্ষেত্রে একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। সে তুলনায় বাংলাদেশ শিক্ষা-প্রশিক্ষণের কারিকুলাম-সিলেবাস এবং পদ্ধতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন এখনো সীমিত রয়ে গেছে।

প্রতিষ্ঠানগুলির ভৌত অবকাঠামো এবং অন্যান্য সহায়ক সম্পদের সীমাবদ্ধতা: এমনকি প্রথম দিকের প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ছাত্র-ছাত্রী আসন সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি করা হলেও অবকাঠামো, সহায়ক সম্পদ এবং জনবলের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো উন্নয়ন করা হয়নি। নতুনগুলোর ক্ষেত্রেও প্রচুর সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে।

কারিকুলাম বহির্ভূত কার্যক্রম: শিক্ষা-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে শুধুমাত্র কারিকুলার কার্যক্রম যে ছাত্রদের মান বৃদ্ধি করে তা নয়। কারিকুলাম বহির্ভূত যেসব সৃষ্টিশীল কার্যক্রম রয়েছে সেগুলিও কিন্তু অত্যন্ত প্রয়োজন; অথচ সেগুলোর সুযোগ-সুবিধা খুবই সীমাবদ্ধ।

বেসরকারি খাতে শিক্ষা: বিভিন্ন রকম রাজনৈতিক পদক্ষেপ ও নীতির কারণে, সরকারি খাতের তুলনায় বেসরকারি খাতে অনেক বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে। অথচ সেগুলোর শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মান সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন রয়ে গেছে এবং এটি বাংলাদেশের জন্য প্রধান একটি চ্যালেঞ্জ। যখন অনেক অর্থ ব্যয় করে কেউ শিক্ষা লাভ করে তখন সেটি ফেরত আনা পরিবারের ও অভিভাবকের জন্য একটি বিশেষ আগ্রহের কারণ হয়ে ওঠে।

৫) অত্যাবশ্যকীয় ঔষধপত্র, চিকিৎসা প্রযুক্তি ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ

অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের সর্বজনীন প্রাপ্তি প্রতিটি নাগরিকদের মোলিক স্বাস্থ্য অধিকার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুসরণ করে বাংলাদেশ সরকার একটি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকা প্রণয়ন করেছে, যাতে ২৮৫ টি ওষুধ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করার দায়িত্ব ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের (DGDA)। দেশীয় ওষুধ শিল্প বর্তমানে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ, যা দেশের চাহিদার ৯৮ শতাংশ পূরণ করতে সক্ষম। বাংলাদেশের ওষুধ আজ ১০০টিরও বেশি দেশে রপ্তান হচ্ছে। এই শিল্প জাতীয় অর্থনীতিতে ১.৮ শতাংশ অবদান রাখছে। তবে এই সফল্যের পাশাপাশি বেশ কিছু কাঠামোগত দুর্বলতা এখনো রয়ে গেছে, যা জনগণের জন্য মানসম্পর্ক ও সাম্প্রয়ী ওষুধের প্রাপ্ত্যক্ষ নিশ্চিত করতে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প এখনো সক্রিয় ফার্মাসিউটিক্যাল উপাদান (API)-এর ক্ষেত্রে চীন ও ভারতের ওপর ৮৫ শতাংশের বেশি নির্ভরশীল। এই অতিনির্ভরতা কোভিড-১৯ পরবর্তী বৈশিক সংকটে গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিশ্ব বাজারে এপিআই-এর মূল্য বৃদ্ধি, টাকার অবমূল্যায়ন এবং উৎপাদন ব্যয় বাড়ার ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে ওষুধের দাম বেড়েছে। এই মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে সাধারণ ও নিম্নায়ের মানুষের ওপর, যাদের আয়ের একটি বড় অংশ ওষুধ কিনতে ব্যয় হচ্ছে। বর্তমানে দেশের মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ের প্রায় ৭৩ শতাংশ ব্যক্তি পর্যায়ের খরচ, যার সিংহভাগই ব্যয় হয় ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্ৰীর পেছনে। সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ সময়ে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ পাওয়া যায় না, যার ফলে রোগীদের বেসরকারি ফার্মেসির ওপর নির্ভর করতে হয়। এতে অনর্থক ব্যক্তি পর্যায়ের খরচ বাড়ে এবং অনেকে মারাত্মক আর্থিক চাপে পড়েন।

সরবরাহ ব্যবস্থার বৈশম্যও একটি বড় সমস্যা। শহরাঞ্চলে তুলনামূলকভাবে ফার্মেসির বিস্তার বেশি হলেও গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকায় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্ৰী সহজলভ্য নয়। বর্তমানে দেশে অনুমোদিত ফার্মেসির সংখ্যা প্রায় ৪ লাখ, এবং প্রতিদিন গড়ে ২২০টির বেশি নতুন ফার্মেসি অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এসব ফার্মেসির একটি বড় অংশ প্রশিক্ষিত ফার্মাসিস্ট ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছে। নিয়ম না মেনে অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি, ওষুধের অপব্যবহার, এবং নিয়ন্ত্রণহীন বাজার বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। এর ফলে ওষুধের মান, কার্যকারিতা এবং রোগীদের নিরাপত্তা, সবই ঝুঁকির মুখে পড়েছে।

ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সীমিত সক্ষমতার কারণে বাজারে নকল, নিয়মান্বয়ের ওষুধ এবং মানহীন রোগ নির্ণয় সরঞ্জাম ছড়িয়ে পড়েছে। ওষুধের দাম নির্ধারণেও অস্পষ্টতা রয়েছে। বর্তমানে মাত্র ১১৭টি ওষুধের দাম ডিজিটিএ সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে; বাকি ওষুধের দাম কোম্পানিগুলোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে অনুমোদন দেওয়া হয়। এতে দাম ও গুণমান, দুই ক্ষেত্রেই বিরুপ প্রভাব পড়ে। তদারকির অভাব, ফার্মাকোভিজিলেন্স ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং জনবল ঘাটতি ডিজিটিএ-র কার্যকারিতা সীমিত করে রেখেছে, যা বাজারে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বড় অন্তরায়।

সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান Essential Drugs Company Limited (EDCL) দেশের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ সরবরাহ করে থাকে। তবে এই প্রতিষ্ঠানে সুশাসনের ঘাটতি, সরবরাহে বিলম্ব, চুক্তি প্রদান প্রক্রিয়ায় অনিয়ম এবং দুর্নীতির অভিযোগ বারবার উঠে এসেছে। এসব দুর্বলতার কারণে নির্ধারিত সময়মতো ওষুধ পৌছে না, এবং রাস্তীয় অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় না হওয়ার ঝুঁকি থাকে। একই সাথে বেসরকারি খাতের ওষুধ উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠানগুলো অতিরিক্ত মুনাফাকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। তাদের বিরুদ্ধে ডাঙ্গার ও ফার্মেসির ওষুধ বিক্রেতার সাথে অনৈতিক প্রচারণা ও অবৈধ লেনদেনের নানা অভিযোগ আছে। নানা সময়ে বিদ্যমান নীতি ও কৌশলের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে ওষুধের আঘাতিত মূল্য বৃদ্ধি অভিযোগও পাওয়া যায়।

এই বাস্তবতায় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হলে একটি সমষ্টিত ও কাঠামোগত রূপান্তর অপরিহার্য। ডিজিডি-এর নিয়ন্ত্রক ক্ষমতা, জনবল এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা দ্রুত বাড়াতে হবে। ওষুধের মূল্য ও মান নিয়ন্ত্রণে আধুনিক আইন ও শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। স্থানীয়ভাবে এপিআই উৎপাদনের জন্য সরকারি প্রগোদ্ধনা ও অবকাঠামো সহায়তা প্রয়োজন, যাতে আন্তর্জাতিক বাজারের ওপর নির্ভরতা কমানো যায়। একই সঙ্গে ইডিসিএল-কে পুনর্গঠনের মাধ্যমে তার কার্যক্রমে জবাবদিহিতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে। বেসরকারি খাতের ওষুধ উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে হবে। প্রশিক্ষিত ফার্মাসিস্ট তৈরির জন্য জাতীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করতে হবে এবং একটি জাতীয় ফার্মেসি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে, যা শহর ও গ্রাম, উভয় অঞ্চলের হাসপাতালগুলোতে সমর্ভাবে কার্যকর হবে।

অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ শুধু চিকিৎসা নয়, এটি মানুষের জীবনের নিরাপত্তা, আস্থা এবং মর্যাদার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। এই খাতে যে দুর্বলতা, অনিয়ম ও বৈষম্য রয়েছে, তা দূর করতে না পারলে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। তাই এখনই সময়—সাহসী সিদ্ধান্ত, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে একটি কার্যকর ও ন্যায় ওষুধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার।

৬) স্বাস্থ্য তথ্যবস্তু

স্বাস্থ্য তথ্যবস্তুর (HIS) উন্নয়নে বাংলাদেশ গত দুই দশকে প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। বর্তমানে দেশের HIS কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে—রুটিন স্বাস্থ্য তথ্য, জনসংখ্যাভিত্তিক জরিপ, জনস্বাস্থ্য নজরদারি এবং নাগরিক জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ব্যবস্থা। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা রাখে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যেমন DHIS2 এবং eMIS সার্বিক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, আর জাতীয় জরিপগুলো (যেমন BDHS, MICS, BMMS, BHFS) স্বাস্থ্য অবস্থা ও সেবা কাভারেজের উপর গভীরতর তথ্য দিচ্ছে। বিভিন্ন জেলায় পরিচালিত স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নজরদারি কেন্দ্রগুলো দীর্ঘমেয়াদি তথ্য সরবরাহ করে যা নীতিনির্ধারণে সহায়ক।

রুটিন তথ্য ব্যবস্থার পরিসর ও সক্ষমতা উল্লেখযোগ্য। DHIS2 বর্তমানে দেশের ১৪,০০০-এর বেশি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে চালু আছে এবং এতে সক্রিয় ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩৭,০০০-এর অধিক। প্ল্যাটফর্মটি হাসপাতালে ভর্তি, টিকাদান, রোগ নির্ণয়, লজিস্টিকস, মৃত্যু-সংক্রান্ত তথ্যসহ স্বাস্থ্যসেবার নানা সূচক সংরক্ষণে ব্যবহৃত হচ্ছে। অপরদিকে, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের eMIS প্ল্যাটফর্ম মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং প্রজননস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সেবা পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত হচ্ছে। OpenMRS+, HRIS, OpenSRP, এবং eLMIS-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলোও চিকিৎসাসেবা, জনবল, সরঞ্জাম ও ওষুধ ব্যবস্থাপনার তথ্য ডিজিটালভাবে সংরক্ষণে ভূমিকা রাখছে।

রুটিনবহির্ভুল তথ্যসূত্র—যেমন জনস্বাস্থ্য জরিপ ও নজরদারি ব্যবস্থাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। BDHS, MICS, BMMS, BHFS-এর মতো জরিপগুলো স্বাস্থ্যসেবার মান, ব্যবহারের বৈষম্য, এবং স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির নানা দিক তুলে ধরে। সারাদেশে চালু হওয়া নজরদারি কেন্দ্র যেমন Matlab, Chakaria, Baliakandi এবং ঢাকার নগর এলাকায় পরিচালিত Demographic Surveillance Site-গুলো নিয়মিতভাবে মৃত্যুহার, প্রসব, শিশুস্বাস্থ্য ও স্থানান্তর সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করে, যা মহামারি ও স্বাস্থ্য জরুরি অবস্থার পূর্বাভাসেও গুরুত্বপূর্ণ।

তবে, এই অগ্রগতি সত্ত্বেও, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থার সক্ষমতা এখনো অনেক সীমাবদ্ধতায় জর্জরিত।

১. তথ্যের গুণগত মান একটি বড় দুর্বলতা। DHIS2 এবং eMIS-এ সংগৃহীত তথ্যে অনেক সময় অসম্পূর্ণতা, ভুল এন্ট্রি, বা পুরনো জনসংখ্যা ডিনোমিনেটর ব্যবহারের কারণে পরিসংখ্যানগুলো বাস্তব অবস্থা প্রতিফলিত করতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে, অনেক সময় সেবার কাভারেজ বা রোগের প্রকোপের হিসাব অতিরিক্ত বা কম করে ধরা পড়ে, যা নীতিনির্ধারণে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

২. প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে আন্তঃসংযোগ সীমিত। DHIS2, eMIS, CRVS, surveillance বা অন্যান্য প্ল্যাটফর্মগুলো একে অপরের সঙ্গে কার্যকরভাবে সংযুক্ত না হওয়ায় একীভূত স্বাস্থ্য তথ্যভান্দার গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। রোগীর স্বাস্থ্য-যাত্রার পূর্ণ চিত্র—প্রাথমিক থেকে তৃতীয় স্তরের সেবা, সরকারি-বেসেরকারি প্রতিষ্ঠান—আজও বিচ্ছিন্নভাবে সংরক্ষিত, যা একটি ‘continuum of care’ নিশ্চিত করতে ব্যর্থ।
 ৩. তথ্য ব্যবহারের সংস্কৃতি এখনো গড়ে ওঠেনি। বিশাল পরিমাণে তথ্য সংগৃহীত হলেও, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ব্যবস্থাপক এবং কেন্দ্রীয় নীতিনির্ধারকরা অনেক সময় সেই তথ্য ব্যবহার করতে পারেন না, প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ ও ভিজুয়াল টুলসের অভাবে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় তথ্যনির্ভর সিন্ডিকেট গ্রহণের জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ, ব্যবহারবান্ধব ড্যাশবোর্ড এবং ফিডব্যাক ব্যবস্থার উন্নয়ন।
 ৪. অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থাকে দুর্বল করছে। বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, উচ্চগতির ইন্টারনেট, পর্যাপ্ত কম্পিউটার ও প্রশিক্ষিত অপারেটর না থাকায় রিয়েল-টাইম তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না। এটি ডিজিটাল ব্যবস্থার সার্বজনীনতা এবং কার্যকারিতা দুটোকেই বাধাগ্রস্ত করে।
 ৫. eMIS-এর টেকসইতা একটি উদ্বেগজনক ইস্যু। এই সিটেমটি বহুলাংশে বিদেশি অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তার ওপর নির্ভরশীল। অব্যাহত প্রযুক্তি সহায়তা, সার্ভার রক্ষণাবেক্ষণ, এবং জনবল প্রশিক্ষণের অভাব eMIS-এর দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্বকে হমকির মুখে ফেলেছে। পাশাপাশি DHIS2 ও eMIS-এর মধ্যে আন্তঃসংযোগের ঘাটতিও কার্যকারিতা কমিয়ে দিয়েছে।
 ৬. জরিপ ও নজরদারির ক্ষেত্রে একাধিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। জরিপে অনেক সময় স্মৃতি-নির্ভর তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়, যা ফলাফলকে প্রশংসিত করে। দৃগ্ম এলাকায় পৌছানো, লোকবল ঘাটতি, অনভিজ্ঞতা এবং প্রশাসনিক জটিলতাও কার্যক্রমে বিলম্ব ঘটায়। দীর্ঘমেয়াদে এসব কার্যক্রমের টেকসইতা রক্ষায় স্থায়ী অর্থায়ন ও কাঠামোগত সমর্থন জরুরি।
 ৭. HISPIX অনুযায়ী, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থার সামগ্রিক ক্ষেত্রে ৩০-এর মধ্যে মাত্র ১৫ (অর্থাৎ ১০০-এর মধ্যে ৫০)। স্বাস্থ্য জরিপ ও রিসোর্স ট্র্যাকিংয়ে কিছু অগ্রগতি থাকলেও, মৃত্যুনির্বন্ধন, তথ্য বিশ্লেষণ, রিপোর্টিং মান এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পিছিয়ে রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই ওয়েব-ভিত্তিক রিপোর্টিং, প্রমিত ডেটা কোয়ালিটি মূল্যায়ন এবং আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য নিয়ম (IHR) বাস্তবায়নে ঘাটতি রয়েছে।
- বাংলাদেশের স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থার ভিত্তি নির্মিত হলেও, এটি এখনো খণ্ডিত, অপর্যাপ্ত এবং প্রকৃত অর্থে স্বাস্থ্যব্যবস্থার আধুনিক চাহিদা পূরণে অক্ষম। যদি এই ব্যবস্থাকে একটি সুসংহত, তথ্যনির্ভর ও রেসপন্সিভ কাঠামোতে রূপান্তর করা না যায়, তবে এটি সামগ্রিক স্বাস্থ্যখাতের অগ্রগতিকেই প্রতিনিয়ত বাধাগ্রস্ত করবে। এখনই প্রয়োজন—একটি সমন্বিত ডিজিটাল রূপান্তর পরিকল্পনা, তথ্যের মানোন্নয়ন, আন্তঃসংযুক্তি, এবং একটি শক্তিশালী আইনি কাঠামোর ভিত্তিতে স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থাকে জাতীয় অগ্রাধিকারের স্তরে উন্নীত করা।

৭) স্বাস্থ্য অর্থায়ন

বাংলাদেশ বিগত দুই দশকে বাংলাদেশ প্রভুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করেছে। মাথাপিছু আয়, জীবনমান এবং মানব উন্নয়ন সূচকে দৃশ্যমান উন্নতি হয়েছে, অথচ স্বাস্থ্যখাত অর্থায়নের কাঠামো ও কার্যকারিতায় কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটেনি। ২০২১ সালে দেশের মাথাপিছু আয় ২,৪৮৩ মার্কিন ডলারে উন্নীত হলেও স্বাস্থ্যখাতে সরকারি বিনিয়োগ এবং আর্থিক সুরক্ষার অন্যান্য সূচকগুলোতে এই উন্নয়নের ছোয়া লাগেনি। ২০০০ সালে জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্যখাতের জন্য বরাদ্দ ছিল ৬ শতাংশ, যা ২০২১ সালে নেমে এসেছে মাত্র ৪.২ শতাংশে। একই সময়ে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যয় জিডিপির ০.৭—০.৮ শতাংশের মধ্যে আবর্তিত হয়েছে, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্দেশিত নৃনতম মানেরও অনেক নিচে এবং পৃথিবীর মাঝে অন্যতম সর্বনিম্ন। ২০২১ সালে বাংলাশে মাথাপিছু সরকারি স্বাস্থ্য ব্যয় ছিল মাত্র ২৬ মার্কিন ডলার, যা ভারতে ৮১ ডলার, নেপালে ৭৬ ডলার এবং শ্রীলঙ্কায় ২৮৩ ডলার। এ প্রবণতা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগ চরমভাবে অপর্যাপ্ত, যা জনগণের স্বাস্থ্য অধিকার বাস্তবায়ন এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বড় বাধা তৈরি করছে।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়ন কাঠামো এখনো প্রকল্পনির্ভর এবং দাতা-নির্ভর, যেখানে টেকসই ও সমন্বিত তহবিল ব্যবস্থাপনার অভাব সুস্পষ্ট। দেশের কর-জিডিপি অনুপাত মাত্র ৯ শতাংশ, যেখানে অধিকাংশ উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে এটি ১৫—২০ শতাংশের মধ্যে থাকা উচিত। স্বাস্থ্যবান্ধব করনীতির আওতায় তামাক সারচার্জ চালু হলেও, এই রাজস্বের বরাদ্দ স্বাস্থ্যখাতের জন্য নিশ্চিত করা যায়নি। জাতীয় পর্যায়ে সমন্বিত আর্থিক পরিকল্পনা এবং ফাস্টিং মেকানিজমের অনুপস্থিতির কারণে স্বাস্থ্যখাতের অর্থায়ন এখনও টেকসই ভিত্তি লাভ করেনি।

একদিকে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ অপ্রতুল, অপরদিকে, বরাদ্দকৃত এই অর্থেরও দক্ষ ব্যবহারও নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। ২০১০ সালে যেখানে বরাদ্দের ৯২ শতাংশ ব্যয় হয়েছিল, ২০২১ সালে এই হার কমে এসেছে ৬৯ শতাংশে। বাজেট বাস্তবায়নে বিলম্ব, প্রশাসনিক অদক্ষতা এবং সরবরাহ ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা সেবা সম্প্রসারণ ও গুণগত উন্নয়নকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করছে। এর ফলে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেলেও কাঙ্গিত স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ বা গুণগত পরিবর্তন ঘটচে না, যা স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়ন ব্যবস্থাপনায় গভীর সংক্ষারের প্রয়োজনীয়তাকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

সরকারি স্বাস্থ্য বাজেটের বরাদ্দ এখনো ইনপুটভিত্তিক (যেমন শয়া সংখ্যা, ভবন) সূচকের ওপর নির্ভরশীল, বাস্তব জনস্বাস্থ চাহিদা কিংবা আউটপুটভিত্তিক ফলাফলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ (ESP) ২০১৬ সালে হালনাগাদ হলেও, ক্রমবর্ধমান অসংক্রান্ত রোগের চাহিদা এবং জনসংখ্যার বার্ধক্যের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট এতে প্রতিফলিত হয়নি। এর ফলে স্বাস্থ্যখাতে বাজেটের বরাদ্দ তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক ও জনস্বাস্থের চাহিদা ভিত্তিক হয়নি। কোডিড-১৯ মহামারির অভিজ্ঞতা দেশের জরুরি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা নষ্ট করে দিয়েছে, যেখানে জরুরি তহবিল সংগ্রহ ও বরাদ্দের সক্ষমতা ছিল মারাত্মকভাবে সীমিত।

সামাজিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (SSK) ও নগরভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির আওতা ও পরিধি এখনো নগন্য। অপর দিকে বেসরকারি খাতে ফি-ফর-সার্ভিস মডেল (টাকার বিনিময়ে সেবা) অতিরিক্ত এবং অনিয়ন্ত্রিত সেবাকে উৎসাহিত করছে। এতে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যয় উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে, যা দেশের জনগণকে আর্থিক ঝুঁকিতে ফেলে দিচ্ছে। ২০২১ সালে মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ের ৭২ শতাংশ ব্যক্তিগত ব্যয় থেকে এসেছে। এই হার দক্ষিণ এশিয়া এবং সারা বিশ্বে অন্যতম সর্বোচ্চ। ব্যক্তি পর্যায়ের এই অতিরিক্ত ব্যয় জনগণকে দরিদ্র হবার ঝুঁকিতেও ফেলে দিতে পারে। ২০১৬ সালের তথ্যমতে, ১৫% শতাংশ পরিবার এ ধরণের বিপর্যয়কর চিকিৎসা ব্যয়ের সমূহীন হয়েছিলেন। স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে অতিরিক্ত ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যয় শুধু আর্থিক সুরক্ষাকে দুর্বল করে না, এটি দীর্ঘ মেয়াদে সেবার প্রাপ্তিতা ও ধারাবাহিকতাকেও বাধাগ্রস্ত করে।

এই বাস্তবতায় বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের টেকসই উন্নয়নের জন্য এখন মৌলিক বৃপ্তান্তের প্রয়োজন। প্রথমত, স্বাস্থ্যখাতে সরকারি বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়াতে হবে। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে হবে। তৃতীয়ত, ইনপুটভিত্তিক বাজেট প্রক্রিয়া থেকে সরে এসে চাহিদাভিত্তিক ও ফলাফলনির্ভর বাজেটিং এবং কৌশলগত ক্রয়ব্যবস্থা (Strategic Purchasing) চালু করতে হবে, যাতে কার্যকর ও ব্যয়-সাধারণী সেবা ও চিকিৎসাকে অগ্রাধিকার দেয়া যায়। একই সঙ্গে, জরুরি স্বাস্থ্য সংকটে দ্রুত সাড়া দিতে একটি স্থায়ী ইমার্জেন্সি হেলথ ফান্ড গঠন এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতির সক্ষমতা তৈরি করা জরুরি।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাত আজ একটি গুরুতপূর্ণ সম্বিশণে পৌছেছে। এখনই সময়—একটি সুদূরপ্রসারী, প্রমাণভিত্তিক ও দায়িত্বশীল নীতিমালার মাধ্যমে স্বাস্থ্যখাতের অর্থায়ন কাঠামো পুনর্গঠন করা। এটি কেবল জনগণের স্বাস্থ্যগত মঙ্গল নিশ্চিত করবে না, বরং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই ও স্বাস্থ্যনিরাপদ উন্নয়নের ভিত্তি শক্তিশালী করবে। স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে, সমতা ও কার্যকারিতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে, এবং ভবিষ্যতের ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য সক্ষমতা তৈরি করে, বাংলাদেশ আগামী প্রজন্মের জন্য একটি আরও নিরাপদ ও সুস্থ ভবিষ্যত গড়ে তুলতে পারবে।

ঘ) মুখ্য সুপারিশসমূহ

[স্বল্প-মেয়াদী] [মধ্য-মেয়াদী]

১. সংবিধান সংশোধন : [স্বল্প-মেয়াদী]

সংবিধান সংশোধনপূর্বক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই সাংবিধানিক প্রতিশুতি বাস্তবায়নের জন্য একটি পৃথক 'প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা আইন' প্রণয়ন করতে হবে, যা বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির ব্যাপারে নাগরিকদের অধিকার ও রাষ্ট্রের কর্তব্য নির্ধারণ করবে, এবং স্বাস্থ্যখাতে দীর্ঘমেয়াদে ন্যায্যতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।

২. আইনের সংস্কার: [স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী]

সকল সংশ্লিষ্ট পুরাতন আইন পর্যালোচনা করে যুগোপযোগী করতে হবে। এছাড়া রোগী সুরক্ষা, আর্থিক বরাদ্দ, জবাবদিহিতা ও জরুরি অবস্থায় পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে কিছু নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে। প্রস্তাবিত নতুন আইনসমূহ হল: বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন আইন; বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস আইন; জনস্বাস্থ্য ও অবকাঠামো আইন; বাংলাদেশ সেইফ ফুড, ড্রাগ, আইভিডি ও মেডিকেল ডিভাইস আইন; ঔষধের মূল্য নির্ধারণ ও প্রাপ্তি আইন; স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী ও রোগী নিরাপত্তা আইন; এ্যালায়েড হেলথ প্রফেশনাল কাউন্সিল আইন; হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক এক্রেডিটেশন আইন; স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন; নারী স্বাস্থ্য আইন; ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণ আইন; শিশু বিকাশ কেন্দ্র আইন; বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল আইন; স্বাস্থ্য তথ্য সুরক্ষা আইন ও স্বাস্থ্যখাতে টেকসই অর্থায়ন আইন। এছাড়াও নিয়লিখিত আইনসমূহের সংশোধন প্রয়োজন: বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, মেডিকেল শিক্ষা এক্রেডিটেশন আইন, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন, বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল আইন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন, পৌর ও সিটি কপোরেশন আইন ইত্যাদি।

৩. বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন গঠন : [স্বল্প-মেয়াদী]

একটি স্বাধীন ও স্থায়ী "বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন (BHC)" প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই কমিশন স্বাস্থ্যবিষয়ক নীতি প্রণয়নে সংসদ ও সরকারকে কৌশলগত পরামর্শ দেবে। পাশাপাশি, এটি জাতীয় কৌশল, সেবা ও সেবাদানকারি প্রতিষ্ঠানের মানদণ্ড এবং ক্লিনিক্যাল গাইডলাইন প্রণয়ন করবে। কমিশন নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্যব্যবস্থার কার্যকারিতা, সেবার গুণগত মান এবং সার্বিক ব্যয়-সাশ্রয়িতা পর্যালোচনা করবে। এর ভিত্তিতে কমিশন বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও সরকারকে উন্নয়নের জন্য গঠনমূলক মতামত ও দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। এই কমিশন সরাসরি সরকার প্রধানের নিকট জবাবদিহি করবে এবং প্রতি বৎসর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সংসদে পাঠাবে। এই কমিশন নিয়োক্ত বিভাগসমূহ এ বিষয়ক তদারক ও গঠনমূলক দিকনির্দেশনা প্রদান করবে:

- চিকিৎসা শিক্ষা বিভাগ - স্নাতক ও স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা, নার্সিং ও প্যারামেডিক শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন;
- জনস্বাস্থ্য বিভাগ - জনস্বাস্থের উন্নয়নে নীতিমালা প্রণয়ন, রোগ প্রতিরোধ;
- ক্লিনিক্যাল বিভাগ - স্বাস্থ্যসেবার ও রোগীর নিরাপত্তা তদারকি;
- BICE (Bangladesh Institute for Health and Care Excellence) - ক্লিনিকাল গাইডলাইন ও প্রটোকল উন্নয়ন, পাবলিক হেলথ গাইডলাইন উন্নয়ন;
- BHCI (Bangladesh Health Care Improvement) - সেবার মানদণ্ড, রোগীর নিরাপত্তা ও প্রটোকল অনুযায়ী সেবা প্রদান বিষয়ক নিয়মতাত্ত্বিক তদারকি;
- রেগুলেটরি ওভারসাইট বিভাগ - BMDC, BMRC, BMEAC, ইত্যাদির ক্ষমতা বৃদ্ধি ও নেটওয়ার্ক গঠন;
- ল্যাবরেটরি ও ডায়াগনস্টিক বিভাগ - মান নিয়ন্ত্রণ, স্বীকৃতি, ও National Diagnostic Network (NDN) তদারকি;
- নিরাপদ খাদ্য, ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম বিভাগ - ফার্মেসি নেটওয়ার্ক, আইভিডি-মেডিকেল ডিভাইস ও খাদ্য তদারকি;
- এনজিও (NGO) ও প্রাইভেট হাসপাতাল সমন্বয় বিভাগ - বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাতের মান তদারকি ও সমন্বয়;
- CASH (Centre for Advanced Specialized Healthcare) - বিশেষায়িত সেবা কেন্দ্র: রোগীদের বিদেশে মুক্তি রোধ ও দেশে আত্মনির্ভরশীল চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন (ক্যাল্সার, কিডনি, লিভার ও অন্যান্য অঙ্গ প্রতিস্থাপন, হৃদযন্ত্রের শল্যচিকিৎসা, বন্ধ্যত্ব, ও দুর্লভ রোগ ইত্যাদি);
- Allied Health Professionals বিভাগ - টেকনোলজিস্ট, থেরাপিস্ট, কাউন্সেলর প্রযুক্তি প্রযোগ মান উন্নয়ন;
- প্রথাগত ও বিকল্প চিকিৎসা বিভাগ - আয়ুর্বেদ, ইউনানি, হেমিওপ্যাথি ইত্যাদি;
- সেন্ট্রোরাল হেলথ কোর্টিনেশন বিভাগ - স্থানীয় সরকার, প্রতিরক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, স্বরাষ্ট্র, রেলপথসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রায়শই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়হীনভাবে কাজ করে। এটি তথ্যতিক্রিক নীতিনির্ধারণ, সম্পদ বৃক্ষণ এবং জরুরি সাড়া প্রদানে সহায় করবে।
- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়হীনভাবে কাজ করে। এটি তথ্যতিক্রিক নীতিনির্ধারণ, সম্পদ বৃক্ষণ এবং জরুরি সাড়া প্রদানে সহায় করবে।

প্রযুক্তি মূল্যায়ন (Health Technology Assessment) বিভাগ – ব্যয় সাশ্রয়িতা, অর্থনৈতিক প্রভাব, বাজেট ও ক্রয় ব্যবস্থাপনা; ১৫. স্বাস্থ্য নিরীক্ষা ও দুর্নীতি বিরোধী বিভাগ – স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিত নিশ্চিতে কার্যকর তদারকি; ১৬. স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিভাগ - সেবাগ্রহীতার অভিযোগ নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে একটি আধুনিক ডিজিটাল অভিযোগ নিষ্পত্তি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা; **BMDC, BNMC, Bangladesh Pharmacy Council** ইত্যাদির আইনগত ক্ষমতা ও কাঠামোকে আরও কার্যকর করা; চিকিৎসা প্রদানকারীদের নিরাপত্তা ও পেশাগত সুরক্ষা; মেডিকেল প্রফেশনাল ইন্স্যুরেন্স; পেশাগত অবহেলা বিষয়ে সুরক্ষা; স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি; এবং ১৭. আইন বিভাগ - সকল সংশ্লিষ্ট পুরাতন আইন পর্যালোচনা ও যুগোপযোগী করা, এবং নতুন আইনের সুপারিশ করা।

৮. বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস (BHS) গঠন : [স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী]

- ক) পেশাদারীত, দক্ষতা ও জবাবদিহিমূলক সেবার মান নিশ্চিত করতে বিদ্যমান স্বাস্থ্য ক্যাডার, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ক্যাডার এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল জনবল নিয়ে প্রশাসনিকভাবে স্বায়ত্তশাসিত ও পেশাভিত্তিক একটি নতুন সিভিল সার্ভিস - বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস (BHS) - গঠন করতে হবে। বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস-এর অধীনে ১১ টি আঞ্চলিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ থাকবে; এর মধ্যে প্রতিটি বিভাগীয় সদরে একটি করে মোট ৮টি, এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম- এ একটি করে মোট ৩টি। বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস-এর জন্য একটি স্বতন্ত্র সচিবালয় গঠন করা হবে, যার নেতৃত্বে থাকবেন মুখ্য সচিব পদমর্যাদার একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক, যিনি চিফ অফ বিএইচএস (Chief of BHS) নামে অধিস্থিত হবেন। তাঁর অধীনে জনস্বাস্থ্য, ক্লিনিকাল সেবা, এবং চিকিৎসা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা—এই তিনটি প্রধান খাত পরিচালনার জন্য জ্যেষ্ঠ সচিব পদমর্যাদার তিনজন উপপ্রধান নিযুক্ত হবেন, যারা ডেপুটি চিফ অফ হেলথ-DCH) নামে অধিস্থিত হবেন। প্রতিটি খাতের অধীনে একজন করে মহাপরিচালক (DG) পদ সৃষ্টি করা হবে, যাঁরা সচিব-সমমানের পদমর্যাদায় অধিস্থিত থাকবেন এবং কার্যক্রম পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট ডেপুটি চিফ অব হেলথ-এর অধীনে কাজ করবেন। কর্মরত জনবলের জন্য একটি স্বতন্ত্র চাকরি বিধি ও পৃথক বেতন কাঠামো প্রণয়ন করতে হবে এবং যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন ভাতা পাবেন যাতে পেশাদারীত, দক্ষতা ও জবাবদিহিমূলক সেবার মান নিশ্চিত হয়। বিদ্যমান বিসিএস ক্যাডারভুক্তদের জন্য নতুন বিএইচএস ক্যাডারে বেছে নেওয়া বা বিকল্প অপশন- এর সুযোগ রাখা হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]
- খ) বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস গঠনের জন্য DGHS, DG মেডিকেল এডুকেশন, পরিবার পরিকল্পনা, নার্সিং, টোব্যাকো কন্ট্রোল, হেলথ ইকোনমিক্স, TEMO ও NEMEW-সহ সব ইউনিটকে একীভূত করে একক "বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস (BHS)" গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। আলাদা সেক্রেটারিয়েট থাকবে না; সব ফাইল DG পর্যায় থেকে সরাসরি BHS-এর Deputy Chief ও Chief-এর কাছে যাবে, ফলে প্রশাসনিক কাজ হবে আরও দ্রুত, সমন্বিত ও দক্ষ। [স্বল্প-মেয়াদী]
- গ) **বিকেন্দ্রীকরণ:** স্বাস্থ্যসেবার বিকেন্দ্রীকরণ করে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বাধীনতা দিতে হবে, এবং ক্ষেত্রবিশেষে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। স্বাস্থ্যের অবস্থা, স্বাস্থ্য সমস্যার ধরন ও রোগতাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তার আলোকে উপজেলা-ওয়ারি বাজেট ও পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করতে হবে। বিভাগীয় পর্যায়ের কার্যক্রম স্বশাসিত আঞ্চলিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের অধীনে পরিচালিত হবে, যা নিয়ন্ত্রণ করবে বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস। জনবল নিয়োগ, বদলি নিয়ন্ত্রণ ও ক্রয়-সংগ্রহ-আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য দায়-দায়িত্বের প্রয়োগযোগ্য বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।[মধ্য মেয়াদী]

৫. স্বতন্ত্র পাবলিক সার্ভিস কমিশন (স্বাস্থ্য) গঠন : [স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী]

- ক) স্বাস্থ্যখাতের নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রক্রিয়া নিয়মিতকরণ ও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র পাবলিক সার্ভিস কমিশন (স্বাস্থ্য) গঠন করতে হবে। [স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী]
- খ) গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদের ক্ষেত্রে (যেমন চিফ অফ বিএইচএস, ডেপুটি চিফ অফ বিএইচএস, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ, মহাপরিচালক, মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ, BMDC ও BMRC চেয়ারম্যান ইত্যাদি) স্বচ্ছতা ও রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বজায় রেখে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগের সুপারিশ করার জন্য উচ্চপর্যায়ের সার্ট কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটি এই পদসমূহে নিয়োগপ্রাপ্তদের যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জাতীয় সংসদকে অবহিত করবে। এই উদ্যোগ জনস্বাস্থ্য ও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

৬. প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা : [স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী]

- ক) প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সর্বজনীন প্রাপ্ত্যান নিশ্চিত করতে সরকারকে এই সেবা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে (বা ক্ষেত্রবিশেষে ভর্তুকিমূল্যে) প্রদান করতে হবে, যাতে কোনো নাগরিক আর্থিক প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত না হন। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার কাঠামো শক্তিশালী করতে গ্রামাঞ্চলে ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহকে একত্রিত করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে বৃপ্তান্ত করতে হবে। শহরাঞ্চলে ওয়ার্ডভিভিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ লক্ষ্যে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারি খাত ও বেসরকারি খাতের সহায়তা নেয়া যেতে পারে। প্রাথমিক সেবা চিকিৎসকের নেটওয়ার্ক গঠন করে শুন্যগ্রামে প্রাথমিক স্বাস্থ্য চিকিৎসক/ জিপি/ পারিবারিক চিকিৎসক (Family Physician) -দের নিয়োগ করতে হবে, যা ইউনিয়ন থেকে উপজেলা পর্যন্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার প্রথম স্তরকে শক্তিশালী করবে। ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রয়োজনীয় জনবল, রোগনির্ণয় ব্যবস্থা, ঔষধ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জামাদির প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। প্রশিক্ষণের জন্য জেনেরিক কারিকুলাম অনুযায়ী BCPS, BCGP ও মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফ্যামিলি মেডিসিন কোর্স বা জিপি (GP) কোর্স প্রবর্তন করতে হবে। [স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী]
- খ) বিদ্যালয়ে এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানেও জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক অবহিতকরণ ও সৃজনশীল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।
[স্বল্প-মেয়াদী]

৭. হাসপাতাল ভিত্তিক সেবা : [মধ্য-মেয়াদী]

- ক. উপজেলা পর্যায়ে সেকেন্ডারি স্বাস্থ্যসেবা জোরদার করে জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসেবাকে আরও সহজলভ্য করতে হবে।
- খ. জেলা হাসপাতালগুলোতে বিশেষায়িত (টারশিয়ারি স্তরের) চিকিৎসাসেবা চালু করতে হবে, যাতে সেবার বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত হয়, মেডিকেল কলেজ ও জাতীয় ইনসিটিউটগুলোর ওপর রোগীর চাপ কমানো যায়, এবং ভৌগোলিক কারণে কেউ বিশেষায়িত চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না হন।
- গ. প্রতিটি বিভাগীয় সদরে অন্তত একটি পূর্ণাঙ্গ, সর্বাধুনিক সুবিধাসম্পন্ন ও বিশ্বানন্দের টারশিয়ারি সেবা হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে হবে, যা জটিল ও বিশেষায়িত চিকিৎসার জন্য একটি আঞ্চলিক রেফারেন্স কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে। এ বিশেষায়িত হাসপাতালগুলি মেডিকেল কলেজ ও জাতীয় ইনসিটিউটগুলোর নতুনভাবে গড়ে তোলা যেতে পারে, অথবা বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহকে ধাপে ধাপে উন্নীত করে করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ, সামাজিক ব্যবসা মডেল ও বিদেশি যৌথ বিনিয়োগ সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি এই হাসপাতালগুলোতে বার্ধক্যজনিত স্বাস্থ্যসেবা-কে বিশেষ অগ্রাধিকার দিতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]
- ঘ. প্রতি রোগীর জন্য গড়ে ১০ মিনিটের পরামর্শ সময় নিশ্চিত করতে হবে, এজন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সেবা প্রদানকারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং সাংগ্রাহিকভাবে প্রেসক্রিপশন নমুনা যাচাই পদ্ধতি চালু করা হবে। [মধ্য-মেয়াদী]
- ঙ. অতি দরিদ্র বা যারা দেশের মোট জনসংখ্যার ২০%, তারা সব হাসপাতালে বিনামূল্যে সব সেবা পাবেন।
- চ. দেশের সব সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি হাসপাতালের রক্ত সঞ্চালন সেবা, ল্যাবরেটরী সেবা ও ফার্মেসী ২৪/৭ খোলা থাকবে।
- ছ. সরকারি প্রয়োজনে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিসহ সকল স্তরের সেবাপ্রদানকারী কর্মচারীদের বিধি অনুযায়ী বদলি করা যাবে।
- জ. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কার্যক্রমসমূহ জেলা ও উপজেলা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের অধীনে পরিচালিত হবে, যা নিয়ন্ত্রণ করবে বিভাগীয় পর্যায়ের বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস। [মধ্য-মেয়াদী]
- ঝ. হাসপাতালে মানোন্নয়নের জন্য কার্যকরী মান উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ ও কন্টিনিউড এডুকেশন পদ্ধতির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৮. অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের প্রাপ্ত্যান : [স্বল্প মেয়াদী]

- ক) অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের সর্বজনীন প্রাপ্ত্যানকে একটি মৌলিক স্বাস্থ্য অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। দেশের সকল নাগরিককে প্রয়োজনের ভিত্তিতে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ বিনামূল্যে (যথা প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা পর্যায়ে এবং অতি দরিদ্রের ক্ষেত্রে) বা ভর্তুকি মূল্যে সরবরাহ করতে হবে। এজন্য সরকারি ঔষধ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলোকে আধুনিকায়ন ও কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে পুনর্গঠিত ও শক্তিশালী করতে হবে। বেসরকারি খাত থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্মত ঔষধ সংগ্রহে

কৌশলগত ক্রয়ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে প্রতিটি সরকারি হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে ফার্মেসি ২৪ ঘণ্টা চালু রাখতে হবে। এই ফার্মেসিগুলো জাতীয় ফার্মেসি নেটওয়ার্ক-এর আওতায় পরিচালিত হবে। [স্বল্প মেয়াদী]

খ) অ্যান্টি-ক্যান্সার, অ্যান্টি-ডায়াবেটিক, অ্যান্টি-হাইপারটেনসিভ ও অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের তালিকাভুক্ত অ্যান্টিবাইয়োটিকের ওপর ভ্যাট এবং প্রযোজ্য অন্যান্য শুল্ক ও কর শূন্য হবে। অন্যদিকে, ভিটামিন, মিনারেলস, ব্রেস্ট মিল্ক সার্বস্টিটিউট ও প্রোবায়োটিকসহ স্বাস্থ্য-সম্পূরক ও উচ্চমূল্যের ঔষধের ওপর ভ্যাট ও শুল্ক বৃদ্ধি করতে হবে। এর মাধ্যমে একদিকে জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধের প্রাপ্তা বাড়বে, অন্যদিকে তুলনামূলক কম-প্রয়োজনীয় ও বিলাসমূলক পণ্যে কর বাড়িয়ে রাজস্ব আয় জোরদার করা যাবে। [স্বল্প মেয়াদী]

৯. জরুরি স্বাস্থ্যসেবা নেটওয়ার্ক: [স্বল্প মেয়াদী]

জরুরি চিকিৎসাকে একটি বিশেষায়িত ও অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেবা হিসেবে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় একে একটি স্বীকৃত চিকিৎসা বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি হাসপাতালের জরুরি বিভাগসমূহ পর্যায়ক্রমে এই বিশেষজ্ঞদের নেতৃত্বে পরিচালিত হতে হবে, যাতে জরুরি চিকিৎসাসেবার পরিসর ও মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

১০. স্বাস্থ্য পরিষেবা সহায়ক নেটওয়ার্ক: [স্বল্প-মেয়াদী]

স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলোর প্রাপ্তা, মান ও পরিব্যাপ্তি নিশ্চিত করতে জাতীয় ফার্মেসি নেটওয়ার্ক, জাতীয় ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি নেটওয়ার্ক, জাতীয় রক্ত সঞ্চালন নেটওয়ার্ক এবং জাতীয় অ্যাসুলেন্স নেটওয়ার্ক গঠন করতে হবে। এই পরিষেবাগুলো নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী স্ব স্ব ক্ষেত্রে একটি একীভূত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সারাদেশে সংযুক্ত থাকবে এবং পরিচালিত হবে, যাতে জনগণ সহজে, দুর্ত ও নির্ভরযোগ্যভাবে এই পরিষেবাগুলো পেতে পারেন। [স্বল্প-মেয়াদী]

১১. স্বাস্থ্য সুরক্ষা:

সেবাগ্রহীতার অভিযোগ নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে একটি আধুনিক ডিজিটাল অভিযোগ নিষ্পত্তি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা হবে। BMDC, BNMC, Bangladesh Pharmacy Council, Allied Health Professional Council - ইত্যাদির আইনগত ক্ষমতা ও কাঠামোকে আরও কার্যকর করা হবে।

চিকিৎসা প্রদানকারীদের নিরাপত্তা ও পেশাগত সুরক্ষা (স্বাস্থ্য সুরক্ষা নীতির অংশ) -- ১. মেডিকেল প্রফেশনাল ইন্সুয়্রেন্স: চিকিৎসক, নার্স, টেকনোলজিস্ট ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জন্য মেডিকেল প্রফেশনাল ইন্সুয়্রেন্স চালু করা হবে, যাতে কর্মজীবনে আইনি ঝুঁকি বা অগ্রিতিকর ঘটনার ক্ষেত্রে তাদের আর্থিক ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত হয়। ২. পেশাগত অবহেলা (Professional Negligence) বিষয়ে সুরক্ষা: BMDC, BNMC, Bangladesh Pharmacy Council, Allied Health Professional Council ইত্যাদি)-র পূর্বানুমতি ছাড়া কোনো চিকিৎসক, নার্স, টেকনোলজিস্ট ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে গ্রেফতার করা যাবে না। শুধুমাত্র অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য হবে, তবে তা অভিযোগ দাখিলের নবাংই দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে হবে।

স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা: বাংলাদেশ পুলিশের অধীনে একটি নির্দিষ্ট ইউনিট থাকবে যেখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সংরক্ষিত কিছু পুলিশ থাকবেন (যাদের মেডিকেল পুলিশ বলা যেতে পারে) যারা জরুরী পরিস্থিতিতে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। হাসপাতাল ও ক্লিনিকে অনাকাঙ্ক্ষিত হামলা, হমকি ও সহিংসতা প্রতিরোধে এই ইউনিট কাজ করবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

১২. চিকিৎসা শিক্ষা সংস্কার: [স্বল্প ও মধ্য-মেয়াদী]

চিকিৎসা শিক্ষার মানোন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত, নীতিনির্ভর এবং কাঠামোগত সংস্কার অপরিহার্য নিম্নোক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন:

জনস্বাস্থ্য চাহিদা, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, প্রতিষ্ঠান সক্ষমতা এবং World Federation for Medical Education (WFME)-এর প্রোবাল স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে দেশের সকল মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম নিয়মিত মূল্যায়ন করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন, প্রতিষ্ঠান সংখ্যা ও আসন সংখ্যা পুনর্বিন্যাস করতে হবে। মানহীন সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বন্ধ করতে হবে। তবে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষতি এড়াতে তাদের অন্যান্য স্বীকৃত মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরের (transfer) ব্যবস্থা করতে হবে। [স্বল্প মেয়াদী]

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে মৌখিক উদ্যোগে (joint venture) বাংলাদেশে মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে WFME-এর মানদণ্ড অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে। [স্বল্প মেয়াদী]

পাঁচ দিনের একাডেমিক সপ্তাহ চালু করে শিক্ষার কাঠামো উন্নত করতে হবে, যাতে ছাত্রদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষকদের ওপর কাজের চাপ কমে। ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীদের জন্য ভর্তি প্রক্রিয়ায় অপয়োজনীয় বাধা অপসারণ করে 'রেইন ড্রেইন' রোধ এবং প্রবাসী বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের দেশে ফিরে আসার সুযোগ তৈরি করতে হবে। [স্বল্প মেয়াদী]

FCPS ও MD/MS কোর্সসমূহে পাঠ্যক্রমে সমষ্টি (curricular alignment) আনতে হবে এবং দেশ-বিদেশে পারস্পরিক স্বীকৃতি (reciprocal recognition) নিশ্চিত করে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষার আন্তর্জাতিক মান বৃদ্ধি করতে হবে। [স্বল্প মেয়াদী]

মাতক ও মাতকোত্তর পর্যায়ে Competency-Based Medical Education (CBME) এবং Community-Oriented Medical Education (COME) কার্যকরভাবে চালু করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান, দক্ষতা ও পেশাগত আচরণে পূর্ণ সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। [মধ্য-মেয়াদী]

১৩. চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার: [স্বল্প ও মধ্য-মেয়াদী]

- ক. বাংলাদেশ মেডিকেল ইউনিভার্সিটি (BMU), অন্যান্য মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস (বিসিপিএস), প্রাথমিক পর্যায়ে পুরানো আটটি সরকারি মেডিকেল কলেজ এবং পরবর্তীতে সকল মেডিকেল কলেজ, ও বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহের জন্য Bangladesh Health Commission (BHC) - এর Medical Education Wing-এর অধীনে পৃথক ও স্বায়ত্তশাসিত শাসন কাঠামো গঠন করা হবে। বাংলাদেশ মেডিকেল ইউনিভার্সিটি আইনের সংস্কার করে কার্যকর পরিচালন কাঠামো নিশ্চিত করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]
- খ. বাংলাদেশ মেডিকেল ইউনিভার্সিটি ও অন্যান্য মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়-সংযুক্ত হাসপাতালসমূহ (University Hospitals) সরাসরি প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে নিজস্ব বোর্ড অব গভর্ন্যান্স-এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে, যাতে নীতিনির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত হয়। [মধ্য-মেয়াদী]
- গ. ভবিষ্যতে একক ও সমন্বিত কাঠামোর ভিত্তিতে একটি স্বায়ত্তশাসিত মেডিকেল ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যিক, যা দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার সামগ্রিক ও সমন্বিত উন্নয়ন ও গবেষণাকে সুসংহতভাবে এগিয়ে নিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। [মধ্য-মেয়াদী]
- ঘ. বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস (বিসিপিএস) - কে পরিগণ্য (Deemed) বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব করা হচ্ছে। বিসিপিএস-এ কাউন্সিল সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রতিটি বিশেষজ্ঞ শাখার প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে, যাতে নীতিনির্ধারণে পেশাগত অন্তর্ভুক্তি ও বহুমাত্রিকতা বজায় থাকে। এই কাঠামোর আওতায় বিসিপিএস -এর প্রতিটি ফ্যাকাল্টি সাব-কলেজে রূপান্তরিত করে একাডেমিক স্বায়ত্তশাসনসহ প্রশ্ন ব্যাংক, পাঠ্যক্রম উন্নয়ন ইউনিট ও রিসার্চ কোঅর্ডিনেশন সেল পরিচালনা করবে। [মধ্য-মেয়াদী]
- ঙ. NICVD, NITOR, NIKDU, ICMH, NIMH, NICRH, NIDCH, NIPSOM, IEDCR, IPH, IPHN ইত্যাদি সহ জাতীয় বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে এবং প্রধানদের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদায় নিয়োগ করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]
- চ. স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলি এনজিও ব্যুরোর পরিবর্তে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশনের মাধ্যমে সরাসরি স্থানীয় ও বিদেশি তহবিল গ্রহণ করতে পারবে এবং তা গবেষণা ও সেবা প্রদানে সঠিকভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরকারের নিয়মিত অডিট কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। [মধ্য-মেয়াদী]
- ছ. সকল টারশিয়ারি ও কোয়ার্টার্নারি হাসপাতালসমূহে ইলেকট্রনিক মেডিকেল রেকর্ড চালু করে চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় গতি, নির্ভুলতা ও ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

- জ. সেবা প্রদানকারী হাসপাতাল ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণ প্রদানকারী হাসপাতালকে, ধারণা ও কার্যক্রমের ভিত্তিতে, পৃথকভাবে পরিচালনা করতে হবে। মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং অন্যান্য শিক্ষা-প্রশিক্ষণ হাসপাতালগুলোর কাঠামোগত সংস্কার করতে হবে, যাতে তাদের প্রধান কার্যক্রম শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়নের উপর কেন্দ্রীভূত হয়। ফলে চিকিৎসা শিক্ষা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে উৎকর্ষতা অর্জনের পথ প্রশস্ত হবে এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থায় জ্ঞানভিত্তিক অগ্রগতি নিশ্চিত করা যাবে। [মধ্য-মেয়াদী]
- ঝ. সরকারি মেডিকেল কলেজসমূহে অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার অধ্যক্ষের নেতৃত্বে একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হবে, যা কলেজ ব্যবস্থাপনা, কলেজের কোর্স কারিকুলাম, তার বাস্তবায়ন ও শিক্ষার মান নিশ্চিত করবে। [স্বল্প-মেয়াদী]
- ঞ. প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ আইন সংস্কার: স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সরকারি তহাবধান নিশ্চিত করতে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ আইনের আওতায় বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সার্ভিস থেকে কো-চেয়ারপারসন হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

১৪. জনবল সংস্কার : [মধ্য-মেয়াদী]

- ক) যেসব বিষয়ে জনবল সংকট প্রকট (যেমন: মেডিকোলিগ্যাল, অন্যান্য ক্লিনিক্যাল ও বেসিক সাবজেক্ট), সেখানে আগ্রহ সৃষ্টি ও জনবল ধরে রাখতে বিশেষ ভাতা এবং উপযুক্ত আর্থিক ও অন্যান্য প্রগোদনার ব্যবস্থা করতে হবে।
- খ) সকল বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র পূর্ণকালীন শিক্ষক ক্যাটেগরি চালু করতে হবে। এই ক্যাটেগরির জন্য নন-প্র্যাকটিসিং ভাতা ও অতিরিক্ত প্রগোদনা প্রদান করতে হবে, যাতে শিক্ষকরা শিক্ষা ও গবেষণায় পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারেন। এর ফলে এই খাতে দীর্ঘমেয়াদে পেশাগত উৎকর্ষতা নিশ্চিত করা যাবে।
- গ) স্বাস্থ্য অবকাঠামোর বিভিন্ন শরে প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি করতে হবে। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে বেতন ভাতাদি দিতে হবে। পদোন্নতির জন্য যোগ্যতা, দুর্গম এলাকায় সেবা ও প্রশিক্ষণ, এবং নির্ধারিত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী সেবা প্রদান-কে বিবেচনা করা হবে; এর ব্যত্যয় ঘটলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ঘ) দুর্গম এলাকায় সেবা প্রদানের জন্য সেবা প্রদানকারীদের বিশেষ ভাতা এবং বসবাসের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ঙ) প্রস্তাবিত ‘বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস’ কাঠামো এবং অন্যান্য সেবা ও পরিষেবা সংক্রান্ত সুপারিশের আলোকে সারাদেশে স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় জনবলের ধরন ও পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বিদ্যমান শূন্যপদগুলো, প্রয়োজনে ব্যক্তিখাতের সেবাপ্রদানকারীদের চুক্তির মাধ্যমে, অবিলম্বে পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় নতুন পদ সৃষ্টি ও জনবল নিয়োগের উদ্যোগ নিতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

১৫. স্বাস্থ্যসেবায় সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয়: [স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী]

- ক. বাংলাদেশে একটি কার্যকর ও টেকসই স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে, সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ, মান ও দক্ষতা বাড়াতে সামাজিক ব্যবসার মডেল প্রয়োগের জন্য সঠিক নীতিমালা ও অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এতে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে এবং উন্নতোত্তর বৃদ্ধি পাবে, স্বাস্থ্যসেবা জনমুদ্রী ও সহজলভ্য হবে এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা আরও কার্যকর ও টেকসই হবে। [মধ্য-মেয়াদী]
- খ. বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক কেন্দ্র ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের লাইসেন্সিং ও প্রশাসনিক কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য একটি “একক সেবা কেন্দ্র” চালু করতে হবে। করছাড়, প্রগোদনা ও সহজতর নীতিগত সহায়তার মাধ্যমে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]
- গ. মাননির্ভর গ্রেডিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং এজন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সেবার স্বীকৃতিতে অ্যাক্রিডিটেশন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, যেখানে নিবিড় পরিচর্যা ইউনিট (ICU) ব্যবহারের মান, হাসপাতালে সংক্রমণের হার ও অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবস্থাপনার ওপর নজরদারি থাকবে। প্রতিটি ৫০ শয়ার হাসপাতালে একজন সিনিয়র চিকিৎসকের নেতৃত্বে ব্যবস্থাপনা বোর্ড গঠনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সেবার মান ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের তদারকি ও সেবার পরিমাণ, মান ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং অপ্রয়োজনীয় সেবা ও প্রেসক্রিপশন মান নিয়ন্ত্রণে, অন্যন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সাথে, মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন, ক্লিনিকাল সেবা অধিদপ্তরের (প্রস্তাবিত) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিকস)। [স্বল্প-মেয়াদী]

ঘ. বেসরকারি হাসপাতাল সম্প্রসারণ: রোগীদের বিদেশমুখিতা রোধ ও দেশে আঞ্চনিকরশীল চিকিৎসা ব্যবস্থার সম্পর্কে প্রশিক্ষিত (কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট ও অন্যান্য অঙ্গ প্রতিস্থাপন, ক্যান্সার, কার্ডিয়াক সার্জারি, বক্স ইত্যাদি)-র উন্নয়ন, চিকিৎসায় করছাড়, আমদানিতে সুবিধা ও অর্থনৈতিক প্রগতিনা দিতে হবে। প্রয়োজনে সরকার বেসরকারি খাতের সাথে অংশীদারিত (PPP) ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন, বুঁকি বটন ও সেবার মান উন্নয়ন করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

১৬. স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জন্য বেতন বোর্ড: [স্বল্প-মেয়াদী]

বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশনের অধীনে ইন্টার্ন চিকিৎসক, ম্যাটকোত্তর ছাত্র-ছাত্রী (ভাতা), বেসরকারি চিকিৎসক, নার্স, ও সব ধরনের স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য একটি সুসংগঠিত এবং যুগোপযোগী বেতন কাঠামো প্রণয়ন করতে হবে। এই কাঠামো প্রণয়ন করলে, কর্মীদের আর্থিক স্থায়ীত এবং চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এটি স্বাস্থ্য সেবা কর্মীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী উৎসাহ এবং কাজের পরিবেশের উন্নতি করতে সহায়তা করবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

১৭. সমর্থিত ও সরক্ষিত স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা: [স্বল্প-মেয়াদী] ও [মধ্য-মেয়াদী]

বাংলাদেশে একটি সম্পূর্ণ কাগজবিহীন স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে স্বাস্থ্যখাতের সব সেবা ও ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে রূপান্তর করতে হবে।

ক) স্বাস্থ্য তথ্যকে একটি রাষ্ট্রীয় সম্পদ, জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত ও নাগরিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। এজন একটি স্বাস্থ্য তথ্য সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করতে হবে যেন ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। সরকার, বেসরকারি খাত ও সুশীল সমাজের অংশগ্রহণে একটি জাতীয় স্বাস্থ্য তথ্য পরিষদ গঠন করতে হবে, যাতে একটি শক্তিশালী স্বাস্থ্য তথ্য শাসন কাঠামো গড়ে ওঠে এবং ও জৰাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। [স্বল্প-মেয়াদী]

খ) বিদ্যমান খত্তিত, অপর্যাপ্ত এবং বিদেশি প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থা থেকে সরে এসে একটি একীভূত ডিজিটাল স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা (প্ল্যাটফর্ম) ‘স্বাস্থ্য-সেতু’ গড়ে তুলতে হবে, যা সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করবে। এই প্ল্যাটফর্মে প্রতিটি নাগরিকের জন্য ইউনিক হেলথ আইডি চালু করতে হবে, যার সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে একটি স্মার্ট ‘স্বাস্থ্য-চাবি’ কার্ড, যাতে রোগীর যাবতীয় স্বাস্থ্যতথ্য ও সেবার ইতিহাস থাকবে। এই প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত থাকবে: ‘স্বাস্থ্য-বৃত্তান্ত’: একটি ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ড (EHR) ব্যবস্থা, যেখানে প্রতিটি নাগরিকের চিকিৎসা ইতিহাস, প্রেসক্রিপশন, ল্যাব রিপোর্ট ও চিকিৎসকের পরামর্শ ডিজিটালি সংরক্ষিত থাকবে; ‘স্বাস্থ্য-চিত্র’: ডিজিটাল রেডিওলজি ও ইমেজিং শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম, যাতে এক হাসপাতালের করা এক্স-রে বা সিটি স্ক্যান সহজে অন্য কোথাও দেখা ও বিশ্লেষণ করা যায়; ‘স্বাস্থ্য-উপকরণ’: লজিস্টিক ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্ম, যা ওষুধ, পরিকল্পনা-নিরীক্ষার সামগ্রী ও চিকিৎসা সরঞ্জামের স্টক ট্র্যাকিং ও স্বয়ংক্রিয় চাহিদা নিরূপণে ব্যবহৃত হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

গ) সারাদেশে একটি একীভূত ই-প্রেসক্রিপশন ব্যবস্থা চালু করতে হবে - যা ‘স্বাস্থ্য-সেতু’-র সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত থাকবে। সকল চিকিৎসকের জন্য এই একীভূত ই-প্রেসক্রিপশন ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও অন্যান্য সহায়তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। [স্বল্প-মেয়াদী]

ঘ) সারাদেশে ‘স্বাস্থ্য-সাক্ষরতা’ কর্মসূচি চালু করে জনগণকে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা ব্যবহারে সক্ষম করে তুলতে হবে। গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য চালু করতে হবে একটি mHealth অ্যাপ ‘স্বাস্থ্য-বিকাশ’, যার মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরামর্শ, ভ্যাকসিন নোটিফিকেশন, গর্ভবতী মা ও শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট বার্তা, এবং টেলিমেডিসিন সেবা সরাসরি মোবাইলে পাওয়া যাবে। ডিজিটাল স্বাস্থ্য প্রকৌশলকে একটি স্বতন্ত্র পেশাগত ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি খাতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

ঙ) সকল সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ও পরিষেবাগুলোকে (জাতীয় ফার্মেসি নেটওয়ার্ক, জাতীয় ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি নেটওয়ার্ক, জাতীয় রক্ত সঞ্চালন নেটওয়ার্ক এবং জাতীয় অ্যামুলেশ নেটওয়ার্ক) ধাপে ধাপে ‘স্বাস্থ্য-সেতু’-তে একীভূত করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও হাসপাতালের বহির্বিভাগ সেবা, নির্ধারিত অন্তঃবিভাগ সেবা, জাতীয় ফার্মেসি নেটওয়ার্ক, ইত্যাদিকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে। [স্বল্প-মেয়াদী]

চ) প্রতিটি বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ‘স্বাস্থ্য-সেতু’-তে সংযুক্ত হতে বাধ্য করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

- ছ) স্বাস্থ্যখাতের তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ সক্ষমতা বাড়াতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে রোগভিত্তিক নিবন্ধন (Disease Registry) চালু করতে হবে, যাতে রোগ প্রবণতা, জটিলতা ও খরচ বিশ্লেষণ করা যায়। এক্ষেত্রে ক্যান্সার, কিডনি ডায়ালাইসিস, ডায়াবেটিস, অবস্ট্রেটিক ফিস্টুলা, বিরলরোগ, ইত্যাদিকে প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে AI ও মেশিন লার্নিং একীভূত করে ভবিষ্যৎ ঝুঁকি শনাক্ত ও প্রতিরোধমূলক পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। এর জন্য একটি স্বতন্ত্র হেলথ ইনফরমেটিক্স ইউনিট গঠন প্রয়োজন, যারা এই বিশ্লেষণগুলো করে নীতিনির্ধারকদের সিদ্ধান্তে সহায়তা করবে। [মধ্য-মেয়াদী]

১৮. স্বাস্থ্যখাতে পর্যাপ্ত, ন্যায্য ও টেকসই অর্থায়ন:

- ক) স্বাস্থ্যখাতে পর্যাপ্ত, ন্যায্য এবং টেকসই অর্থায়ন নিশ্চিত করতে একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে হবে, যা “স্বাস্থ্যখাতে টেকসই অর্থায়ন আইন” নামে পরিচিত হতে পারে। এর মাধ্যমে একটি আইনগত বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যাবে, যাতে সরকার প্রতি বছর মোট জাতীয় আয়ের (GDP) অন্তত ৫ শতাংশ স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ দিতে বাধ্য থাকে। এছাড়া, এই আইন নিশ্চিত করবে যে, স্বাস্থ্যখাত বার্ষিক বাজেটের সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্তি খাতের একটি হিসেবে বিবেচিত হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]
- খ) জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিকে এমনভাবে সংশোধন করতে হবে যাতে স্বাস্থ্যকে একটি পাবলিক গুড (public good) এবং মেরিট গুড (merit good) হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। একে জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং টেকসই উন্নয়নের একটি কৌশলগত চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এই নীতিমালায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে যে, সকল অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ, জাতীয় কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত টিকা, অত্যাবশ্যকীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং স্বাস্থ্য তথ্যবস্তু- এসবই জাতীয় নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও সহনশীলতা জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ উপাদানগুলোতে আননির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ রাখ্তের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]
- গ) একটি পর্যাপ্ত, ন্যায্য ও টেকসই অর্থায়ন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে “সকল নীতিতে স্বাস্থ্য” (Health in All Policies - HiAP) এই ধারণাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। HiAP -এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য—জাতীয় ও খাতভিত্তিক নীতি প্রণয়ন ও পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যখাতে অবদান এবং স্বাস্থ্য প্রভাব মূল্যায়ন (health impact assessments) বাধ্যতামূলক করতে হবে; স্বাস্থ্যবান্ধব রাজস্ব নীতি (health-promoting fiscal policies) গ্রহন করতে হবে।
- ঘ) স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়ন কৌশলকে সার্বিকভাবে পরিবর্তন করতে হবে, যেখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে এর মূল ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করে ব্যক্তিপর্যায়ে ব্যয়ের ঝুঁকি, বিশেষ করে বিপর্যয়কর চিকিৎসা ব্যয় কমাতে লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসূচি চালু করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]
- ঙ) কর আদায় সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ট্যাক্স-টু-জিডিপি অনুপাত বাড়াতে হবে, এবং সর্বোচ্চ আয়শ্রেণি থেকে আদায়কৃত করের অন্তত ৫% স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দের জন্য নির্ধারিত করতে হবে। স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ভোগ্যপণ্যের ওপর আবগারি কর আরোপ/বৃদ্ধি করতে হবে এবং স্বাস্থ্যখাতে এর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বরাদ্দ দিতে হবে। অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসবহুল পণ্য ও সেবার ওপর পৃথক স্বাস্থ্য কর চালু করতে হবে। জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা তহবিল (National Health Impact Fund) গঠন করতে হবে এবং বড় করপোরেট প্রতিষ্ঠানের CSR বাজেটের নির্দিষ্ট অংশ (>20 শতাংশ) বাধ্যতামূলকভাবে এই তহবিলে জমা করতে হবে। স্বাস্থ্যখাতের অর্থায়নের জন্য উন্নতবন্নী উৎস হিসেবে সামাজিক ব্যবসা মডেল এবং প্রবাসী বাংলাদেশি ডিসপ্রে বড় গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে।
- চ) সরকারি রাজস্বে শতভাগ অর্থায়নের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে সর্বজনীন ও বিনামূল্যে নিশ্চিত করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]
- ছ) ব্যয়বহুল চিকিৎসায় আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা ‘স্বাস্থ্য-কবচ’ চালু করতে হবে। এই বীমা কাঠামোতে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে বিপর্যয়কর ব্যয়ের প্রধান কারণ—যেমন ক্যান্সার, হৃদরোগ, কিডনি ডায়ালাইসিস ও মারাওক দুর্ঘটনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রাথমিকভাবে সকল সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবী ও তাদের পরিবারবর্গ, এবং সরকারি ব্যবস্থাপনায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বাধ্যতামূলকভাবে ‘স্বাস্থ্য-কবচ’-এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী] অনানুষ্ঠানিক খাতকে ধাপে ধাপে এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সামাজিক স্বাস্থ্যবীমা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করা। সার্বজনীন স্বাস্থ্য বীমার জন্য একটি স্বাস্থ্য বীমা কর্তৃপক্ষ গঠন করা। [মধ্য-মেয়াদী]
- জ) প্রয়োজন ও চাহিদাভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে স্বাস্থ্য বাজেটের $>50\%$ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

- ঝ) জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা অফিস (NHSO) গঠন করতে যাতে কৌশলগত ক্রয়ক্ষমতা (STRATEGIC PURCHASING) জোরদার হয় এবং ‘স্বাস্থ্য-কবচ’ এর যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হয়। [মধ্য-মেয়াদী]
- ঞ) কার্যকরিতা ও ব্যয়-সাশ্রয়িতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি স্বাস্থ্য প্রযুক্তি মূল্যায়ন ইউনিট (HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT – HTA UNIT) গঠন করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]
- ঠ) স্বাস্থ্যখাতের সকল ক্রয়ে বাধ্যতামূলক ই-জিপি (ELECTRONIC GOVERNMENT PROCUREMENT – E-GP) চালু করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]
- ড) সরকারি হাসপাতালসমূহে ধাপে ধাপে আর্থিক স্বায়ত্ত্বাসন চালু করে ব্যবহারকারী ফি সংরক্ষণ ও হাসপাতালের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সরঞ্জাম ক্রয়ে ব্যবহারের ক্ষমতা দিতে হবে। পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে স্বাধীনতার পরিসর বাড়ানো যেতে পারে। [মধ্য-মেয়াদী]
- ঢ) ব্যয়-সাশ্রয়িতা বৃদ্ধি ও অপচয় রোধের জন্য নিম্নলিখিত বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবেঃ
- হাসপাতাল ও প্রাথমিক সেবাকেন্দ্রে লিনিক্যাল ফার্মাসিস্ট নিয়োগ করতে হবে যাতে ওষুধের যৌক্তিক ব্যবহার ও ব্যয়-সাশ্রয়িতা নিশ্চিত করা যায়। [স্বল্প-মেয়াদী]
 - ‘ন্যাশনাল এসেনশিয়াল ডায়াগনস্টিক লিস্ট’ প্রণয়ন করতে হবে এবং এই নির্ধারিত পরীক্ষাগুলোর জন্য স্থান ও প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে মূল্য নির্ধারণ করে দিতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]
 - জরুরি সেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে একটি জাতীয় অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]
 - রেফারেল ব্যবস্থাকে কাঠামোবদ্ধ, বাধ্যতামূলক ও কার্যকর করতে হবে। সরকারি হাসপাতালে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত প্রাথমিক সেবা চিকিৎসকের রেফারেল বাধ্যতামূলক করতে। এই বাধ্যবাধকতা জরুরি চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। [স্বল্প-মেয়াদী]
 - ওষুধ ব্যবস্থাপনা, যুক্তিসংজ্ঞাত ব্যবহার ও ব্যয়-সাশ্রয়িতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সার্বিকভাবে ‘ই-প্রেসক্রিপশন’ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]
 - সকল সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ব্যক্তি পর্যায়ে সেবাদানকারী চিকিৎসকদের মধ্যে প্রেসক্রিপশন নিরীক্ষা চালু করতে হবে এবং নিরীক্ষার ফলাফল ব্যবহার করে আর্থিক অপচয় রোধ ও সেবার মান উন্নয়নে নিয়মিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

১৯. ঔষধ ও প্রযুক্তি: [মধ্য-মেয়াদী]

জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের বিবেচনায় মানসম্মত এপিআই, ভ্যাকসিন, আইভিডি, এবং মেডিকেল ডিভাইস উৎপাদনে দেশীয় স্বনির্ভরতা অর্জন করতে হবে। বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং আমদানি নির্ভরতা কমাতে এই খাতে গবেষণা ও উৎপাদন সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। প্রয়োজনে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের যৌথ বিনিয়োগে উৎসাহ দিতে হবে। এজন্য পর্যাপ্ত প্রযোদনা, স্বল্পসুদূরের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ, ট্যাঙ্ক ও ভ্যাট ছাড়সহ প্রয়োজনীয় নীতিগত সুবিধা প্রদান করতে হবে। দেশীয় শিল্প যখন নির্ধারিত উৎপাদন সক্ষমতা ও চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে, তখন উচ্চহারে আমদানি শুল্ক আরোপের মাধ্যমে আমদানি ধাপে সীমিত এবং পরবর্তীতে নিরুৎসাহিত করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

২০. বিদেশে চিকিৎসা নির্ভরতা হ্রাস এবং মেডিকেল ট্যুরিজম উন্নয়ন:

প্রতিবছর বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং বিদেশগামী রোগীর সংখ্যা হাসের লক্ষ্যে একটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। ক্যান্সার চিকিৎসা, অঙ্গ প্রতিস্থাপন সার্জারি, হৃদরোগ, জটিল কিডনি রোগ, বক্ষ্যাত্র ব্যবস্থাপনা এবং উন্নত রোগনির্ণয়ের জন্য আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন উৎকর্ষকেন্দ্র (Centers of Excellence) প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেয়া হবে, যাতে দেশেই উচ্চমানের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা যায়। এই উদ্যোগের জন্য পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP)-কে উৎসাহ দিতে হবে এবং উচ্চপ্রযুক্তি-নির্ভর বিশেষায়িত হাসপাতালে বিনিয়োগ সহযোগিতা করতে হবে। দক্ষ জনবল উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক স্থীরূপি (যেমন: JCI, ISO) অর্জন এবং সেবার মানোন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় স্বাস্থ্যসেবায় জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পাবে। [মধ্য-মেয়াদী]

একইসঙ্গে, মেডিকেল ট্যুরিজম সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি আঞ্চলিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিকল্পিত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এ জন্য রোগনির্ণয়ের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য দেশের পুরাতন ল্যাবরেটরীগুলির দক্ষতা বৃক্ষি করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

২১. ফুড, ড্রাগ, ও আইভিডি-মেডিকেল ডিভাইস প্রশাসন গঠন:

একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে তিনটি শাখা থাকবে: ঔষধ-টিকা-প্রসাধনী, আইভিডি-মেডিকেল ডিভাইস, ও নিরাপদ খাদ্য। [স্বল্প-মেয়াদী]

- ক. ঔষধ-টিকা-প্রসাধনী খাতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে প্রতি দুই বছর অন্তর অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের তালিকা পর্যালোচনা, অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট (API)-এর মান নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিতকরণ, স্থানীয় রোগীদের উপর ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ও বায়োএভেলিভিলিটি পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত নিরপেক্ষ নিরীক্ষা কর্মসূচি গঠন, এবং বৈদেশিক যৌথ বিনিয়োগকে উৎসাহ প্রদান। [মধ্য-মেয়াদী]
- খ. আইভিডি-মেডিকেল ডিভাইস খাতে মধ্য-মেয়াদে টেলিমেডিসিন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন একটি মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি, নীতিমালা হালনাগাদ, স্থানীয় উন্নাবনকে উৎসাহ প্রদান, পুরনো যন্ত্রপাতি পরিত্যাগ এবং বৈদেশিক যৌথ বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]
- গ. খাদ্য নিরাপত্তা খাতে সংক্ষিপ্ত-মেয়াদে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (Food Safety Authority)-কে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্থানান্তর, ২০১৩ সালের খাদ্য আইন হালনাগাদ, খাদ্য উৎপাদন ও বিপণনে ট্রেসেবিলিটি চালু, স্থানীয় পর্যায়ে অফিসার নিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড নিশ্চিতকরণ। [স্বল্প-মেয়াদী]
- ঘ. চিকিৎসক-ফার্মাসিউটিক্যাল সম্পর্কিত নীতি: [মধ্য-মেয়াদী]

World Medical Association (WMA)-এর প্রস্তাবনার আলোকে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা দেয়া হচ্ছে, যাতে করে মধ্য-মেয়াদে একটি নেতৃত্বিক ও ভারসাম্যপূর্ণ চিকিৎসক-ফার্মাসিউটিক্যাল সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়:

১. ঔষধের নমুনা বা উপহার প্রদান করে কোনো ধরনের প্রভাব বিষ্টারের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে; ২. মেডিকেল কনফারেন্স আয়োজনের পূর্বে অবশ্যই বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (BMEAC) অনুমোদিত CPD ক্রেডিট পয়েন্ট গ্রহণের জন্য আবেদন করতে হবে এবং মেডিক্যাল কনফারেন্সের সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব ট্যাঙ্ক অফিসে জমা দিতে হবে এবং এর একটি কপি বিএমইএসি-তে জমা দিতে হবে; ৩. কনফারেন্সে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির অংশগ্রহণ:- ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো অনুমোদিত কনফারেন্সে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে পারবে, তবে কেবলমাত্র প্রদর্শনী এলাকায় পণ্যের উপস্থাপনার জন্য তাদের প্রতিনিধির শারীরিক উপস্থিতি অনুমোদিত থাকবে। কোনো ধরনের খাবার, উপহারের ব্যাপ বা অন্য কোনো উপহার সামগ্রী সরবরাহ ও ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধূলা, রাফেল ড্র ইত্যাদি করতে পারবে না; ৪. ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো শুধুমাত্র ডাক্তারদের ই-মেইল বা ডাক্যুমেন্টের মাধ্যমে তাদের পণ্য সম্পর্কিত তথ্য পাঠাতে পারবে। প্রতিনিধিরা সরাসরি সাক্ষাতের মাধ্যমে দৈনন্দিন প্রোডাক্ট প্রমোশন করতে পারবে না; ৫. চিকিৎসকের চেষ্টার বা হাসপাতাল প্রাঙ্গণে কোনো ধরনের ঔষধের/ পণ্য প্রচার কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে, কারণ এসব কর্মকাণ্ডে চিকিৎসকের মনোযোগ বিস্তৃত হয় এবং রোগীরা সঠিকভাবে চিকিৎসাসেবা থেকে বাস্তিত হন; ৬. চিকিৎসকদের যেকোনো পেশাগত সংগঠন, যেমন—চিকিৎসক সমিতি, পেশাগত সংস্থা বা বিশেষজ্ঞ সমাজ (Professional Associations or Societies)—এ কোনো ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে থাকতে পারবে না; ও ৭. নতুন ওষুধ বা নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্য থাকলে তা প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক না করে কেন্দ্রীয়ভাবে নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক সভার মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

২২. ক্রয় ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কার: [মধ্য-মেয়াদী]

ই-জিপি চালু, স্বাধীন নিরীক্ষা, স্বাস্থ্য সমস্যার আলোকে স্থানীয়ভাবে বাস্তবসম্মত বাজেট ব্যবস্থাপনা, পারফরম্যান্সভিত্তিক প্রগোদ্ধন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর চাহিদা পূর্বাভাস চালু করতে হবে এবং সে অনুযায়ী ক্রয় সংগ্রহ কাজ সম্পাদিত হতে হবে। বাজেট প্রাক্কলনে উন্নয়ন, রাজস্ব ও পরিচালনা ভিত্তিক বাজেট এক সাথেই প্রতিফলিত হতে হবে। স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনার সকল স্তরে জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা, বাজেট, ও কর্মসূচীর পর্যালোচনা করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

২৩. দুর্নীতি প্রতিরোধ :

- ক. প্রতিটি মহাপরিচালকের দপ্তরে অবস্থিত স্বাধীন ইন্টারনাল অডিট ইউনিট অধিকতর শক্তিশালী এবং কার্যকর করতে হবে।
[স্বল্প-মেয়াদী]
- খ. কোন চিকিৎসক প্রয়োজনের অভিভিত্তি হাসপাতাল সেবা, ঔষধ, রোগ নির্ণয়ক পরীক্ষার পরামর্শ দিবেন না। কোন ঔষধ কোম্পানীর প্যাডে ঔষধের নির্দান (প্রেসক্রিপশন) লিখবেন না।

২৪. আস্ত্র গবেষণা: [স্বল্প-মেয়াদী]

দেশের স্বাস্থ্য গবেষণার নেতৃত্বক মান উন্নয়ন ও প্রমিতকরণ, গবেষণা সংক্রান্ত নীতিমালা ও গাইড লাইন প্রণয়ন, গবেষণা অনুদান ব্যবস্থাপনা, যথাযথ আইনের অধীনে BMRC-র অবকাঠামোগত ও আর্থিক-প্রশাসনিক সামর্থ বৃদ্ধির সুপারিশ করা হলো। জাতীয় বাজেটের স্বাস্থ্যখাতের বরাদ্দের নুন্যতম ২.৫% স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণার জন্য ব্যয় করতে হবে। এক্ষেত্রে মেডিকাল বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং দেশীয় স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বাস্থ্য গবেষনায় উৎসাহ দিতে হবে, প্রয়োজনে কারিগরি সহায়তা প্রদান করতে হবে, এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে গবেষণার জন্য অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে [স্বল্প-মেয়াদী]

২৫. নারী স্বাস্থ্য: [মধ্য-মেয়াদী]

নারীর সামগ্রিক স্বাস্থ্য ও সুস্থৃতা নিশ্চিত করতে ‘জাতীয় নারীস্বাস্থ্য ইনসিটিউট’ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই প্রতিষ্ঠান বিশেষায়িত সেবা প্রদান, সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি হাসপাতালের জন্য রেফারেল কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে এবং তাকে স্বাস্থ্যকর্মীদের নারী স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এটি নারীর স্বাস্থ্যসংক্রান্ত উপক্ষিত ও জটিল সমস্যার সমাধানে নেতৃত্ব দেবে এবং নারীস্বাস্থ্যকে জাতীয় অগ্রাধিকারের পর্যায়ে উন্নীত করবে। মা, শিশু, কৈশোরকালীন ও বিশেষ প্রয়োজনে থাকা ব্যক্তিদের জন্য উপযোগী ও সম্মানভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে। এইসব জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনভিত্তিক ও সংবেদনশীল সেবা-প্রদান ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত না হন এবং তাদের অধিকার নিশ্চিত হয়। তদপুরি নারীস্বাস্থ্যে সরকারি ও ব্যক্তিগত অলাভজনক প্রতিষ্ঠান বা ইনসিটিউট গুলোকে উৎসাহিত করতে হবে এবং সরকারি সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। একই সাথে শিশু, কিশোর-কিশোরী ও বৃদ্ধদের মানসিক সুস্থৃতি, রোগ, মানসিক ও শারীরিক গড়ন, বৃদ্ধিবৃত্তি, চিন্তা-চেতনা, সামাজিকতা ইত্যাদি বিষয়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টিকে প্রাধান্য দিতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

২৬. জলবায়ু ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্ঘাগে শিশু, কিশোর-কিশোরী, মহিলা ও গর্ভবতীদের জন্য সম্মানজনক পরিবেশের নিশ্চয়তা দিতে হবে এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে দুর্ঘাগ-নিরোধক ও নারী, শিশু, কিশোর-কিশোরী ও বয়স্ক বাস্তব হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

২৭. বাংলাদেশের বাইরে কর্মরত সকল চিকিৎসক, নার্স, প্রযুক্তিবিদ এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা পেশাজীবীদের দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ ও উন্নয়নের জন্য তাদের মূল্যবান দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরে আসার জন্য আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য একটি বিশেষ নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে, যা প্রত্যাবর্তনকারী পেশাজীবীদের প্রয়োজনীয় সুবিধা ও সহায়তা প্রদান করবে। [মধ্য-মেয়াদী]

২৮. ক) সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও বেশ কিছু দীর্ঘস্থায়ী জটিল ব্যাধির অতি দুর্ত হার বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলির রেজিস্ট্রি তেরি করার প্রয়োজনীয়তা জরুরি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এই রেজিস্ট্রি, সঠিক পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে, এসকল ব্যাধির চিকিৎসা ও প্রতিরোধ পরিকল্পনায় প্রচুর ভূমিকা রাখতে পারে।

খ) উপরোক্ত সুপারিশের ধারাবাহিকতায়, অগ্রাধিকারভিত্তিতে, অত্যন্ত ব্যয়বহুল মরণব্যাধি ক্যান্সারকে প্রথমে নির্বাচন করে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করার সুপারিশ করা হচ্ছে। এর আওতায়, জেলা ও উর্ধ্বতন সকল সরকারি হাসপাতাল এবং ১০০ শয়ার অধিক বেসরকারি হাসপাতালে প্রাথমিক ক্যান্সার শনাক্তকরণ কেন্দ্র স্থাপন এবং ক্যান্সার রেজিস্ট্রি চালু নিয়মিত স্ক্রিনিং কর্মসূচি চালু, ক্যান্সার শনাক্তকরণ ও চিকিৎসার জন্য হিস্টোপ্যাথোলজিস্ট, ক্লিনিক্যাল অনকোলজিস্ট, গাইনি অনকোলজিস্ট, মেডিক্যাল অনকোলজিস্ট, নার্স, টেকনোলজিস্টসহ প্রয়োজনীয় জনবল গড়ে তুলতে হবে এবং ক্যান্সার ট্রান্স্ফার্স সৃষ্টি করতে হবে। এর মাধ্যমে ক্যান্সার দুর্ত শনাক্ত, চিকিৎসা এবং মৃত্যুহার কমানো সম্ভব হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

২৯. BHC-র নির্দিষ্ট উইং-এর তদারকির মাধ্যমে সারা দেশব্যাপী রোগ-ব্যাধির নজরদারি বা সার্ভেলেন্স কার্যক্রমকে আরো গুরুত্ব দিয়ে উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে আইডি সি আর-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরো শক্তিশালী করে তুলতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

৩০. পুলিশ, শ্রমিক, জেলবন্দি, ড্রাইভার, ইত্যাদি পেশার মানুষকে জরুরী স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক দায়িত্ব পালনে সহায়তার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আন্তঃজেলা সড়কের পাশে প্রতিটি উপজেলায় ট্রিমা সেন্টার ও রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র থাকতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

৩১. নবজাতক, শিশু, কিশোর-কিশোরীর স্বাস্থ্য বিকাশ এবং মঙ্গল: [মধ্য-মেয়াদী]

একটি নিরবিচ্ছন্ন ডিজিটাল তথ্য সম্পর্কের ব্যবস্থার মাধ্যমে, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলির সার্বজনীন নজরদারি এবং সময়োচিত ও যথাযথভাবে মাধ্যমিক ও তৃতীয় পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে রেফার করার মাধ্যমে নবজাতক, শিশু, কিশোর-কিশোরীর স্বাস্থ্য, বিকাশ এবং মঙ্গল সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নিত করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

৩২. পেশাগত নিরপেক্ষতা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা: [মধ্য-মেয়াদী]

স্বাস্থ্যখাতের অস্থিতিশীলতা মোকাবেলায় পেশাগত নিরপেক্ষতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা (১৯৭৯) অনুযায়ী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। জনগণের ট্যাঙ্কের অর্থে (সরকারি অর্থে) পরিচালিত প্রতিষ্ঠান (যেমন সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান)-এর স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা এবং সরাসরি দলীয় রাজনীতি সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের নির্বাহী পদে ‘না’ রাখার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

পরিচ্ছেদ ১

ভূমিকা

স্বাস্থ্যনির্মাণ উত্তরকালে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে অনেক প্রশংসনীয় অগ্রগতি হয়েছে। মূলত টিকাদান, পুষ্টি, মা-শিশু স্বাস্থ্য, সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, একই সাথে নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা ইত্যাদি সহায়ক কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাস্থ্যক্ষেত্রের বিভিন্ন সূচকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে দেশের সংবিধান এবং জাতীয় নীতিমালা ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার (বিশেষ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি) অনুসারে সকল নাগরিকের জন্য সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে বাংলাদেশ প্রতিশুতিবদ্ধ। তবে অগ্রগতির ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিগত বছরগুলিতে স্বাস্থ্যখাতে বাংলাদেশের অগ্রগতি শ্লথ হয়েছে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পুরোপুরি থেমে গেছে কিংবা পশ্চাদমুখী হয়েছে। ফলে প্রতিশুত সময়ের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্য অর্জন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ এখনো একটি ন্যায্য (equitable), মানবিক ও টেকসই স্বাস্থ্যব্যবস্থা গঠনের পথে দৃশ্যমান বাধাগুলোকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, ক্যানসারসহ অসংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি, মানসিক স্বাস্থ্যসেবার ঘাটতি, জরুরী চিকিৎসা ও মানসম্মত সেবার অপ্রতুলতা, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং স্বাস্থ্যসেবা গ্রহনে ব্যক্তি-পর্যায়ে খরচ জনগণের ওপর তীব্র চাপ তৈরি করছে। পাশাপাশি দুর্নীতি, সক্ষমতার ঘাটতি, ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা এবং চিকিৎসা শিক্ষায় নিয়ন্ত্রণ ভবিষ্যতের জন্য একটি গুরুতর হমকি হয়ে উঠেছে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশ স্বাস্থ্যখাতে আজ এক জটিল বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছে।

জুলাই ২৪-এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্যখাতকে জনমুখি, সহজলভ্য ও সর্বজনীন করার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন গঠন করেছে। এ সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কমিশন নিয়ন্ত্রিত বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করেছে: ১) একটি ন্যায্য ও অধিকার-নির্ভর সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলা; ২) প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামো ও জনবল শক্তিশালী করা; ৩) জরুরী চিকিৎসা সেবার উন্নয়ন, ৪) স্বাস্থ্যব্যবস্থায় সুশাসন, আর্থিক স্বচ্ছতা ও দুর্নীতির প্রতি শূন্য সহনশীলতা নীতি প্রবর্তন; ৫) মানসম্পর্ক চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রযুক্তি নির্ভর চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধি; ৬) জনসাধারণের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনতে রোগী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সন্তুষ্টি এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; ও ৭) স্বাস্থ্যসেবা গ্রহনে ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যয় উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিয়ে নিয়ে আসা।

পরিচ্ছেদ ২

পদ্ধতি

একটি বহুমাত্রিক ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে এই প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণী প্রাসঙ্গিক বিবিধ তথ্য-উপাত্ত, অংশীজনের মতামত, জরিপ থেকে প্রাপ্ত জনমত এবং সরেজমিন পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য ও মতামত বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

১. প্রকাশনা পর্যালোচনা (Literature Review):

প্রাসঙ্গিক নীতিমালা, আইন, গবেষণা প্রতিবেদন এবং পরিকল্পনাগুলোর ভিত্তিতে প্রকাশনা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে জাতীয় সকল নীতি, সেট পরিকল্পনা, কৌশলপত্র, গাইডলাইন, সার্ভে ইত্যাদি। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের এবং শিক্ষাবিদ-গবেষকদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত প্রাসঙ্গিক সকল প্রকাশনাও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ ছাড়া স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় সফলতা অর্জনকারী দেশ যেমন থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর, ভারত, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রুনান্ড, ভিয়েতনাম ও কিউবার স্বাস্থ্যনীতি ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গবেষণা ও নীতিমালা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই বিশ্লেষণ স্বাস্থ্যখাতে বৈশিক ও স্থানীয় বাস্তবতা মিলিয়ে প্রাসঙ্গিক, প্রয়োগযোগ্য ও প্রমাণিতিক সুপারিশ প্রণয়নে সহায়ক হয়েছে।

২. কমিশনের কার্যালয়ে অংশীজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনা:

পরিকল্পিত একটি তালিকা অনুসারে স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে নির্দিষ্ট দিনক্ষণে কমিশন সাক্ষাৎ আলোচনা করেছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, শিক্ষাদান, গবেষণা, সামাজিক আন্দোলন, সাংবাদিকতা ইত্যাদি নানাবিধি কর্মকাণ্ডে এ সকল প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তি পর্যায়ের অংশীজনের সংশ্লেষ রয়েছে।

সাক্ষাৎ আলোচনায় অংশগ্রহণকারী অংশীজনদের মধ্যে বিভিন্ন গুপ্তভিত্তিক অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা গেছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাস্তবায়নকারী অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সঙ্গে ৭টি, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রক সংস্থার সঙ্গে ৬টি, এবং রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চিকিৎসক ও শিক্ষার্থী সংগঠনের সঙ্গে ৫টি, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ১টি, অন্যান্য সংস্কার কমিশনের সঙ্গে ২টি এবং উন্নয়ন সহযোগী (একক) গোষ্ঠীর সঙ্গে ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া উন্নয়ন সহযোগী কনসোর্টিয়ামের সঙ্গে ১টি সভা এবং পেশাজীবী ও সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে ৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ৮টি এবং শিক্ষক, গবেষক, সমাজকর্মী, সংগঠক, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সর্বোচ্চ ২০টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের অংশীজনদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. কমিশন কর্তৃক দেশের বিভিন্ন স্থানে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় সভার আয়োজন: নিজস্ব কার্যালয়ে সাক্ষাৎ মতবিনিময় ছাড়াও কমিশন দেশের বিভিন্ন স্থানে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় ও পরামর্শ সভার আয়োজন করেছে।

৪. তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যৱৰো, জাতীয় স্বাস্থ্য হিসাব (National Health Accounts) এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অসংক্রামক রোগ, মাতৃত্ব, শিশুস্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য ব্যয় এবং স্বাস্থ্যসেবা গ্রহনে ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যয়ের হার - এসব বিষয়ে বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৫. সরেজমিনে পরিদর্শন ও মতবিনিময়: কার্যালয় ও নির্দিষ্ট স্থানে আলোচনা ছাড়াও কমিশন সংশ্লিষ্ট বিবিধ প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রম পরিদর্শনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। পরিদর্শনকালে চিকিৎসক-নার্স ছাড়াও বিবিধ পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের সঙ্গে একক ও যৌথ মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করা হয় এবং সেই সঙ্গে সেবা গ্রহণকারীদের মতামত গ্রহণ করা হয়।

স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশনের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন স্থানে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব সভা চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৩০০ জন, সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২৫০ জন, শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১২০ জন, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১১৫ জন, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৯২ জন, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৫৯ জন, মুসিগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে ৫০ জন এবং রাজামাটি মেডিকেল কলেজ ও পার্বত্য এলাকার জনগোষ্ঠীসহ প্রায় ১৫০ জন প্রতিনিধি ও ব্যক্তির অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়। এই মতবিনিময় সভাগুলোর মাধ্যমে স্বাস্থ্যখাত সংস্কারে মাঠপর্যায়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সুপারিশ সংগ্রহ করা হয়েছে।

৬. জনমত জরিপ : স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশনের অনুরোধে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরো (বিবিএস) একটি জনমত জরিপ পরিচালনা করেছে। সুপারিশ প্রণয়নে এই জরিপের ফলাফল গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। জনমত জরিপটি পরিচালনার লক্ষ্যে সমগ্র দেশের আটটি বিভাগ (শহর ও পল্লী এলাকা) হতে প্রায় ৩৪৪ টি প্রাথমিক নমুনা এলাকা (শুমারি গণনা এলাকা) নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত প্রতিটি নমুনা এলাকা হতে নমুনায়নের মাধ্যমে ২৪টি সাধারণ খানা জরিপ পরিচালনার উদ্দেশ্যে নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত প্রতিটি খানা হতে ১৮ বা তড়ুর্ব বয়সী একজনের নিকট হতে নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এভাবে দেশব্যাপী প্রায় ৮২৫৬ জন নাগরিকের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ পূর্বক উক্ত জরিপের উপাত্ত বিশ্লেষণসহ রিপোর্ট প্রণয়নের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন কর্তৃক দেশের বিভিন্ন জেলার গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। চট্টগ্রামে মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, আবু নগর কমিউনিটি ক্লিনিক, শীপ বেকিং এলাকা, সিটি কর্পোরেশনের মাত্সদন হাসপাতাল এবং আগ্রাবাদ মা ও শিশু হাসপাতাল ও কলেজ পরিদর্শন করা হয়। রংপুরে তারাগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং রাজশাহীতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শিত হয়। রাঙামাটিতে শিশু বিকাশ কেন্দ্র, রাঙামাটি মেডিকেল কলেজ, কাউখালী ও কাপ্তাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ঘূরে দেখা হয়। ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বাবুগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মুসিগঞ্জের সিরাজদিখানা, শ্রীনগর ও ২৫০ শয়াবিশিষ্ট হাসপাতাল পরিদর্শিত হয়। এছাড়া সিলেটের নর্থ ইস্ট ক্যান্সার হাসপাতাল, ফেঙ্গুণ্ডি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, শাহজালাল সার কারখানা ও এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ ঘূরে দেখা হয়। ঢাকায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গ, ফেনীতে মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং কুমিল্লায় চৌদ্ধুরাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করা হয়। কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বাগেরহাটের রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও আমার গ্রাম ক্যান্সার হাসপাতাল, এবং আন্তর্জাতিক পরিম্বলে সিঞ্চাপুরে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বৈঠক ও স্বাস্থ্য স্থাপনাও পরিদর্শন করেন কমিশন। এসব সফরের মাধ্যমে কমিশন দেশের স্বাস্থ্যখাতের বাস্তব চিত্র, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা সরাসরি প্রত্যক্ষ করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ তৈরির জন্য ভিত্তি প্রস্তুত করে।

খানাভিত্তিক জরিপের প্রশ্নপত্রটি মোট সাতটি সেকশনে বিভক্ত ছিল, যার মধ্যে সেকশন ১-এ খানা সদস্যদের তালিকা ও পরিচিতি, সেকশন ২-এ জনগণের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি বিষয়ে অভিজ্ঞতা, সেকশন ৩-এ সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি সম্পর্কে মতামত এবং সেকশন ৪-এ নীতিনির্ধারণ সম্পর্কিত প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত ছিল। জরিপ কার্যক্রমে ২০২২ সালের জনশুমারি ও গৃহগণনার ভিত্তিতে প্রণীত ইন্টিগ্রেটেড মাল্টিপারপাস স্যাম্পলিং (IMPS) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। দেশের আটটি বিভাগ থেকে প্রতিটি বিভাগে ৪৩টি করে মোট ৩৪৪টি প্রাইমারি স্যাম্পলিং ইউনিট (PSU) নির্ধারণ করা হয় এবং প্রতিটি PSU থেকে ২৪টি করে মোট ৮,২৫৬টি খানার তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

এই জনমত জরিপ থেকে প্রাপ্ত মূল মতামতসমূহ:

- বিগত এক বছরে যে সমস্ত সেবাপ্রদানকারীর কাছ থেকে সেবা নেয়া হয়েছে: ১) এমবিবিএস ডাক্তার: ৭৮.২%; ২) ফার্মাসির ঔষধ বিক্রেতা: ৫.৭%; ৩) কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী: ৪.৮%; ৪) পল্লী চিকিৎসক: ৪.৭%; ৫) স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার পরিকল্পনা সহকারী: ১.৯%; ৬) মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট: ১.৭%; ৭) এফডিইভি: ১.৬%; ৮) হেমিওপ্যাথি: ১.১%; ৯) আযুর্বেদী/ ইউনানী: ০.২%।
- ঔষধের মূল্য, রোগ নির্ণয়ক পরীক্ষার মূল্য ও ডাক্তারের পরামর্শ ফী বা অন্ত্রোপচারের ফি নির্দিষ্ট করার পক্ষে মত দিয়েছেন যথাক্রমে ৯৭%, ৯৬%, ৯৬% ও ৯৫% উত্তরদাতা;
- ৯৭% উত্তরদাতা জানিয়েছেন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিনা মূল্যে দেয়া প্রয়োজন;
- শহর অঞ্চলের ওয়ার্ডগুলোতে গ্রামীণ ইউনিয়ন পর্যায়ের মত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার কেন্দ্র তৈরী করার পক্ষে মত দিয়েছেন ৯২% উত্তর দাতা;
- চিকিৎসা, স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রম তথ্য জনস্বাস্থ্য সেবা পৃথক অবকাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া উচিত, এ বিষয়ে হাঁ সূচক উত্তর দিয়েছেন ৭২% উত্তর দাতা;
- হাসপাতাল, মেডিক্যাল-নার্সিং ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্ত্বাসন চেয়েছেন ৬৬% উত্তর দাতা। একই সংখ্যক উত্তর দাতা চান যে স্বাস্থ্যসেবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো প্রশাসনিক ক্যাডারের বাইরে স্বাধীন একটি অবকাঠামো দ্বারা পরিচালিত হোক;

- প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে মত দিয়েছেন ৬৪% উত্তর দাতা;
- শূন্যপদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের পক্ষে মত দিয়েছেন ৭৬% উত্তর দাতা;
- সহায়ক পদে কর্মরতদের বদলির পক্ষে মোট দিয়েছেন ৭৬% উত্তর দাতা;
- ৪৫% ও ৩১% উত্তর দাতা চিকিৎসক কর্তৃক যথাক্রমে ঔষধের জেনেরিক নাম ও জেনেরিক এবং ব্র্যান্ড নামে লিখার পক্ষে মত দিয়েছেন;
- ৬৮% উত্তর দাতা এমবিবিএস ডাক্তার ছাড়া অন্য কারো প্রেসক্রিপশনে এন্টিবায়োটিক বিক্রী না করার পক্ষে মত দিয়েছেন;
- ৭২% উত্তর দাতা চান একজন ডাক্তার এক জন রোগীকে কম পক্ষে ১০ মিনিট থেকে ২০ মিনিট সময়দিবেন। যার বেশির ভাগ চেয়েছেন ২০ মিনিট (২৮.৫%);
- জরুরী কারণ ছাড়া রেফারেল না হলে কোন বিশেষজ্ঞ সেবা দেয়া যাবে না এ বিষয়ে একমত ৭২% উত্তর দাতা;
- জরুরী সেবার জন্য সপ্তাহের সাতদিনই সার্বক্ষণিকভাবে সরকারিভাবে অ্যাসুলেন্স সেবার ব্যবস্থা থাকতে হবে, এ বিষয়ে ৯৯% উত্তর প্রদানকারী একমত;
- স্বাস্থ্যসেবা ব্যয়ের বেশির ভাগের দায়িত্ব থাকা উচিত সরকারের এই মত ৯২% উত্তর প্রদানকারীর;
- স্বাস্থ্যহানিকর খাদ্য, পানীয়ও ভোগ্যপণ্যের উপর উচ্চহারে কর প্রয়োগ করা উচিত, একমত ৭৯% উত্তরদাতা;
- স্বাস্থ্যবীমা গ্রহণে আগ্রহী ৭১% উত্তরদাতা;
- দেশের সব মানুষের জন্য স্বাস্থ্য কার্ড প্রচলনের পক্ষে মত দিয়েছেন ৯৩% উত্তরদাতা;
- স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিচালিত একই ধরনের সেবাক্রম একীভূত করা উচিত বলে মনে করেন ৬৭% উত্তরদাতা

পরিচ্ছেদ ৩

স্বাস্থ্য সেবাদান ও ভৌত অবকাঠামো

৩.১ স্বাস্থ্যসেবা ও সেবা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সংস্কারের লক্ষ্যে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবনা

ক) জনস্বাস্থ্য সেবাভিত্তিক সংস্কার প্রস্তাবনা

৩.১.১ ১) মৌলিক তথ্যের অসম্পূর্ণতা দুরীকরণের জন্য প্রস্তাবনা: (১) রোগীদের জন্য অনন্য পরিচয়পত্র তৈরি, (২) উপজেলা-ওয়ারি জনমিতি, রোগতাত্ত্বিক, সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ, রোগীদের ও অন্যান্যদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও জ্ঞান, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ সম্পর্কিত জরিপ এবং (৩) বাজেট, পরিকল্পনা, সেবার মান ও পরিমাণ মূল্যায়নের জন্য এসব তথ্যের ব্যবহার।

- বাস্তবায়নের সময়সীমা: ক্রমিক ১ এর জন্য ২ বছর এবং ২ এর জন্য ১০ বছর।
- দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া: প্রস্তাবিত জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

৩.১.২ ২) স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, ও পুষ্টি সম্পর্কিত পরিবেবা এবং যোগাযোগ কার্যক্রমের দুর্বলতা দুরীকরণের অগ্রগণ্য বিষয়াদী: (১) সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধ-ভিত্তিক শৈশব ও কৈশোরকালীন শিক্ষা, পুষ্টি এবং বিকাশ, যুবকাল ও যৌনরোগ; নারী ও মাতৃস্বাস্থ্য; পরিবার পরিকল্পনা; বয়স্কদের স্বাস্থ্য; মানসিক স্বাস্থ্য ও আত্মহত্যা; রোগের সংক্রমণ ও অসংক্রামক রোগ; রোগীর অধিকার; পরিবেশ, (২) জুলাই আন্দোলনে আহতদের নির্ভুল চিহ্নিতকরণ ও সেবা এবং পোস্ট ট্রাম্যাটিক ডিসঅর্ডার এর সেবা, (৩) বিদ্যালয়েশাক- সবজি ও ফলদ বাগান, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পুষ্টিমেলার আয়োজন এবং ফলাদি এবং শাক-সবজির পুষ্টিগুণসম্পর্কে অবহিতি, (৪) বসতবাড়ির আশে পাশে হাঁস-মুর্গী, শাকসবজি ও ফলদ গাছের চাষ, (৫) এনজিওর সহযোগিতা, (৬) প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব, কৈশোরকালীন বিয়েবা গর্ভধারণ, সিজারিয়ান অপারেশেন/ ধাত্রীসেবা, (৭) শিশু, বৃদ্ধ এবং লিঙ্গ সহিংসতা, (৮) অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার, (৯) নিরাপদ খাদ্য; ফাস্ট-ফুড, টিন এবং প্যাকেজেজাত খাবার ও পানীয়; চিনি, লবণ এবং ট্রান্স-ফ্যাট, (১০) বর্জ্য এবং পরিবেশ, (১১) সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, মিডিয়া, শিক্ষা, ক্রীড়া, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, মৎস্য, ও পশুপালন বিভাগ, খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সমাজকল্যাণ, শিশু ও মহিলা বিষয়ক বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া, এবং স্থানীয়সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়; (১২) তামাক নিয়ন্ত্রণ।

- বাস্তবায়নের সময়সীমা: ১.৫ বছর।
- দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া: প্রস্তাবিত জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

৩.১.৩ ৩) রোগ প্রতিরোধ, স্বাস্থ্য উন্নয়ন, সীমিত প্রতিকার এবং রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রস্তাবিত কার্যক্রম: (১) টিকা এবং ওষুধ সংগ্রহের পূর্বে কার্যকারিতা পরীক্ষা, (২) জরুরী ও অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের নীতি ও নিশ্চিয়তা, (৩) বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং ঝুঁকিতে থাকা গর্ভবতী মহিলাদের AI স্টকওয়ার ভিত্তিক সহায়তা, (৪) ইপিআই কার্ড প্রদর্শনের ভিত্তিতে স্কুলে ভর্তি, (৫) শিশুর স্নায়বিক গড়ন বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ, (৬) প্রতিষ্ঠানে, দূর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্রে, অপেক্ষা কেন্দ্রে এবং জনগণের সমাগম স্থানে স্যানিটারি প্যাড ও প্রয়োজনীয়ওযুধের পর্যাপ্ততা, (৭) দূর্গম এলাকায়প্রাথমিক স্বাস্থ্যের অগ্রাধিকার, (৮) গর্ভবস্থা ও নবজাতকের বিপদজনক লক্ষণ, ক্যান্সার, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিসের জটিলতা, মানসিক রোগ, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণ সমস্যা, অপুষ্টি এবং রোগের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রাতিক কর্মীদের সক্ষমতা, (৯) বেসরকারি এবং সম্প্রদায়-ভিত্তিক সংগঠন ও সম্প্রদায়ের প্রভাবশালীদের সহায়তা গ্রহণ, (১০) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আবাসিক মেডিক্যাল অফিসারের নেতৃত্বে যৌন নির্যাতনের শিকার মানুষের পরীক্ষা, (১১) প্রাতিক কর্মীদের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রতিবন্ধক শিশু এবং পিতামাতাদের সাহায্য, (১২) কমিউনিটি ক্লিনিকে ঔষধ বিক্রী, (১৩) সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রাথমিক চিকিৎসা এবং জীবন রক্ষাকারী পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ, (১৪) শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল, (১৫) সব প্রতিষ্ঠানে ডে কেয়ার সেবা, (১৬) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র, পুলিশ বিভাগ এবং কারাগারে মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের কর্মসূচী, (১৭) বিদ্যালয়ে উন্নতবনী স্বাস্থ্য কার্যক্রম, (১৮) মহামারী, স্থানীয় সরকার আইন ও দ্য ফুড সেফটি আইনের পর্যালোচনা, (১৯) দেশব্যাপী রোগের নজরদারীর জন্য আইইডিসিআরকে শক্তিশালীকরণ, (২০) বার্ধক্য ও পুনর্বাসন পরিষেবা, বয়স্ক, অপুষ্ট শিশু ও কিশোর- কিশোরীদের জন্য পুষ্টিভাতা, (২১) দূর্যোগে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা, (২২) তথ্য, মূল্যায়ন, জরীপ, গবেষণা, (২৩) জেন্ডার-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি, দরিদ্র ও সমাজ-বাক্স সেবা সম্পর্কিত নীতি গ্রহণ, (২৪) মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের জন্য সমন্বিত ও মডিউলার আকারে প্রশিক্ষণ, (২৫) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শক্তিশালী পরীক্ষাগার, (২৬) তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম।

বাস্তবায়নের সময়সীমা: ক্রমিক ১৮ থেকে ২১ এর জন্য ৬ মাস থেকে ৮ মাস; ক্রমিক ১ ও ৩ থেকে ১০, ১২, ১৩, ২৩ ও ২৪ এর জন্য ১ বছর; ক্রমিক ২, ১১, ও ১৪, এর জন্য ২ বছর; ক্রমিক ৭, ১৫ থেকে ১৭, ২০, ও ২১ এর জন্য ৩ বছর; ক্রমিক ২২ এর জন্য ৫ বছর।

দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া:

- ক্রমিক ১৮ থেকে ২১ এর জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স।
- অন্যান্য প্রস্তাবনার জন্য : প্রস্তাবিত বাংলাদেশ স্বাস্থ্য/ হেলথ সার্ভিস (বিএইচএস), জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং পরামর্শদাতা (নীতি ও কৌশলপত্র তৈরী ও প্রশিক্ষণের জন্য)।

৩.১.৪ ৪) সঠিক কাঠামো অনুযায়ী পর্যানুসরণ, তত্ত্বাবধায়ন, কর্মসূচির মূল্যায়ন ও শিক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে তথ্যের ব্যবহার: (১) তত্ত্বাবধায়ন, পর্যানুসরণ ও মেন্টরিং কার্যক্রমকে সেবার মানোভয়ের জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান, (২) চিকিৎসার ধরন, পরিমাণ, ক্রয়ও রক্ষণাবেক্ষন, তত্ত্বাবধান, পর্যানুসরণ, দক্ষতা-মিশ্রিত জনবল ইত্যাদির জন্য বাজেট, অর্থ এবং পরিকল্পনা, (৩) হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বেদিক ও ইউনানি চিকিৎসা কার্যক্রম প্রয়াণ-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন, (৪) ডিএইচআইএস-২ এর বিকল্প সফটওয়্যারে সেবাপ্রদানকারী-সংশ্লিষ্ট তথ্যের উল্লেখ, (৫) সাম্প্রতিকতম তথ্যের ভিত্তিতে সেবা, প্রশাসন, বাজেট এবং পরিকল্পনার সংস্কৃতি, (৬) নিয়মিত-ভিত্তিতে তথ্য ও সেবাভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ এবং তথ্য ও সংবাদকর্মীদের সাথে সহযোগিতা।

বাস্তবায়নের সময়সীমা: ১.৫ বছর।

দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া: প্রস্তাবিত বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস ও সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর।

৩.১.৫ ৫) সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করে স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা এবং গণ জৰাবদিহিতার জন্য প্রস্তাবনা: (১) জনমিতির প্রকৃতি অনুযায়ী উপজেলা-ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা গৃহীতাদের সংখ্যাভিত্তিক মানচিত্র, (২) সম্প্রদায়, অন্যান্য সেন্টার ও সেবাপ্রদানকারীদের নিয়ে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের পরে তার পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন এবং এর ভিত্তিতে গণ অবহিতি ও জৰাবদিহিতা, (৩) নারী কেন্দ্রিক সেবা, বৃক্ষ, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ও দরিদ্রদের প্রতি সেবা, (৪) সম্প্রদায়-ভিত্তিক কার্যক্রমে নারীর জোরদার প্রতিনিধিত্ব, (৫) সক্রিয়সম্প্রদায়-ভিত্তিক কমিটি, (৬) প্রতি অপরাধের তদন্ত করে যথাবিহিত শাস্তির বিধান, যাতে একের দোষে ওপর একজন বা একজনের কারণে অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

বাস্তবায়নের সময়সীমা: ক্রমিক ১ এর জন্য ৩ বছর; ২ এর জন্য ২ বছর; ৩ থেকে ৫ এর জন্য ১ বছর।

দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া: প্রস্তাবিত জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

৩.১.৬ ৬) জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার অবকাঠামো ও কার্য প্রণালীকে পুনর্গঠন ও বিকেন্দ্রী করার প্রস্তাবনা: ১. সেবা ব্যবস্থাপনার অবকাঠামো শক্তিশালীকরণে গৃহীতব্য কার্যাবলী: (১) জনবল ও সেবা সম্পর্কিত নীতি, স্বচ্ছতা ও তদারকির জন্য বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন গঠন, (২) বাংলাদেশ স্বাস্থ্য/হেলথ সার্ভিস প্রতিষ্ঠা, এই দপ্তরে কিছু নতুন পদ সৃষ্টি অথবা বর্তমান পদসমূহকে পুনর্গঠন এবং এতে পরিবার পরিকল্পনা এবং নার্সিং বিভাগের অবস্থান স্পষ্টীকরণ, (৩) জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর গঠন, (৪) সকল মহাপরিচালকদের নিয়ে পরিচালনা পরিষদ গঠন, (৫) পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরস্থ সেবা প্রদানকারীদের দ্বৈততা পরিহার এবং আঞ্চীকরণ, (৬) নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কর্মকর্তাদের হাসপাতাল সেবা ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়, (৭) সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার স্বাস্থ্য বিভাগকে প্রস্তাবিত জনস্বাস্থ্য অবকাঠামোতে আঞ্চীকরণ, (৮) লাইন পরিচালকের স্থলে রাজস্বখাতের পরিচালকগণ কর্তৃক উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনা, (৯) উন্নয়ন খাতের কর্মচারীদের অবিলম্বে রাজস্বখাতে আঞ্চীকরণ এবং ভবিষ্যতে সব নবসৃষ্ট পদ সূচনা থেকেই রাজস্বখাতে সৃষ্টি, (১০) রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার জন্য ইউনিয়ন, জেলা, উপজেলা ও বিভাগীয় ব্যবস্থাপনা কাঠামো এবং সব স্তরের কর্মচারীর দায়দায়িত্ব পুনঃনির্ধারণ, (১১) হাসপাতাল ব্যবস্থাপনায় ডিগ্রিপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের পরিচালক পদে অগ্রাধিকার প্রদান (১২) স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকদের ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ, (১৩) অভিজ্ঞতার আলোকে আউটসোর্সিং কর্মী নির্বাচন, (১৪) যোগ্যতার আলোকে বেতন-ভাতা, দুর্গম এলাকায় বর্ধিত বেতন (যার অর্ধেক থাকবে সেবাকাজে প্রশোদনার জন্য) এবং উৎসাহব্যঞ্জক বস্তবাড়ির নীতি গ্রহণ, (১৫) পদোন্নতির জন্য পর্যাক্রম এবং পদোন্নতিপ্রাপ্তদের প্রশিক্ষণ, (১৬) জনস্বাস্থ্য অবকাঠামোর বিভিন্ন স্তরে প্রযোজনীয় পদ সৃষ্টি, (১৭) স্বাস্থ্যসেবায় কর্মসূচির পর্যালোচনা, (১৮) সভাবনাময় কর্মচারীদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও প্রেড এবং সবাইর অন্তত তিনি ধাপ পদোন্নতির সুযোগ, (১৯) কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের মধ্যে জনসংখ্যার সমান বিভাজন ও তাদের স্ব স্ব তত্ত্বাবধায়কের সহায়তায় একই ধরনের কাজ, (২০) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্র এবং মাতৃ ও শিশুসেবা অবকাঠামোকে একত্রিত করে তাকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা, এবং ইউনিয়ন পর্যায় থেকে কমিউনিটি ফিনিকে তত্ত্বাবধান ও পর্যানুসরণ, (২১) ইপিআই

আউটরীচ এবং স্যাটেলাইট ক্লিনিকসমূহ একত্রিত করে জনসংখ্যা ও যাতায়াতের সুবিধার আলোকে এর সংখ্যা নির্ধারণ ও নির্মাণ, (২২) ভালো কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের তিরক্ষারের সংকৃতি, (২৩) চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী বদলী না করে আইনানুগ অন্য কোনও শাস্তি প্রদান, (২৪) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অবস্থিত নিপোর্টের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন।

বাস্তবায়নের সময়সীমা: ক্রমিক ১-১১, ১৪, ১৬-১৯, ২১,২৪ এর জন্য ৬ মাস থেকে ৮ মাস রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স এর জন্য এবং বাস্তবায়নের জন্য ২ বছর।

দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া: ক্রমিক ১-১১, ১৪, ১৬-১৯, ২১ এবং ২৪ এর জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স। ক্রমিক ১৬ এর জন্য স্ট্যাটুটরি রেগুলেটরী অর্ডার (এসআরও) ও হতে পারে। তবে একবারে অর্ডিনেসের মাধ্যমে হলে অতিরিক্ত কালক্ষেপণ হবে না। ক্রমিক ১০-১৩, ১৫ প্রস্তাবিত জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

৩.১.৭ ২. পৌর ও নগর এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার সংগঠন : সরকারি ও বেসরকারী/ব্যক্তিখাতের হাসপাতাল ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়েও সহায়তা নগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামোর সৃষ্টি এবং প্রয়োজনে বেসরকারী/ব্যক্তিখাতের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা।

- **বাস্তবায়নের সময়সীমা:** ৬ মাস থেকে ৮ মাস মহামান্য রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স এর জন্য।
- **দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া:** জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর (বাস্তবায়নের জন্য)।

৩.১.৮ ৩. প্রায়োগিক ভৌত কাঠামো : (১) দুর্যোগ প্রতিরোধী এবং রোগীদের জন্য স্বিন্ডোয়াক ও প্রাপ্তিক ব্যবহারকারীদের ব্যবহার উপযোগী ভৌত কাঠামো, (২) ইউনিয়ন ও কমিউনিটি পর্যায়ের ভৌত অবকাঠামোর সম্প্রসারণ (৩) সব পর্যায়ে মর্যাদাসম্পন্ন এবং স্বিন্ডোয়াক আবাসিক ব্যবস্থা।

- **বাস্তবায়নের সময়সীমা:** ৩ বছর।
- **দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া:** বিএইচএস ও জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

৩.১.৯ ৪. জলবায়ু পরিবেশ এবং দুর্যোগ সংক্রান্ত সেবা কার্যক্রম : (১) বর্জ্য, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা, (২) ব্যায়াম ও খেলাখুলার জন্য পর্যাপ্ত পার্ক, (৩) শহরে উত্তপ্ত অঞ্চল (হিট আইল্যান্ড) সৃষ্টি প্রতিরোধ, (৪) পরবর্তী প্রজন্মকে সীসা ও প্লাস্টিকের বিষক্রিয়া থেকে রক্ষা, (৫) হাসপাতাল ও ফ্যাট্টরিতে এফলুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, (৬) National Guideline for Medical Waste Management (Revised) এবং Waste Management and Processing Rule ২০০৮ এর বাস্তবায়ন, (৭) আপৎকালীন স্বাস্থ্যসমস্যার ব্যাপক, তাৎক্ষণিক ও কার্যকরী ব্যবস্থাপনার জন্য আইন প্রণয়ন।

বাস্তবায়নের সময়সীমা: রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স এর জন্য ৬ মাস থেকে ৮ মাস; বাস্তবায়নের জন্য ক্রমিক ২ থেকে ৬ এর জন্য ৩ বছর।

দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া: ক্রমিক ২ থেকে ৬ : স্বাস্থ্য কমিশন ও বিএইচএস ; ৭ এর জন্য রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স।

৩.১.১০ ৫. ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রস্তাবিত কার্যবলী এবং দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ: (১) জেলা ও উপজেলায় স্থানীয়ভাবে জনস্বাস্থ্যের দায়িত্ব: (ক) বাজেট প্রণয়ন, অর্থ গ্রহণ ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, (খ) তত্ত্বাবধায়ন, পর্যানুসারণ, সুশাসন, (গ) সম্পদের ব্যবহার ও দক্ষতা পর্যবেক্ষণ, (ঘ) সেবার যৌক্তিকতা, মান ও পরিমাণ নির্ণয়, (২) প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা, (৩) বোর্ডের মাধ্যমে জনবল পরিচালনা-উপজেলা, জেলা, বিভাগ, এবং অধিদপ্তর কর্তৃক পদোন্নতি, বদলি ও পদায়ন, (৪) শ্রমিক, কারাবন্দী, বন্দর/ বিমানবন্দরের কর্মী, পুলিশ ও শিক্ষার্থীদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের সুরক্ষা ও প্রশিক্ষণ, (৫) লক্ষ্য অর্জনের বার্ষিক মূল্যায়ন, (৬) দাতাসংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থানীয় পর্যায়ে সরকারকে সমন্বিতভাবে সহায়তা।

- **বাস্তবায়নের সময়সীমা:** ১-৩ এর রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স এর জন্য ৬ মাস থেকে ৮ মাস বাস্তবায়ন: ৫ বছর।
- **দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া:** ১-৩ এর রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স; ৪ ও ৫ এর জন্য সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর।

৩.১.১১ ৬. লজিস্টিক ব্যবস্থাপনা: (১) যানবাহনকে সরঞ্জামের তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, (২) সরঞ্জাম এবং যানবাহনের হালনাগাদ তালিকা, (৩) AI-এর মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে বস্তুগত সম্পদের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ পরীক্ষা এবং রোবোটিক্স এর ব্যবহার, (৪) ন্যায়, স্বচ্ছ, আইনানুগ এবং যুক্তিসংজ্ঞাত, মূল্যের স্টেন্টিং, ট্রান্সপ্লান্টেশন, ঔষধ, রোগ নির্ণয়ক পরীক্ষা, প্রেসক্রিপশন করা, (৫) ‘টার্ন কি’ পদ্ধতিতে ক্রয় ও সংগ্রহ; ব্যবহারকারী না থাকলে ক্রয়-সংগ্রহ বিধিবদ্ধ হবে না, (৬) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাংসরিক বরাদ্দ,

(৭) সরঞ্জাম এক্সপাইরি তারিখের অর্ধেক সময়ের মধ্যে নষ্ট হলে স্বাস্থ্য কমিশন কর্তৃক ব্যবস্থা, (৮) অনলাইনে ইনডেন্টিং, ক্রয়/বিক্রয়, সংরক্ষণ ও বিতরণ, (৯) তত্ত্বাবধান ও পর্যানুসরণে রিমোট সেন্সিং ও তথ্যের স্বয়ংক্রিয়তা, দূর-চিকিৎসা (টেলিমেডিসিন) ও শল্যসেবা এবং এর উন্নয়নে সৃজনশীলতা ও গবেষণা, (১০) চিকিৎসার যন্ত্রপাতি উৎপাদন ও প্রযুক্তিবিদ্যার আধুনিকায়নে উৎসাহ ও আর্থিক প্রগোদ্ধন।

- **বাস্তবায়নের সময়সীমা:** ক্রমিক ১, ২, ৪-৭ এর জন্য ১ বছর এবং ক্রমিক ৩, ৮, ৯ এর জন্য ২ বছর।
- **দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া:** প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য কমিশন ও বিএইচএস ও জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

৩.১.১২ ৭. অ্যাসুলেন্স পরিষেবার দক্ষ ব্যবস্থাপনা: (১) অ্যাসুলেন্স পরিষেবা স্থানীয়ভাবে একটি স্বাধীন চুক্তিবদ্ধ তৃতীয়পক্ষ/ একটি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব/ বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি বা সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে, (২) প্রতিটি অ্যাসুলেন্সে একজন প্রশিক্ষিত প্যারামেডিক এবং সব জরুরি সরঞ্জাম।

- **বাস্তবায়নের সময়সীমা:** ২ বছর।
- **দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া:** স্বাস্থ্য কমিশন, বিএইচএস ও জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

৩.১.১৩ ৮. স্বাস্থ্যসেবার জন্য বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা এবং বাজেট প্রণয়ন ও বরাদ্দ পদ্ধতি: (১) অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা কর্তৃপক্ষের কাছে বার্ষিক বরাদ্দ, (২) লক অর্থ- হাসপাতাল সেবা, জনস্বাস্থ্য, ও মেডিক্যাল ও সম্বন্ধিত শিক্ষায় বিভাজন। অর্থাৎ : (ক) উপজেলা এবং শহর/নগরের জন্য, (খ) হাসপাতালের জন্য, এবং (গ) মেডিক্যাল ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য, (৩) বিভাজনের আলোকে বাজেট তৈরী করবে : (ক) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং শহর/নগর এলাকার জন্য সিভিল সার্জন ও পৌরসভা/ সিটি করপোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ, (খ) হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার/ তত্ত্বাবধায়ক/ পরিচালক এবং (গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, (৪) বাজেটসমূহ বিভাগীয় পরিচালক দ্বারা সমর্থিত হবার পর স্বস্থ অধিদপ্তরে প্রেরণ এবং সেখানে অনুমোদনের পর বাজেট প্রণয়নকারী দলের একাউন্টে অর্থ প্রেরণ, (৫) বাজেটের থাকবে বেতন ও ভাতা, ক্রয়-সংগ্রহ, সেবা, কর্মসূচী, গণযোগাযোগ, গবেষণা/মূল্যায়ন; পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ এবং তত্ত্বাবধান; সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা; মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ; ব্যক্তিখাত থেকে সেবা ক্রয় এবং নিয়ন্ত্রক পরিষদের বাজেট, (৬) চিকিৎসকদের অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য করা ইনডেমনিটি বিমা থেকে দরিদ্রদের স্বাস্থ্যসেবায় ২০% ব্যয়, (৭) জাতীয়করণ ছাড়া স্বাস্থ্যসেবার জন্য অতিরিক্ত অর্থায়ন হবে সিএসআর ও দূষণ (সিন) কর, যাকাত, দাতা বা দাতা সংস্থা প্রদত্ত ফাস্ট, সারচার্জ এবং সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা (সোশ্যাল হেলথ ইনসুরেনস) থেকে, (৮) সব পদে বেতন কাঠামো যোগ্যতার ভিত্তিতে, যা নির্ধারিত হবে বিভাগীয় দপ্তর, সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর, বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সার্ভিস এবং স্বাস্থ্য কমিশন কর্তৃক, (৯) সবার জন্য বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, (১০) উন্নয়ন এবং চলিত/রাজস্ব উভয়খাতের লাইন আইটেম-ওয়ারী সমর্থিত বাজেট, (১১) প্রকৃত ভর্তি রোগীর সংখ্যার আলোকে বাজেট।

- **বাস্তবায়নের সময়সীমা:** ক্রমিক ১-৯ এর জন্য ৬ মাস থেকে ৮ মাস ; বাস্তবায়নের জন্য ২ বছর।
- **দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া:** ক্রমিক ১-৯ এর জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির অর্ডিনেন্স বাস্তবায়নের জন্য বিএইচএস এর অধিদপ্তরসমূহ।

৩.১.১৪ ৯. স্বাস্থ্যসেবার জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি : (১) ব্যক্তিখাত থেকে সেবা ক্রয়: (ক) সেবাপ্রদানকারীকে স্থানীয় সরকারী সেবা ক্রয়কারী কর্তৃক সরাসরি সেবার মূল্য প্রদান, বা, (খ) সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা ব্যবস্থা, যেখানে সরকার স্বয়ং একটা নির্বাচিত সেবাপ্রদানকারীর মাধ্যমে সেবা ক্রয় করবে বা নির্বাচিত একটা তৃতীয়পক্ষ সেবার অর্থ সংগ্রহ এবং সেবা ক্রয় করবে, (২) আর্থিক দায়িত্ব পালনের জন্য থাকবে পৃথক অর্থ ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত।

- **বাস্তবায়নের সময়সীমা:** ১-২ এর জন্য ৬ মাস থেকে ৮ মাস।
- **দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া:** মহামান্য রাষ্ট্রপতির অর্ডিনেন্স।

৩.১.১৫ ৭. সেবাকেন্দ্র এবং সেবাপ্রদানকারীর সংজ্ঞা এবং গুনঃনামকরণ: (১). কমিউনিটি ক্লিনিকের নাম- গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র, (২). ইউনিয়ন স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্রের নাম-ইউনিয়ন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, এবং (৩). উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নাম- প্রাথমিক রেফারেল স্বাস্থ্য কেন্দ্র, (৪). স্বাস্থ্য সহকারী, পরিবার কল্যাণ সহকারী এবং সিএইচসিপি এর নাম হবে গ্রামীণ স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মী।

- **বাস্তবায়নের সময়সীমা:** ১.৫ বছর।
- **দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া:** বিএইচএস।

খ) হাসপাতাল এবং রোগ নির্ণয় পরিষেবা ভিত্তিক সংস্কার প্রস্তাবনা

১) সেবার মান উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবনা:

৩.১.১৬ ১. সেবা গ্রহীতা কেন্দ্রীক সেবার ব্যবস্থাপনা (১) রোগীকে ঔষধ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, চিকিৎসক এবং হাসপাতাল নির্বাচনে বিকল্প নির্ধারণের অধিকার, (২) হাসপাতালে পরম্পর থেকে পৃথকীকৃত ডিপার্টমেন্ট, (৩) রোগীর জন্য যথেষ্ট সময়, (৪) রোগীর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা, (৫) হাসপাতালে পর্যাপ্ত দিকনির্দেশনা, (৬) নির্ভুল রোগী চিহ্নিতকরণ এবং চিকিৎসা, (৭) দীর্ঘস্থায়ী, মৃত্যুসজ্জাশায়ী ও দুর্ঘটনায় পতিত রোগী, গর্ভবতী মহিলা, অপুষ্ট রোগী, কিশোর-কিশোরীদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক কাউন্সেলর পদে নারীদের অগ্রগত্যা, (৯) রোগীকে প্রেসক্রিপশন বুঝিয়ে দেয়া, (১০) শিশু ভূমিষ্ঠ হ্বার স্থানে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশ এবং শিশু ভূমিষ্ঠকরণের জন্য ট্রায়াল, (১১) হাসপাতালে কোয়ালিটি ইমপুভেন্ট টিম, (১২) হাসপাতালে বায়োমেডিক্যাল প্রকোশল বিভাগ, নিবন্ধিত ফার্মাসি ও ফার্মাসিস্ট।

- **বাস্তবায়নের সময়সীমা:** ক্রমিক ১-৬, ৯ এবং ১০-১১ পর্যন্ত ১ বছর ;ক্রমিক ৭, ৮ এবং ১২ এর জন্য ৬ মাস থেকে ৮ মাস।
- **দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া:** ক্রমিক ৭, ৮ এবং ১২ এর জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যাল্স/ স্ট্যাটুটরি।

৩.১.১৭ ২. জেলা, উপজেলায় ক্লিনিক্যাল সেবার মান ও পরিমাণ উন্নয়ন: (১) মেডিকেল কলেজে প্রদত্ত সেবা জেলা সদর হাসপাতালে প্রাপ্তি, (২) জেলা সদর হাসপাতালে পদ বিন্যাস অনুযায়ী প্রয়োজনীয়সংখ্যক সেবা প্রদানকারী নিয়োগ, (৩) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শুধুমাত্র কনসাল্টেশন, অবজারভেশন, এবং রেফারেল রোগীকে ভর্তি।

- **বাস্তবায়নের সময়সীমা:** ১-২ এর জন্য ৩ বছর, ৩ এর জন্য ১ বছর।
- **দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া:** ১,২ ও ৩ এর জন্য এসআরও; বিএইচএস ও অধিদপ্তরসমূহ।

৩.১.১৮ ৩. হাসপাতাল মর্গে প্রদত্ত কার্যক্রমের উন্নয়ন: (১) আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামসহ মর্গ স্থাপন, (২) ফরেনসিক পরীক্ষা, প্রমাণ সংগ্রহ, সুরক্ষা এবং পরিবহন সম্পর্কে প্রতি উপজেলায় কমপক্ষে ২ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার, (৩) মেডিকো-লিগাল সেবার জন্য পারিশ্রমিক।

- **বাস্তবায়নের সময়সীমা:** ২ বছর।
- **দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া:** বিএইচএস ও ক্লিনিক্যাল সেবা অধিদপ্তর।

৩.১.১৯ ৪. স্বাস্থ্যসেবার (ক্লিনিক্যাল ও জনস্বাস্থ্য):

মান উন্নয়নে কারিগরী ও প্রশাসনিক কার্যবলী: (১) সুস্থতা-কেন্দ্রিক স্বাস্থ্যসেবা পদ্ধতি গ্রহণ, (২) পরিষেবা গ্রহণ এবং প্রদানকারীদের অনুপাত এবং দক্ষতা-মিশ্রণ, (৩) সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলির জন্য অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড, (৪) বড় হাসপাতালে নগদ ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ দশ বছর পর ৮০% বৃদ্ধি এবং কোটেশনের মাধ্যমে ক্রয়ের পরিমাণ তিন বারে ১৫০% বৃদ্ধি করার নীতি, (৫) হাসপাতালে সংগৃহীত অর্ধের অর্ধেক হাসপাতালে ব্যবহারের নীতি।

- **বাস্তবায়নের সময়সীমা:** ক্রমিক ১-২ এর জন্য ২ বছর ; ক্রমিক ৩-৫ এর জন্য ৬ মাস থেকে ৮ মাস।
- **দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া:** ১-২ এর জন্য বিএইচএস ও অধিদপ্তরসমূহ; ক্রমিক ৩-৫ এর জন্য রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যাল্স/ এসআরও।

৩.১. ২০ ৫. স্বাস্থ্যসেবার মান (ক্লিনিক্যাল ও জনস্বাস্থ্য) উন্নয়নের জন্য গৃহীতব্য অন্যান্য কার্যবলী: (১) চিকিৎসক, নার্স, প্যারামেডিক/ মাঠকর্মীর জন্য প্রশিক্ষণ মডিউলের বিষয়াদি: অ্যাটিবায়োটিক; সিজারিয়ান; ঔষধের ডোজ; টিকা; গর্ভনিরোধক; ক্লিনিক্যাল, শরীরবৃত্তীয় এবং বয়স-তিক্রিক পুষ্টি; গর্ভবস্থা; বার্ধক্যজনিত সমস্যা; দুর্ঘটনা, আঘাত, মনোসামাজিক উদ্বেগ, অসংক্রামক রোগ কাউন্সেলিং, (২) শরীরবৃত্তীয় ফিটনেসভিত্তিক স্ব-মূল্যায়নে রোগীকে সহায়তা, (৩) পেশীশক্তি, দৃষ্টি, শ্রবণশক্তি, ভাষা এবং আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের বয়স অনুসারে দক্ষতা, জ্ঞান, বন্ধুত্ব, সামাজিকতা, খাদ্য, সেবাগ্রহীতাদের স্বল্প সংশ্লিষ্ট সহায়ক সেবা, (৪) সকল সংশ্লিষ্ট কমিটিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ।

- **বাস্তবায়নের সময়সীমা:** ক্রমিক ১ ও ৪ এর জন্য ১ বছর ;ক্রমিক ২ ও ৩ এর জন্য ১.৫ বছর।
- **দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া:** বিএইচএস ও ক্লিনিক্যাল সেবা অধিদপ্তর।

৩.১. ২১ ৬. রোগী বাক্স হাসপাতালের জন্য গৃহীতব্য কার্যাবলী (১) নারী-বাক্স হাসপাতালের উদ্যোগ পর্যালোচনা এবং কর্মসূচিটি পুনঃগ্রহণ, (২) স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী এবং গ্রহীতা-বাক্স হাসপাতাল, (৩) হাসপাতালের ফার্মাসি, পরীক্ষাগার ও রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রে ২৪ ঘণ্টা সেবা প্রদান, (৪) নিরাপদ পানি, বায়ু, স্বষ্টিদায়ক পরিবেশ, পয়ঃপ্রণালী, রোগীর শয্যার পাশে যথেষ্ট স্থানের নিশ্চয়তা।

- **বাস্তবায়নের সময়সীমা:** ক্রমিক ১ ও ৪ এর জন্য ৬ মাস; ক্রমিক ২-৩ এর জন্য ৩ বছর।
- **দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া:** বিএইচএস ও ক্লিনিক্যাল সেবা অধিদপ্তর; ক্রমিক ৪ এর জন্য রাষ্ট্রপতির অর্ডিনেশন।

৩.১.২২ ৭. রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য গৃহীতব্য কার্যাবলী: (১) শক্তিশালী জাতীয় রেফারেন্স ল্যাবরেটরি, (২) রোগ নির্ণয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি, (৩) রাসায়নিকের সংস্পর্শে উন্নত রোগ নির্ণয়ের জন্য ন্যাশনাল ইনসিটিউট ফর ল্যাবরেটরি মেডিসিন, রেফারেল সেন্টার এবং মলিকুলার ল্যাবকে শক্তিশালী এবং বিকেন্দ্রীকরণ, (৪) রোগ নির্ণয়কের ফলাফল প্রশিক্ষিত/ স্বীকৃত পেশাজীবী কর্তৃক স্বাক্ষর।

- **বাস্তবায়নের সময়সীমা:** ক্রমিক ১-৩ এর জন্য ৩ বছর; ক্রমিক ৪ এর জন্য ১ বছর।
- **দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া:** বিএইচএস ও ক্লিনিক্যাল সেবা অধিদপ্তর।

৩.১.২৩ ৮. সিজারিয়ান অপারেশন নিয়ন্ত্রণের জন্য পদক্ষেপ সমূহ: (১) সিজারিয়ান অপারেশনের হার অযাচিতভাবে বৃদ্ধি করে এরকম কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ, (২) ২০২০ সালের উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান অপারেশন নিয়ন্ত্রণ, (৩) মিডওয়েইফারদের হাতে শিশুপ্রস্বর।

- **বাস্তবায়নের সময়সীমা:** ক্রমিক ১ ও ২ এর জন্য ১ বছর; ক্রমিক ৩ এর জন্য ৩ বছর
- **দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া:** বিএইচএস ও জনস্বাস্থ্য/ক্লিনিক্যাল সেবা অধিদপ্তর

৩.১.২৪ ৯. সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা (১) যা করা যাবে না: (ক) সরকারি সেবা প্রদানকারী কোন রোগীকে বেসরকারি হাসপাতালে প্রেরণ, (খ) উষ্ঠ প্রস্তুতকারকের প্যাতে প্রেসক্রিপশন লেখা, (গ) অপ্রয়োজনীয় ওষুধ বা পরীক্ষা করার পরামর্শ, (২) প্রতিটি ওটিতে রোগীর গোপনীয়তার আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মিসিটিভি ক্যামেরা থাকবে, একাডেমিক, গবেষণা বা অন্য প্রয়োজনে, শল্য চিকিৎসার পদক্ষেপ রেকর্ড করা যাবে (৩) ঝুঁকি ভাগভাগির ভিত্তিতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত, (৪) জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের দক্ষতার সাথে চুক্তি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষণ, (৫) দুর্ঘটনার ব্য দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং প্রশিক্ষণ; (১) ও (৩) এর জন্য ৬ মাস থেকে ৮ মাস।

- **বাস্তবায়নের সময়সীমা:** ক্রমিক ৬-৭ এর জন্য ২.৫ বছর।
- **দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া:** ক্রমিক ১ ও ৩ এর জন্য রাষ্ট্রপতির অর্ডিনেশন; বিএইচএস ও জনস্বাস্থ্য/ক্লিনিক্যাল সেবা অধিদপ্তর।

২) সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার নিশ্চয়তার লক্ষ্যে গৃহীতব্য কার্যাবলীর প্রস্তাবনা

৩.১.২৫ ১. শিশু কিশোর-কিশোরীদের ও মহিলা রোগীদের অগ্রাধিকার প্রদান: (১) বন্ধ্যাত, গর্ভপাত-পরবর্তী যত এবং যৌনবাহিত রোগের অগ্রাধিকার, (২) হাসপাতালে কার্যকরী স্পেশাল কেয়ার নিউবর্ন ইউনিট (SCANU), (৩) দুর্গম এলাকায় প্রসবের দুই সপ্তাহ আগে গর্ভবতী মহিলাদের হাসপাতালে ভর্তি, (৪) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিশুদের পুনর্বাসন এবং সামাজিক সংহতিকরণ, (৫) কিশোর-কিশোরীদের অগ্রাধিকার প্রদান।

- **বাস্তবায়নের সময়সীমা:** ক্রমিক ১ ও ৩ এর জন্য ১ বছর; ক্রমিক ২ ও ৪ এর জন্য ২ বছর।
- **দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া:** বিএইচএস ও জনস্বাস্থ্য/ক্লিনিক্যাল সেবা অধিদপ্তর।

৩.১.২৬ ২. শিশু বিকাশ কর্মসূচিকে অগ্রাধীকার প্রদান (১) শিশু বিকাশ কেন্দ্রগুলির পুনর্বিন্যাস, (২) জেলা ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মাল্টি- ডিসিপ্লিনারি (শিশুস্বাস্থ্য চিকিৎসক, শিশু মনোবিজ্ঞানী এবং উন্নয়ন-থেরাপিস্ট) ‘শিশু বিকাশ কেন্দ্র’ প্রতিষ্ঠা এবং মান উন্নয়ন, (৩) প্রয়োজনে উচ্চতর শিশু বিকাশ কেন্দ্রে রেফারেলের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা, (৪) শিশুর স্নায়বিক বিকাশের দ্রুত মূল্যায়ন ও প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা গ্রহণ, (৫) শিশু বিকাশ কেন্দ্রগুলিতে প্রশিক্ষণ, জনবল, ও গবেষণা পরিচালনা, (৬) শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন এবং তার কার্যক্রম ও কর্মসূচিতে সহায়তার জন্য আইন।

- **বাস্তবায়নের সময়সীমা:** ৩ বছর।
- **দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া:** বিএইচএস ও ক্লিনিক্যাল সেবা অধিদপ্তর।

৩.১.২৭ ৩. জরুরি চিকিৎসার সহায়তা: (১) দেশব্যাপী আধুনিক চিকিৎসা কাঠামো প্রতিষ্ঠা, (২) জরুরি/ক্রিটিকাল কেয়ার সেবা পথক বিভাগ হিসাবে প্রতিষ্ঠা, (৩) হাসপাতালের জরুরী বিভাগের পুঁঁঁমির্মাণ এবং জনসম্পদ ও সরঞ্জামের নিশ্চয়তা, (৪) মহাসড়কের কাছাকাছি অবস্থিত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রক্ত সঞ্চালনকেন্দ্র ও অ্যাম্বুলেন্সসহ ট্রামা সেন্টার, (৫) প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে সেবার জন্য স্থানীয় বেসরকারী/ব্যক্তিগত থেকে দক্ষতা-মিশ্রিত সেবাপ্রদানকারীর সঙ্গে চুক্তি (৬) অঙ্গ ও রক্ত দাতাদের উপজেলাভিত্তিক ডাটাবেস।

- **বাস্তবায়নের সময়সীমা:** ক্রমিক ১-৪ পর্যন্ত ৩ বছর; ক্রমিক ৫ এর জন্য ২ বছর।
- **দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া:** বিএইচএস ও জনস্বাস্থ্য/ক্লিনিক্যাল সেবা অধিদপ্তর।

৩.১.২৮ ৪. উপজেলা/পৌর/ নগর এলাকায় স্তরের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম: (১) নগরে/ পৌর এলাকায় বা নতুন সৃষ্টি পদে এক বছরেরও বেশি সময়ধরে শূন্য, এরকম পদে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা চিকিৎসক নিয়োগের নীতি, (২) নারীর প্রতি সহিংসতা জনিত সেবার জন্য সকল উপকরণসহ হাসপাতালে অন্তত: ৫ শয়া বিশিষ্ট ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার, (৩) দুর্ঘটনার শিকার মানুষের প্রাথমিক সেবা দেওয়ার জন্য পুলিশ সদস্যদের প্রশিক্ষণ এবং থানায় প্রয়োজনীয় উপকরণাদীর সার্বক্ষণিক নিশ্চয়তা।

- **বাস্তবায়নের সময়সীমা:** ক্রমিক ১-২ এর জন্য ৬ মাস থেকে ৮ মাস ; ক্রমিক ৩-৪ এর জন্য ৩ বছর।
- **দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া:** ক্রমিক ১-২ এর জন্য রাষ্ট্রপতির অর্ডিনেশন; ক্রমিক ৩-৪ এর জন্য বিএইচএস ও জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

৩.১.২৯ ৫. স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান/ হাসপাতাল নির্মাণের মান এবং সেবা চালু করার শর্ত: (১) স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র নির্মাণের প্রয়োজন নির্ধারণ; প্রয়োজনে তাতে সকল প্রয়োজনীয় সম্পদের অন্তর্ভুক্তি, (২) আবেদনের চার সপ্তাহের মধ্যে বেসরকারি হাসপাতাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টারের লাইসেন্স নবায়ন, (৩) উপজেলা হাসপাতালগুলিতে সার্জারি, স্ট্রীরোগ-প্রসৃতি ও আনেক্সেসিয়ার পরিপূর্ণ দলের নিশ্চয়তা, (৪) অচল হাসপাতালগুলিকে দক্ষভাবে চালু করার ব্যবস্থা, (৫) ২০% দরিদ্র রোগীকে কাছাকাছি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে, বিনামূল্যে, অন্ত:বিভাগ, বহির্বিভাগ, ওষুধ, এবং ডায়াগনস্টিক সেবা প্রদানের নীতি, (৬) ক্যাচমেন্ট জনসংখ্যা এবং রোগতাত্ত্বিক অবস্থার ভিত্তিতে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান এবং তার বিস্তৃতি, (৭) রোগীর সংখ্যা ও অন্যান্য শর্ত পূরণ সাপেক্ষে হাসপাতালের শয়াসংখ্যা, (৮) হাসপাতালে চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইসিইউ স্থাপন, (৯) জেলা ও উর্ধ্বতন হাসপাতালে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির নিশ্চয়তা।

- **বাস্তবায়নের সময়সীমা:** ক্রমিক ১, ৩, ৪, ৮ ও ৯ এর জন্য ২ বছর ; ক্রমিক ৫-৯ এর জন্য ৬ মাস থেকে ৮ মাস।
- **দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া:** ক্রমিক ১, ৩, ৪, ৮ ও ৯ এর জন্য বিএইচএস ও জনস্বাস্থ্য/ক্লিনিক্যাল সেবা অধিদপ্তর; ক্রমিক ৫-৯ এর জন্য রাষ্ট্রপতির অর্ডিনেশন।

৩.১.৩০ ৬. জনসুরী ক্লিনিক্যাল এবং ডায়াগনস্টিক সেবা: (১) বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক উচ্চতর স্তরের হাসপাতাল থেকে নিয়ন্ত্রণের হাসপাতালে সেবা, (২) জরুরী সেবাগ্রহীতাদের জন্য প্রথমে বিনামূল্যে সেবা, (৩) হাসকৃত এবং যৌক্তিক মূল্যে ঔষধ, উপকরণ, রোগ নির্ণয়ক পরীক্ষা, কনসালটেশন ফী ও হাসপাতালে ভর্তি জনিত সেবা, (৪) উপজেলা, জেলা, ও বিভাগ পর্যায়ে প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য সেবা কমিশনের নিয়ন্ত্রণধীন পর্যানুসরণকারী/ মনিটরিং দল অথবা প্রস্তাবিত কমিশনকে সহায়তা করার জন্য প্রস্তাবিত জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন স্তরের দল, (৫) কার্যকরী স্বাস্থ্যসেবা সমন্বয় কমিটি।

- **বাস্তবায়নের সময়সীমা:** ১.৫ বছর।
- **দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া:** স্বাস্থ্য কমিশন বিএইচএস ও জনস্বাস্থ্য/ক্লিনিক্যাল সেবা অধিদপ্তর।

৩.১.৩১ ৭. ইন্টারনেট ভিত্তিক সেবা সম্প্রসারণ এবং হালনাগাদ করণ: (১) টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান এবং পরিষেবা, (২) রক্ত এবং অঙ্গদাতার ডেটাবেস, (৩) সহজ ভাষায়স্বাস্থ্য তথ্য ও চিকিৎসা পরামর্শ দেওয়ার জন্য সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে সংযুক্ত ডিজিটাল স্বাস্থ্য প্ল্যাটফর্ম, (৪) দৃঢ়গম জনগোষ্ঠীর জন্য স্থানীয় হটলাইন।

- **বাস্তবায়নের সময়সীমা:** ২.৫ বছর।
- **দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া:** বিএইচএস ও জনস্বাস্থ্য/ক্লিনিক্যাল সেবা অধিদপ্তর।

৩.১.৩২ ৮. বিশেষ ধরনের সেবার চাহিদা পূরণ: (১) অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে ডিপ্রেশন, আলোচাইমার ও ডিমেনশিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য আবাসিক সেবা, (২) স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে, বিদ্যালয়ে, প্রতিষ্ঠান বা বড় বড় ভবনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী অবকাঠামো, (৩) স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবার জন্য বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, (৪) স্বল্পমূল্যে অর্গ্যান ট্রান্সপ্লান্ট, রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি, কিডনি ডায়ালিসিস, ক্যান্সার ইত্যাদির কার্যকরী এবং আইনভিত্তিক চিকিৎসা।

- **বাস্তবায়নের সময়সীমা:** ক্রমিক ১-৩ এর জন্য ৩ বছর; ক্রমিক ৪ এর জন্য ৬ মাস থেকে ৮ মাস।
- **দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া :** বিএইচএস ও জনস্বাস্থ/ক্লিনিক্যাল সেবা অধিদপ্তর; ক্রমিক ৪ এর জন্য রাষ্ট্রপতির অর্ডিনেশন।

৩.১.৩৩ ৯. দুর্যোগ ও দুর্যোগ পরবর্তী নারীবাক্রব সেবা প্রদান: (১) স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সমূহে দুর্যোগ পরবর্তী প্রজনন স্বাস্থ্য ও মাতৃস্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা, (২) নারীবাক্রব ও নিরাপদ দুর্যোগ-আশ্রয়স্থল, (৩) দুর্যোগকালে গর্ভবতী নারীদের স্বাস্থ্য সেবার নিশ্চয়তা, (৪) সমৃদ্ধ তীরবর্তী এলাকায় বক্ষ্যাতকে গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ স্বাস্থ্য কর্মসূচি গ্রহণ।

- **বাস্তবায়নের সময়সীমা:** : ১.৫ বছর।
- **দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া :** বিএইচএস ও জনস্বাস্থ/ক্লিনিক্যাল সেবা অধিদপ্তর।

৩.১.৩৪ ১০. অলাভজনক হাসপাতাল/সংস্থাগুলিকে সহযোগিতা প্রদান অলাভজনক বেসরকারি খাতের হাসপাতাল বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলিকে দেশব্যাপী সেবা দেবার জন্য সহযোগিতা প্রদান।

- **বাস্তবায়নের সময়সীমা:** রাষ্ট্রপতির অর্ডিনেশন ১ বছর এর জন্য বাস্তবায়নের জন্য ৩ বছর।
- **দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া:** বিএইচএস ও জনস্বাস্থ/ক্লিনিক্যাল সেবা অধিদপ্তর।

৩.১.৩৫ ১১. অসংক্রামক এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগের ব্যবস্থাপনা: (১) ক্যান্সার, উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস, দীর্ঘস্থায়ী শাস্তত্বের রোগ, মানসিক সমস্যা, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার, আঘাত্য প্রতিরোধ এবং পুনর্বাসনের জন্য প্রতি দশ বছর অন্তর কৌশলপত্র তৈরি, (২) স্বাস্থ্যসেবার সকল ক্ষেত্রে অসংক্রামক রোগের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া, (৩) জেলা পর্যায়েপ্রযুক্তি/সরঞ্জামসহ পর্যাপ্ত নিবিড় পরিচর্যা ইউনিট, (৪) জেলা হাসপাতালে কার্ডিওলজি, কার্ডিয়াক সার্জারি, মনোরোগবিদ্যা, নিউরোলজি, পালমোলজি, ক্লিনিক্যাল অনকোলজি, নেফ্রোলজি, হেপাটোলজি, ট্রিমাটোলজি, ইউরোলজি, বয়স্কদের যন্ত্র এবং হেল্প-লাইন।

বাস্তবায়নের সময়সীমা: ক্রমিক ১-এর প্রথম কৌশলপত্রের জন্য ও ২-এর জন্য ১ বছর এর জন্য ৩ বছর ক্রমিক ৩ ও ৪ এর জন্য ৪ বছর।

দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া: বিএইচএস ও ক্লিনিক্যাল সেবা জনস্বাস্থ অধিদপ্তর।

৩.১.৩৬ ১২. নারীদের জন্য হাসপাতাল ও প্রাতিষ্ঠানিক সেবা: (১) ডে কেয়ার সেন্টারসহ নারী ও শিশুবাক্রব হাসপাতাল, (২) বিভাগীয় পর্যায়ে নারী ও শিশুদের হাসপাতাল, বিকল্প হিসেবে মাতৃ ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্রগুলোকে জেলা ও উপজেলার ক্লিনিক্যাল ধারার সাথে সংযুক্ত, (৩) মহিলা ও শিশু সেবার উন্নয়নের জন্য মহিলা স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রতিষ্ঠান।

বাস্তবায়নের সময়সীমা: ১. এর জন্য ৬ মাস থেকে মাস ৮ এবং ২ ও ৩-এর জন্য ৩ বছর।

দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া : ২ এর জন্য অর্ডিনেশন; ১ ও ৩ এর জন্য ক্লিনিক্যাল সেবা অধিদপ্তর।

৩.১.৩৭ ১৩. চাহিদা সম্পর্ক সেবার জন্য পদ সৃষ্টি: পর্যাপ্ত সংখ্যক মানসিক ও চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ, হিস্টোপ্যাথোজিস্ট, ক্লিনিক্যাল অনকোলজিস্ট, ফিজিওথেরাপিস্ট, মেডিক্যাল ফিজিসিস্ট, বায়োমেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট, বায়োমেডিক্যাল প্রকোশলী, এবং ক্যান্সার এবং অন্যান্য রোগ নির্ণয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিশেষজ্ঞ।

- **বাস্তবায়নের সময়সীমা:** ২.৫ বছর।
- **দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া:** বিএইচএস ও ক্লিনিক্যাল সেবা অধিদপ্তর।

৩.১.৩৮ ১৪. বিশ্ব মানের উৎকর্ষতা সম্পর্ক হাসপাতাল স্থাপন: (১) দেশে চিকিৎসা-পর্যটন কেন্দ্র তৈরির জন্য বিশ্ব মানের হাসপাতাল স্থাপন, (২) বিদেশীদের চিকিৎসা পরবর্তী ফলোআপের জন্য টেলি-মেডিসিন পরিষেবা, (৩) বাংলাদেশের দুতাবাসগুলোর সাহায্যে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচার, (৪) উদ্বৃত্ত থাকলে দেশের চিকিৎসক, নার্স এবং প্যারামেডিকদের অন্যান্য দেশে চাকুরির ব্যবস্থা, (৫) ব্যক্তিখাতে চিকিৎসা সরঞ্জাম ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতা, দূর-চিকিৎসা ও হাসপাতালের মানোন্নয়নের জন্য সহায়তা প্রদান।

- **বাস্তবায়নের সময়সীমা:** ৫ থেকে ১০ বছর।
- **দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া:** প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য কমিশন, (বিএইচএস) ও ক্লিনিক্যাল সেবা অধিদপ্তর।

৩.১.৩৯ ১৫. অঙ্গদান সংশ্লিষ্ট আইনের প্রয়োগ: অনান্বীয় ব্যক্তি অঙ্গ দাতা হতে পারবেন এ বিষয়ে ২০১৯ সালের এক রীট আবেদনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী আইন সংশোধন।

- **বাস্তবায়নের সময়সীমা:** ক্রমিক ১ এর জন্য ১ বছর।
- **দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া:** স্বাস্থ্য কমিশন ও বিএইচএস।

৩). কার্যকর রেফারেল সেবা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাবনা

৩.৩.৪০ ১. রেফারেল এবং প্রাসঙ্গিক সেবা শক্তিশালীকরণ: (১) শক্তিশালী প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামো এবং পরিয়েবা, (২) প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জনগণের আত্মবিশ্বাস।

- **বাস্তবায়নের সময়সীমা:** ক্রমিক ১ এর জন্য ৬ মাস থেকে ৮ মাস এবং ২ এর জন্য ৩ বছর।
- **দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া:** ১ এর জন্য অর্ডিনেশন্স, ২ এর জন্য জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

৩.৩.৪১ ২. রেফারেল সিস্টেমের জন্য কৌশলগত ও আর্থিক সিদ্ধান্ত: (১) ক্যাচমেন্ট এলাকার জনসংখ্যা ও সেবার প্রয়োজনীয়তার আলোকে হাসপাতালের পরিমেবা, (২) রেফারেল সেবার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান, (৩) রেফারেল ব্যবস্থার নিয়ম, সুবিধা ও সুফল সম্পর্কে জনঅবহিতি, (৪) রেফারকারী এবং রোগীদের গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পৃথকভাবে রেফারেল ইউনিট পরিচালনা, (৫) সেবা গ্রহণকালে নেতৃত্ব দ্রুঁকি এবং ঔষধের অপব্যবহার রোধ করার জন্য সেবাগ্রহীতা থেকে আয় অনুযায়ী ৫ থেকে ২০ টাকা সংগ্রহ, যা প্রতি দশ বছর পর ২০% হারে বাড়বে।

- **বাস্তবায়নের সময়সীমা:** ক্রমিক ১ ও ২ এর জন্য ৩ বছর এবং ৩ থেকে ৫ এর জন্য ১ বছর।
- **দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া:** বিএইচএস, ক্লিনিক্যাল সেবা ও জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

পরিচ্ছেদ ৪

নেতৃত্ব, সুশাসন ও কর্মসংকৃতি

সুপারিশসমূহ:

স্বাস্থ্য একটি মৌলিক রাজনৈতিক পছন্দ, যা জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। এই সিদ্ধান্তগুলো জনগণের স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকার, সেবার মান এবং অর্থনৈতিক সুরক্ষায় সরাসরি প্রভাব ফেলে। তবে, কাঠামোগত দুর্বলতা এবং দুর্বল শাসন ব্যবস্থার কারণে নীতিগুলোর বাস্তবায়ন প্রায়শই ব্যাহত হয়।

দুর্বল শাসনের কারণে দেখা দেয় দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অদক্ষতা, জনবিশ্বাসের অভাব এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ঘাটতি। এসব সমস্যা মোকাবিলায় একটি শক্তিশালী স্বাস্থ্য শাসন কাঠামো অপরিহার্য। এর জন্য প্রয়োজন পাঁচটি মৌলিক নীতি:
১. স্বচ্ছতা—সিদ্ধান্ত ও সম্পদের ব্যবহার জনসমক্ষে উন্মুক্ত রাখা
২. জবাবদিহিতা—নীতিনির্ধারক ও সেবাদানকারীদের দায়িত্বোধ নিশ্চিত করা
৩. অংশগ্রহণ—জনগণ ও বিভিন্ন অংশীজনদের সম্পৃক্ত করা
৪. সততা—আস্থা বজায় রাখা
৫. সক্ষমতা—স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পরিচালনায় দক্ষতা অর্জন

(সেময়সীমা: স্বল্প-মেয়াদী [১ বছরের মধ্যে], মধ্য-মেয়াদী [৫ বছরের মধ্যে], দীর্ঘ-মেয়াদী [৫ বছরের পরে চলমান])

১. সংবিধান সংশোধন : [স্বল্প-মেয়াদী]

সংবিধান সংশোধন পূর্বক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য একটি পৃথক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা আইন প্রণয়ন করতে হবে, যা নাগরিকদের অধিকার ও রাষ্ট্রের কর্তব্য নির্ধারণ করবে, স্বাস্থ্যখাতে দীর্ঘমেয়াদে ন্যায্যতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিনামূল্যে প্রদান করবে।

২. আইনের সংস্কার: [স্বল্প, মধ্য-দীর্ঘ-মেয়াদী]

সকল সংশ্লিষ্ট পুরাতন আইন পর্যালোচনা ও যুগোপযোগী করা, এবং নতুন আইন প্রণয়ন জরুরি। এতে রোগী সুরক্ষা, আর্থিক বরাদ্দ ও ধারাবাহিকতা, জবাবদিহিতা ও জরুরি প্রস্তুতি নিশ্চিত হবে। প্রস্তাবিত নতুন আইনসমূহ হল: বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন আইন; বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস আইন; জনস্বাস্থ্য অবকাঠামো আইন; বাংলাদেশ ফুড, ড্রাগ ও মেডিকেল ডিভাইস আইন; ঔষধের মূল্য নির্ধারণ ও প্রবেশাধিকার আইন; স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী ও রোগী নিরাপত্তা আইন; এ্যালায়েড হেলথ প্রফেশনাল কাউন্সিল আইন; হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক এক্রেডিটেশন আইন; স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন; নারী স্বাস্থ্য আইন; ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণ আইন; শিশু বিকাশ কেন্দ্র আইন; ও বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল আইন। এছাড়াও নিম্নলিখিত আইনসমূহের সংশোধন প্রয়োজন: বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, মেডিকেল শিক্ষা এক্রেডিটেশন আইন, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন, বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল আইন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন, পৌর ও সিটি কর্পোরেশন আইন ইত্যাদি।

৩. বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন গঠন : [স্বল্প, মধ্য-দীর্ঘ-মেয়াদী]

সকল নীতিতে স্বাস্থ্য (Health in All Policies – HiAP) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি স্বাধীন ও স্থায়ী “বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন (BHC)” প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। এই কমিশন সরকার প্রধানের নিকট সরাসরি জবাবদিহি করবে এবং প্রতি বৎসর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সংসদে পাঠাবে। এই কমিশন নিম্নোক্ত বিভাগসমূহ এ বিষয়ক তদারক ও গঠনমূলক দিকনির্দেশনা প্রদান করবে:

১. চিকিৎসা শিক্ষা বিভাগ - মাতক ও মাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা, নার্সিং ও প্যারামেডিক শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন;
২. জনস্বাস্থ্য বিভাগ - জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে নীতিমালা প্রণয়ন, রোগ প্রতিরোধ;
৩. ক্লিনিক্যাল বিভাগ – স্বাস্থ্যসেবার ও রোগীর নিরাপত্তা তদারকি;
৪. BICE (Bangladesh Institute for Health and Care Excellence) – ক্লিনিকাল গাইডলাইন ও প্রটোকল উন্নয়ন, পাবলিক হেলথ গাইডলাইন উন্নয়ন;
৫. BHCI (Bangladesh Health Care Improvement) – সেবার মানদণ্ড, রোগীর নিরাপত্তা ও প্রটোকল অনুযায়ী সেবা প্রদান বিষয়ক নিয়মতাত্ত্বিক তদারকি;
৬. রেগুলেটরি ও ভারসাইট বিভাগ – BMDC, BMRC, BMEAC, ইত্যাদির ক্ষমতা বৃদ্ধি ও নেটওয়ার্ক গঠন;
৭. ল্যাবরেটরি ও ডায়াগনস্টিক বিভাগ – মান নিয়ন্ত্রণ, স্বীকৃতি, ও National Diagnostic Network (NDN) তদারকি;
৮. নিরাপদ খাদ্য, ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম বিভাগ – ফার্মেসি নেটওয়ার্ক, আইভিডি-মেডিকেল ডিভাইস ও খাদ্য তদারকি;

৯. এনজিও (NGO) ও প্রাইভেট হাসপাতাল সমষ্টি বিভাগ – বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাতের মান তদারকি ও সমষ্টি;
১০. CASH (Centre for Advanced Specialized Healthcare) – বিশেষায়িত সেবা কেন্দ্র: রোগীদের বিদেশমুখ্যতা রোধ ও দেশে আগন্তুরশীল চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন (ক্যান্সার, কিডনি, লিভার ও অন্যান্য অঙ্গ প্রতিস্থাপন, হৃদযন্ত্রের শল্যচিকিৎসা, বন্ধ্যত্ব, ও দুর্লভ রোগ ইত্যাদি);
১১. Allied Health Professionals বিভাগ – টেকনোলজিস্ট, থেরাপিস্ট, কাউন্সেলর প্রমুখ পেশার মান উন্নয়ন;
১২. প্রথাগত ও বিকল্প চিকিৎসা বিভাগ – আয়ুর্বেদ, ইউনানি, হোমিওপ্যাথি ইত্যাদি;
১৩. সেক্টোরাল হেলথ কোঅর্ডিনেশন বিভাগ - স্থানীয় সরকার, প্রতিরক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, স্বরাষ্ট্র, রেলপথসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রায়শই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমষ্টিহীনভাবে কাজ করে। এটি তথ্যভিত্তিক নীতিনির্ধারণ, সম্পদ বংটন এবং জরুরি সাড়া প্রদানে সহায় হবে।
১৪. স্বাস্থ্য প্রযুক্তি মূল্যায়ন (Health Technology Assessment) বিভাগ – ব্যয় সাশ্রয়িতা, অর্থনৈতিক প্রভাব, বাজেট ও ক্রয় ব্যবস্থাপনা;
১৫. স্বাস্থ্য নিরীক্ষা ও দুর্নীতি বিভাগ – স্বচ্ছতা ও জৰাবদিহিতা নিশ্চিতে কার্যকর তদারকি;
১৬. স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিভাগ - সেবাগ্রহীতার অভিযোগ নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে একটি আধুনিক ডিজিটাল অভিযোগ নিষ্পত্তি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা; BMDC, BNMC, Bangladesh Pharmacy Council ইত্যাদির আইনগত ক্ষমতা ও কাঠামোকে আরও কার্যকর করা; চিকিৎসা প্রদানকারীদের নিরাপত্তা ও পেশাগত সুরক্ষা; মেডিকেল প্রফেশনাল ইন্সুরেন্স; পেশাগত অবহেলা বিষয়ে সুরক্ষা; স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি; এবং
১৭. আইন বিভাগ - সকল সংশ্লিষ্ট পুরাতন আইন পর্যালোচনা ও যুগেয়োগী করা, এবং নতুন আইনের সুপারিশ করা।

বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন

চেয়ারম্যান

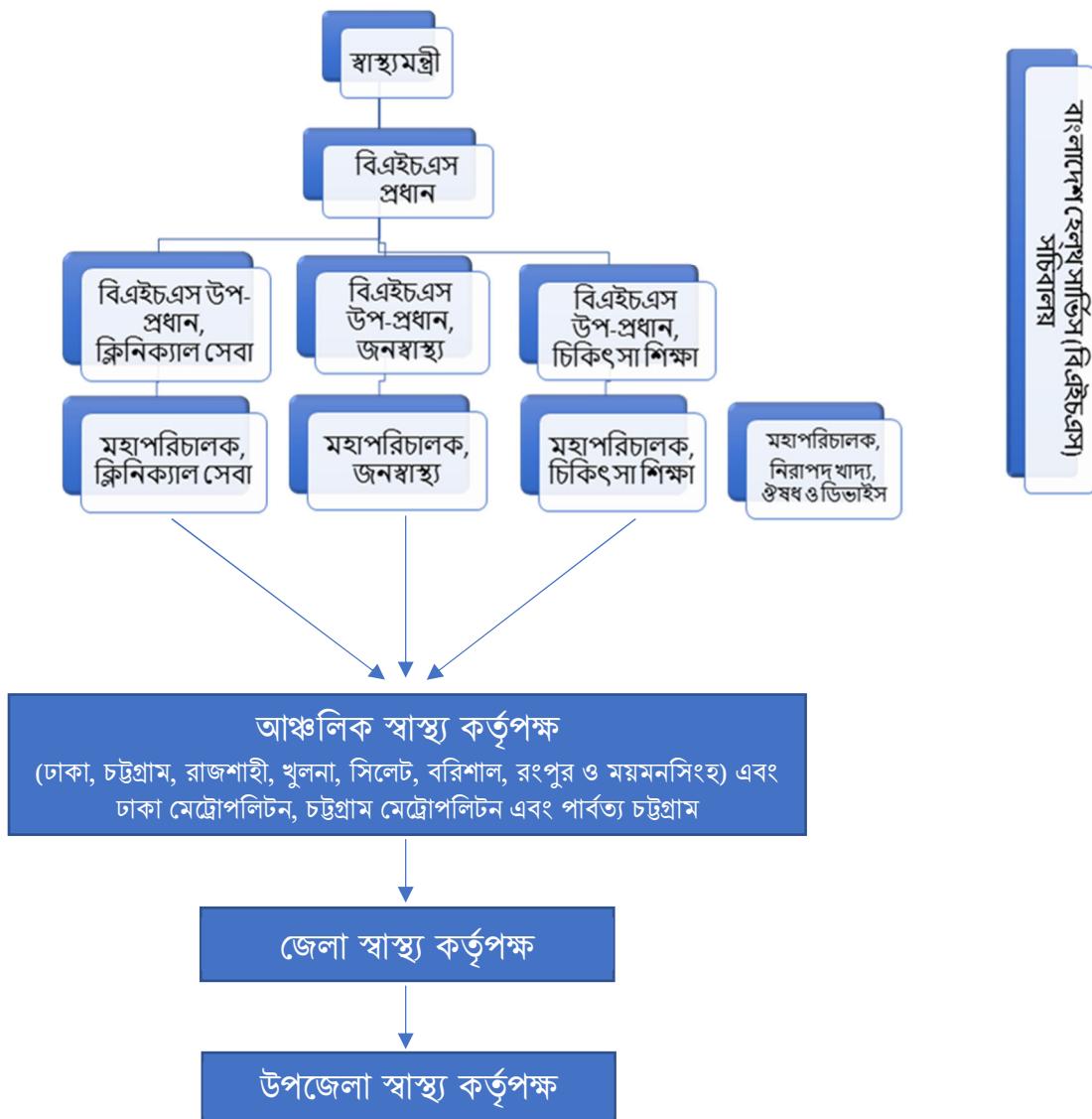
বিভাগীয় সদস্য (১৬জন)

০১	মেডিকেল এডুকেশন বিভাগ
০২	ক্লিনিক্যাল কেয়ার বিভাগ
০৩	বাংলাদেশ ইলাটিটিউট অব হেলথ এন্ড কেয়ার এক্সেলেন্স (BICE) বিভাগ
০৪	বাংলাদেশ হেলথ কেয়ার ইমপ্রুভমেন্ট (BHCI) বিভাগ
০৫	রেগুলেটরি ও ভারসাইট বিভাগ
০৬	পাবলিক হেলথ বিভাগ
০৭	হেলথ ল্যাবরেটরি ও ডায়াগনস্টিকস বিভাগ
০৮	খাদ্য, ঔষধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম বিভাগ
০৯	এনজিও, নন-প্রফিট ও প্রাইভেট হাসপাতাল বিভাগ
১০	সেবাগ্রহীতার অভিযোগ নিষ্পত্তি বিভাগ
১১	অ্যালায়েড এবং ট্র্যাডিশনাল হেলথ প্রফেশনাল বিভাগ
১২	বাংলাদেশ হেলথ টেকনোলজি অ্যাসেমবলেন্ট (HTA) বিভাগ
১৩	সেক্টোরাল হেলথ কোঅর্ডিনেশন বিভাগ
১৪	সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্পেশালাইজড হেলথকেয়ার (CASH) বিভাগ
১৫	আইন বিভাগ
১৬	স্বাস্থ্য অর্থ ও ক্রয় বিভাগ
১৭	স্বাস্থ্য নিরীক্ষা ও দুর্নীতি দমন বিভাগ

৪. বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস (BHS) গঠন : [স্বল্প, মধ্য-মেয়াদী]

ক) পেশাদারীত, দক্ষতা ও জবাবদিহিমূলক সেবার মান নিশ্চিত করতে বিদ্যমান স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ক্যাডারকে পুরণ্গঠনের মাধ্যমে প্রশাসনিকভাবে স্বায়ত্তশাসিত ও পেশাভিত্তিক একটি নতুন সিভিল সার্ভিস - বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস (BHS) গঠন করতে হবে। বি এইচ এস এর অধীনে বিভাগীয় পর্যায়ে ১১ টি আঞ্চলিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ থাকবে; এর মধ্যে থাকবে ঢাকা মেট্রোপলিটন, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম। বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস এর জন্য একটি স্বতন্ত্র সচিবালয় গঠন করা হবে, যার নেতৃত্বে থাকবেন একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক, যিনি মুখ্য সচিব (Chief of BHS) পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবেন। তাঁর অধীনে ক্লিনিকাল সেবা, জনস্বাস্থ্য, ও চিকিৎসা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা—এই তিনটি প্রধান খাত পরিচালনার জন্য তিনজন উপপ্রধান, বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস (ডেপুটি চিফ অব হেলথ-DCH) নিযুক্ত হবেন, যাঁরা প্রত্যেকে জ্যেষ্ঠ সচিব পদমর্যাদার হবেন। প্রতিটি খাতের অধীনে একজন করে মহাপরিচালক (DG) পদ সৃষ্টি করা হবে, যাঁরা সচিব-সমমানের পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবেন এবং কার্যক্রম পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট ডেপুটি চিফ অব হেলথ এর অধীনে কাজ করবেন। কর্মরত জনবলের জন্য একটি স্বতন্ত্র চাকরি বিধি ও পৃথক বেতন কাঠামো প্রণয়ন করতে হবে এবং যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন ভাতা পাবেন যাতে পেশাদারীত, দক্ষতা ও জবাবদিহিমূলক সেবার মান নিশ্চিত হয়। বিদ্যমান বিসিএস ক্যাডারভুক্তদের জন্য নতুন বিএইচএস ক্যাডারে বেছে নেওয়া বা বিকল্প অপশন এর সুযোগ রাখা হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস (বিএইচএস)



Note: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন মহাপরিচালক (DGHS, DG মেডিকেল এডুকেশন, পরিবার পরিকল্পনা, নার্সিং, টোব্যাকো কন্ট্রোল, হেলথ ইকোনমিক্স, CME, NIPORT, TEMO ও NEMEW) একত্র করে একটি একক সংস্থা — বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস (BHS) গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে আলাদা সেক্রেটারিয়েট থাকবে না; বরং একটি কেন্দ্রীয় BHS সেক্রেটারিয়েট থাকবে, যেখান থেকে প্রশাসনিক কাজ পরিচালিত হবে। DG পর্যায় থেকে সব ফাইল সরাসরি BHS-এর Deputy Chief ও Chief-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি হবে। এই কাঠামো স্বাস্থ্যখাতে দক্ষতা, সমন্বয় ও দৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে।

মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন মহাপরিচালক (যেমন DGHS, DG মেডিকেল এডুকেশন, পরিবার পরিকল্পনা, নার্সিং, টোব্যাকো কন্ট্রোল, হেলথ ইকোনমিক্স, CME, NIPORT, TEMO ও NEMEW) একত্র করে একটি একক সংস্থা—বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস (BHS) গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে আলাদা সেক্রেটারিয়েট থাকবে না; বরং একটি কেন্দ্রীয় BHS সেক্রেটারিয়েট থাকবে, যেখান থেকে প্রশাসনিক কাজ পরিচালিত হবে। DG পর্যায় থেকে সব ফাইল সরাসরি BHS-এর Deputy Chief ও Chief-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি হবে। এই কাঠামো স্বাস্থ্যখাতে দক্ষতা, সমন্বয় ও দৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে [স্বল্প-মেয়াদী]

খ) বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস গঠনের জন্য স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা, নার্সিং সেবা ও নগর পৌর স্বাস্থ্য সেবার অবকাঠামোর একত্রিকরণ ও পুনঃগঠন করতে হবে।[স্বল্প-মেয়াদী]

গ) বিকেন্দ্রীকরণ: স্বাস্থ্যসেবাকে বিকেন্দ্রীকরণ করে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ প্রশাসনিক আর্থিক স্বাধীনতা দিতে হবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে স্বায়ত্ত্বশাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। স্বাস্থ্যের অবস্থা, স্বাস্থ্য সমস্যার অবস্থা ও রোগতাত্ত্বিক প্রয়োজনের আলোকে উপজেলা-ওয়ারি বাজেট ও পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করতে হবে। বিভাগীয় পর্যায়ে কার্যক্রম স্বায়ত্ত্বস্থাপন আঞ্চলিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের অধীনে পরিচালিত হবে, যা নিয়ন্ত্রণ করবে বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস।জনবল নিয়োগ, বদলি নিয়ন্ত্রণ ও ক্রয়-সংগ্রহ-আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য দায়-দায়িত্বের প্রয়োগযোগ্য বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।[মধ্য মেয়াদী]

৫. স্বতন্ত্র পাবলিক সার্ভিস কমিশন (স্বাস্থ্য) গঠন : [স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী]

ক) নিয়মিত নিয়োগ প্রক্রিয়া ও স্বচ্ছতা আনয়ন করার লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র পাবলিক সার্ভিস কমিশন (স্বাস্থ্য) গঠন করতে হবে। [স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী]

খ) গুরুত্বপূর্ণ কিছু নির্বাচিত পদের ক্ষেত্রে (যেমন বি এইচ এস প্রধান ও উপপ্রধান, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ, মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, জাতীয় বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান প্রধান ও উপপ্রধান, মেডিকেল কলেজ, ঢাকা ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, বিভাগীয় আঞ্চলিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ, BMDC ও BMRC চেয়ারম্যান ইত্যাদি) যোগ্যতা, স্বচ্ছতা ও রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বজায় রেখে নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও নিয়োগের সুপারিশ করার জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের সার্চ কমিটি গঠন করা হবে। গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে যোগ্যতা নিয়োগপ্রাপ্তদের সম্পর্কে জাতীয় সংসদকে অবহিত করবে। এই উদ্যোগ জনস্বাস্থ্য ও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

৬. পেশাগত নিরপেক্ষতা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা: [স্বল্প-মধ্য-মেয়াদী]

স্বাস্থ্যখাতের অস্থিতিশীলতা মোকাবেলায় পেশাগত নিরপেক্ষতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা (১৯৭৯) অনুযায়ী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। জনগণের ট্যাঙ্কের অর্থে (সরকারি অর্থে) পরিচালিত প্রতিষ্ঠান যেমন সরকারি, স্বায়ত্ত্বস্থাপিত ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা এবং সরাসরি দলীয় রাজনীতি সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের নির্বাচী পদে ‘না’ রাখার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

৭. প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় সুশাসন: [স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী]

ক) প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সর্বজনীন প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে সরকারকে এই সেবা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে (বা ক্ষেত্রবিশেষে ভর্তুকিমূল্যে) প্রদান করতে হবে, যাতে কোনো নাগরিক আর্থিক প্রতিবন্ধকাতার কারণে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত না হন। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার কাঠামো শক্তিশালী করতে গ্রামাঞ্চলে ইউনিয়ন উপস্বাস্থকেন্দ্র ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহকে একত্রিত করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে রূপান্তর করতে হবে এবং শহরাঞ্চলে ওয়ার্ডভিত্তিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ লক্ষ্যে অন্যান্য

সংশ্লিষ্ট সরকারি খাত ও বেসরকারি খাতের সহায়তা নিতে হবে। প্রাথমিক সেবা চিকিৎসকের নেটওয়ার্ক গঠন করে শুন্যপদে প্রাথমিক স্বাস্থ্য চিকিৎসক/ জিপি/ পারিবারিক চিকিৎসক (Family Physician) -দের যুক্ত করা হবে, যা ইউনিয়ন থেকে উপজেলা পর্যন্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার প্রথম স্তরকে শক্তিশালী করবে। ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রয়োজনীয় জনবল, রোগনির্ণয় ব্যবস্থা, ঔষধ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঙ্গমাদির প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। প্রশিক্ষণের জন্য জেনেরিক কারিকুলাম অনুযায়ী BCPS, BCGP ও মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফ্যামিলি মেডিসিন কোর্স বা জিপি (GP) কোর্স প্রবর্তন করতে হবে। সরকারের অনুমোদন নিয়ে বাংলাদেশ কলেজ অব জেনারেল প্র্যাকটিশনার্স (BCGP) স্থাপিত হবে। এছাড়াও বাংলাদেশ একাডেমি অব ফ্যামিলি ফিজিসিয়ানস, ইউএসটিসি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকে উপযুক্ত করে প্রয়োজনে সরকার নির্ধারিত জেনেরিক ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান প্রশিক্ষণে কাজে লাগানো যেতে পারে। রেফারেল ব্যবস্থাকে কাঠামোবদ্ধ, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বাধ্যতামূলক ও কার্যকর করতে হবে। এই বাধ্যবাধকতা জরুরি চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। [স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী]

- খ) বিদ্যালয়ে, স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানেও জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক অবহিতিকরণ ও সৃজনশীল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

৮. অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের প্রাপ্যতায় সুশাসন : [স্বল্প মেয়াদী]

- ক) সকল নাগরিকের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের সর্বজনীন প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। এই ঔষধ ক্ষেত্রে বিশেষে বিনামূলে (যথা প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা পর্যায়ে এবং অতি দরিদ্রের ক্ষেত্রে) বা ভর্তুকি মূল্যে সরবরাহ করতে হবে। এজন্য সরকারি ঔষধ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলোকে আধুনিকায়ন ও কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে পুনর্গঠিত করতে হবে। বেসরকারি খাত থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্মত ঔষধ সংগ্রহে কৌশলগত ত্রয়ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে প্রতিটি সরকারি হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে ফার্মেসি ২৪ ঘণ্টা চালু রাখতে হবে। এই ফার্মেসিগুলো জাতীয় ফার্মেসি নেটওয়ার্ক-এর আওতায় পরিচালিত হবে। [স্বল্প মেয়াদী]
- খ) অ্যান্টি-ক্যান্সার, অ্যান্টি-ডায়াবেটিক, অ্যান্টি-হাইপারটেনসিভ ও অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের তালিকাভুক্ত অ্যান্টিবাইয়োটিকের ওপর ভ্যাট এবং প্রযোজ্য অন্যান্য শুল্ক ও কর শুন্য হবে। অন্যদিকে, ভিটামিন, মিনারেলস, ব্রেস্ট মিঙ্ক সাবস্টিটিউট ও প্রোবায়োটিকসহ স্বাস্থ্য-সম্পূর্ণক ও উচ্চমূল্যের ঔষধের ওপর ভ্যাট ও শুল্ক বৃদ্ধি করতে হবে। এর মাধ্যমে একদিকে জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধের প্রাপ্যতা বাড়বে, অন্যদিকে তুলনামূলক কম-প্রয়োজনীয় ও বিলাসমূলক পণ্যে কর বাঢ়িয়ে রাজস্ব আয় জোরদার করা যাবে। [স্বল্প মেয়াদী]

৯. সামাজিক স্বাস্থ্যবিমা চালু করা : [মধ্য-মেয়াদী]

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে সম্পূর্ণ কর-ভিত্তিক অর্থায়নের আওতায় আনতে হবে, যাতে এটি শর্তসাপেক্ষে নাগরিকের জন্য বিনামূলে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে নিশ্চিত করা যায়। এর অতিরিক্ত হিসেবে, গুরুতর অসুস্থতা ও ব্যয়বহুল চিকিৎসা ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে জাতীয় পর্যায়ে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক একটি সামাজিক স্বাস্থ্যবিমা (SHI) চালু করতে হবে। এই বিমা কাঠামোতে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে বিপর্যয়কর ব্যয়ের প্রধান কারণ—যেমন ক্যান্সার, হৃদরোগ, কিডনি ডায়ালাইসিস ও মারাঞ্জক দুর্ঘটনা—অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে চিকিৎসাব্যয়-সংক্রান্ত আর্থিক সুরক্ষা কার্যকরভাবে নিশ্চিত করতে হবে। সামাজিক স্বাস্থ্যবিমা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করতে হবে। সরকার একটি স্বাস্থ্য বীমা কর্তৃপক্ষ গঠন করবে সার্বজনীন স্বাস্থ্য বীমার জন্য। [মধ্য-মেয়াদী]

১০. হাসপাতাল ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবায় সুশাসন : [মধ্য-মেয়াদী]

- ক. উপজেলা পর্যায়ে সেকেন্ডারি স্বাস্থ্যসেবা জোরদার করে জনগণের সেবা গ্রহণ সহজলভ্য করতে হবে। জেলা হাসপাতালগুলোতে বিশেষায়িত (টারশিয়ারি স্তরের) চিকিৎসাসেবা চালু করতে হবে, যাতে সেবার বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত হয়, মেডিকেল কলেজ ও জাতীয় ইনসিটিউটগুলোর ওপর রোগীর চাপ কমানো যায়, এবং ভৌগোলিক কারণে কেউ বিশেষায়িত চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না হয়। সরকারি প্রয়োজনে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিসহ সকল স্তরের সেবাপ্রদানকারী কর্মচারীদের বিধি অনুযায়ী বদলি করা যাবে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কার্যক্রম সবকিছু স্বশাসিত জেলা ও উপজেলা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ অধীনে পরিচালিত হবে, যা নিয়ন্ত্রণ করবে বিভাগীয় পর্যায়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হেলথ সার্টিস। [মধ্য-মেয়াদী]

- খ. প্রতিটি বিভাগে অতত একটি পূর্ণাঙ্গ, সর্বাধুনিক সুবিধাসম্পন্ন ও বিশ্ব মানের টারশিয়ারি সেবা হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে হবে—যা জটিল ও বিশেষায়িত চিকিৎসার জন্য একটি আঞ্চলিক রেফারেল কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে।যা নতুনভাবে গড়ে তোলা যেতে পারে, অথবা বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহকে ধাপে ধাপে উন্নীত করে করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ ও বিদেশি যৌথ বিনিয়োগ সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। বার্ধক্যজনিত স্বাস্থ্যসেবা-কে অগ্রাধিকার দিতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]
- গ. সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোর সেবা প্রদানের সময় সকাল ৮:৩০ টা থেকে রাত ৮:৩০ টা পর্যন্ত বর্ধিত করা।
- ঘ. একটি রোগের চিকিৎসার জন্য একজন চিকিৎসকেকেই দেখাবে, একাধিক চিকিৎসক বা বিশেষজ্ঞকে নয়।কারণ তা সার্ভিস এর ডুপ্লিকেশন হয় এবং রোগী ও ডাক্তার উভয়েরই সময় ক্ষেপণ হয়। নির্দিষ্ট চিকিৎসার জন্য BICE কর্তৃক নির্ধারিত গাইডলাইন অনুসরণ করা সব চিকিৎসকের জন্য বাধ্যতামূলক। প্রয়োজনে উচ্চতর মেডিকেল বোর্ড গঠন করা যেতে পারে।এটা সরকারি ও বেসরকারী সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। যে কোন সরকারি আধা সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসক কর্মরত আছেন সে হাসপাতাল থেকে কোন রোগী ঐ চিকিৎসকের প্রাইভেট চেম্বারে যেতে পারবে না।হাসপাতালের কোন কর্মচারী রোগী প্রেরণ করলে তা শাস্তি যোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে। চিকিৎসকের ওপর অতিরিক্ত চাপ না দেওয়া এবং প্রতিটি রোগীর জন্য মানসম্মত সময় ও যত্ন নিশ্চিত করার জন্য একজন চিকিৎসক সর্বোচ্চ দৈনিক ৫০ জন রোগী দেখতে পারবেন। প্রতি রোগীর জন্য অতত ১০ মিনিটের পরামর্শ সময় নিশ্চিত করতে হবে, এজন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সেবা প্রদানকারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং সাম্প্রাদিকভাবে প্রেসক্রিপশন নমুনা যাচাই পদ্ধতি চালু করা হবে। [মধ্য-মেয়াদী]
- ঙ. অতি দরিদ্র বা যারা দেশের মোট জনসংখ্যার ২০%, তারা সব হাসপাতালে বিনামূল্যে সব সেবা পাবে।[মধ্য-মেয়াদী]
- চ. দেশের সব হাসপাতালের রক্ত সঞ্চালন, ল্যাবরেটরী ও ফার্মেসী ২৪/৭ খোলা থাকবে। [স্বল্প মেয়াদী]
- ছ. যে ব্যক্তি স্বীকৃত MBBS বা BDS ডিগ্রি প্রাপ্ত নন, তিনি যদি চিকিৎসা অনুশীলন করেন, তবে তা আইনত বেআইনি কার্যক্রম হিসেবে গণ্য হবে। MBBS বা BDS ডিগ্রি ব্যক্তিত কেউ নিজেকে 'চিকিৎসক' পরিচয়ে রোগী দেখতে পারবেন না। BMDC এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে। [স্বল্প মেয়াদী]
- জ. সব হাসপাতালে নিরাপদ ও কার্যকর ওযুধ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্ট পদ সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্যে, প্রতিটি সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্রে ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্ট পদের সুযোগ ও পদোন্নতির সুনির্দিষ্ট কাঠামো তৈরি করতে হবে। এতে ওযুধের সঠিক ব্যবহার, রুগ্নীর প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন, ডাগ ইটারঅ্যাকশনের ঝুঁকি কমানো এবং মাল্টিডিসিপ্লিনারি চিকিৎসা সেবায় ফার্মাসিস্টদের ভূমিকা সুসংহত হবে। এই পদ সৃষ্টি করলে চিকিৎসা সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে এবং রোগীর নিরাপত্তা আরও নিশ্চিত হবে। [মধ্য-মেয়াদী]
- ঝ. কোনো বিদেশি চিকিৎসক যদি BMDC-র অনুমতি ব্যতিরেকে বাংলাদেশে চিকিৎসা অনুশীলন করেন, তবে তা অননুমোদিত ও বেআইনি কার্যক্রম হিসেবে গণ্য হবে। BMDC কারও ডিগ্রির স্বীকৃতি ও পেশাগত যোগ্যতা যাচাই না করা পর্যন্ত কাউকে চিকিৎসা প্রদানের অনুমতি দিবে না। [স্বল্প মেয়াদী]
- ঝঃ. হাসপাতালে মানোন্নয়নের জন্য কার্যকরী মান উন্নয়ন পর্যন্ত ও কন্টিনিউয়াস এডুকেশন পদ্ধতির ব্যবস্থা থাকতে হবে।[স্বল্প মেয়াদী]

১১. জরুরি স্বাস্থ্যসেবা নেটওয়ার্ক গঠন: [স্বল্প মেয়াদী]

জরুরি চিকিৎসাকে একটি বিশেষায়িত ও অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেবা হিসেবে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় একে একটি স্থাকৃত চিকিৎসা বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি হাসপাতালের জরুরি বিভাগসমূহ পর্যায়ক্রমে এই বিশেষজ্ঞদের নেতৃত্বে পরিচালিত হতে হবে, যাতে জরুরি চিকিৎসাসেবার পরিসর ও মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

১২. স্বাস্থ্য পরিষেবা সহায়ক নেটওয়ার্ক গঠন: [স্বল্প-মেয়াদী]

স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলোর প্রাপ্যতা, মান ও পরিব্যাপ্তি নিশ্চিত করতে জাতীয় ফার্মেসি নেটওয়ার্ক, জাতীয় ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি নেটওয়ার্ক, জাতীয় রক্ত সঞ্চালন নেটওয়ার্ক এবং জাতীয় অ্যাম্বুলেন্স নেটওয়ার্ক গঠন করতে হবে। এই পরিষেবাগুলো নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী স্ব ক্ষেত্রে একটি একীভূত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সারাদেশে সংযুক্ত থাকবে এবং পরিচালিত হবে, যাতে জনগণ সহজে, দুর্ত ও নির্ভরযোগ্যভাবে এই পরিষেবাগুলো পেতে পারেন।

১৩. স্বাস্থ্য সুরক্ষা: [স্বল্প-মেয়াদী]

সেবাগ্রহীতার অভিযোগ নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে একটি আধুনিক ডিজিটাল অভিযোগ নিষ্পত্তি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা হবে। BMDC, BNMC, Bangladesh Pharmacy Council, Allied Health Professional Council -ইত্যাদির আইনগত ক্ষমতা ও কাঠামোকে আরও কার্যকর করা হবে। চিকিৎসা প্রদানকারীদের নিরাপত্তা ও পেশাগত সুরক্ষা (স্বাস্থ্য সুরক্ষা নীতির অংশ)। ১. মেডিকেল প্রফেশনাল ইন্সুরেন্স: চিকিৎসক, নার্স, টেকনোলজিস্ট ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জন্য মেডিকেল প্রফেশনাল ইন্সুরেন্স চালু করা হবে, যাতে কর্মজীবনে আইনি ঝুঁকি বা অপ্রীতিকর ঘটনার ক্ষেত্রে তাদের আর্থিক ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত হয়। ২. পেশাগত অবহেলা (Professional Negligence) বিষয়ে সুরক্ষা: BMDC, BNMC, Bangladesh Pharmacy Council, Allied Health Professional Council -ইত্যাদির পূর্বানুমতি ছাড়া কোনো চিকিৎসক, নার্স, টেকনোলজিস্ট ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের গ্রেফতার করা যাবে না। শুধুমাত্র অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য হবে, তবে তা নরাই দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা: বাংলাদেশ পুলিশের অধীনে একটি নির্দিষ্ট ইউনিট থাকবে যেখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সংরক্ষিত কিছু পুলিশ থাকবেন (যাদের মেডিকেল পুলিশ বলা যেতে পারে) যারা জরুরী পরিস্থিতিতে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। হাসপাতাল ও ক্লিনিকে অনাকাঙ্ক্ষিত হামলা, হমকি ও সহিংসতা প্রতিরোধে এই ইউনিট কাজ করবে।

১৪ . চিকিৎসা শিক্ষায় সুশাসন : [স্বল্প ও মধ্য-মেয়াদী]

চিকিৎসা শিক্ষার মানোন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত, নীতিনির্ভর এবং কাঠামোগত সংস্কার অপরিহার্য নিম্নোক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন:

জনস্বাস্থ্য চাহিদা, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, প্রতিষ্ঠান সক্ষমতা এবং World Federation for Medical Education (WFME)-এর গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে দেশের সকল মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম নিয়মিত মূল্যায়ন করতে হবে।[স্বল্প মেয়াদী]

মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন, প্রতিষ্ঠান সংখ্যা ও আসন সংখ্যা পুনর্বিন্যাস করতে হবে। মানহীন সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বন্ধ করতে হবে। তবে ছাত্রছাত্রীদের ক্ষতি এড়াতে তাদের অন্যান্য স্বীকৃত মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরের (transfer) ব্যবস্থা করতে হবে।[স্বল্প মেয়াদী]

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথ উদ্যোগে (joint venture) বাংলাদেশে মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে WFME-এর মানদণ্ড অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি লিজকৃত বা সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত জমিতে স্থাপনের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে জমির মালিকানা (কর্বলা) গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না।[স্বল্প মেয়াদী]

পাঁচ দিনের একাডেমিক সপ্তাহ চালু করে শিক্ষার কাঠামো উন্নত করতে হবে, যাতে ছাত্রদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষকদের ওপর কাজের চাপ কমে। ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীদের জন্য ভর্তি প্রক্রিয়ায় অপ্রয়োজনীয় বাধা অপসারণ করে ‘রেইন ড্রেইন’ রোধ এবং প্রবাসী বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের দেশে ফিরে আসার সুযোগ তৈরি করতে হবে।[স্বল্প মেয়াদী]

FCPS ও MD/MS কোর্সসমূহে পাঠ্যক্রমে সমন্বয় (curricular alignment) আনতে হবে এবং দেশ-বিদেশে পারস্পরিক স্বীকৃতি (reciprocal recognition) নিশ্চিত করে মাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষার আন্তর্জাতিক মান বৃদ্ধি করতে হবে। [স্বল্প মেয়াদী]

মাতক ও মাতকোত্তর পর্যায়ে Competency-Based Medical Education (CBME) এবং Community-Oriented Medical Education (COME) কার্যকরভাবে চালু করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান, দক্ষতা ও পেশাগত আচরণে পূর্ণ সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। [মধ্য-মেয়াদী]

১৫. চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুশাসন : [স্বল্প ও মধ্য-মেয়াদী]

ক. বাংলাদেশ মেডিকেল ইউনিভার্সিটি (BMU), অন্যান্য মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জিস (বিসিপিএস), প্রাথমিক পর্যায়ে পর্যায়ে পুরানো আটচি সরকারি মেডিকেল কলেজ এবং পরবর্তীতে সকল মেডিকেল কলেজ, বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহের জন্য Bangladesh Health Commission (BHC)-এর Medical Education Wing-এর অধীনে পৃথক ও স্বশাসিত শাসন কাঠামো গঠন করা হবে। বাংলাদেশ মেডিকেল ইউনিভার্সিটি আইনের সংস্কার করে কার্যকর পরিচালন কাঠামো নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে,

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাখ্যক্ষ নিয়োগ প্রক্রিয়া (বিজ্ঞাপনে চাহিদাকৃত নির্ধারিত যোগ্যতা) করবে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন (BHC)-এর পোস্টগ্র্যাজুয়েট মেডিকেল উইং গঠন হওয়ার আগ পর্যন্ত UGC (University Grants Commission) দ্বারা হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

- খ. বাংলাদেশ মেডিকেল ইউনিভার্সিটি ও অন্যান্য মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়-সংযুক্ত হাসপাতালসমূহ (University Hospitals) সরাসরি প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে নিজস্ব বোর্ড অব গভর্ন্যাল-এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে, যাতে নীতিনির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত হয়। [মধ্য-মেয়াদী]
- গ. ভবিষ্যতে একক ও সমষ্টির কাঠামোর ভিত্তিতে একটি স্বশাসিত মেডিকেল ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যিক, যা দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার সামগ্রিক ও সমষ্টির উন্নয়ন ও গবেষণাকে সুসংহতভাবে এগিয়ে নিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। [মধ্য-মেয়াদী]
- ঘ. বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস (বিসিপিএস) কে পরিগণ্য (Deemed) বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব করা হচ্ছে। বিসিপিএস-এ কাউন্সিল সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রতিটি বিশেষজ্ঞ শাখার প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে, যাতে নীতিনির্ধারণে প্রেরণাগত অন্তর্ভুক্তি ও বহুমাত্রিকতা বজায় থাকে। এই কাঠামোর আওতায় বিসিপিএস -এর প্রতিটি ফ্যাকাল্টি কে সাব কলেজ রূপান্তরিত করে (যেমন: মেডিসিন, সার্জারি, গাইনী, পেডিয়াট্রিক্স, ক্লিনিক্যাল অনকোলজি (রেডিওথেরাপির নতুন নাম হিসেবে) ইত্যাদি হিসেবে গঠন করা, যেগুলোর একাডেমিক স্বায়ত্তশাসনসহ প্রশংস্য ব্যাংক, পাঠ্যক্রম উন্নয়ন ইউনিট ও রিসার্চ কোর্টিনেশন সেল পরিচালনা করবে। [স্বল্প-মেয়াদী]
- ঙ. NICVD, NITOR, NIKDU, ICMH, NIMH, NICRH, NIDCH, DDC, NIPSOM, IEDCR, IPH, IPHN, CME ইত্যাদি সহ জাতীয় বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহকে Bangladesh Health Service (BHS)-এর অধীনে স্বশাসিতভাবে পরিচালিত হবে এবং প্রধানদের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদায় নিয়োগ দেয়া হবে। [মধ্য-মেয়াদী]
- চ. স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলি এনজিও ব্যৱৰো ব্যতীত সরাসরি স্থানীয় ও বিদেশি তহবিল গ্রহণ করতে পারবে এবং তা গবেষণা ও সেবা প্রদানে সঠিকভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরকারের নিয়মিত অডিট কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। [মধ্য-মেয়াদী]
- ছ. টারশিয়ারি ও কোয়ার্টার্নারি সেবার শাসন কাঠামো: সকল টারশিয়ারি ও কোয়ার্টার্নারি হাসপাতালসমূহে ইলেকট্রনিক মেডিকেল রেকর্ড চালু করে চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় গতি, নির্ভুলতা ও ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]
- জ. সেবা প্রদানকারী হাসপাতাল ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণ প্রদানকারী হাসপাতালকে পৃথকভাবে পরিচালনা করতে হবে। মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং অন্যান্য শিক্ষা-প্রশিক্ষণ হাসপাতালগুলোর কাঠামোগত সংস্কার করতে হবে, যাতে তাদের প্রধান কার্যক্রম শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নাবনের উপর কেন্দ্রীভূত হয়। ফলে চিকিৎসা শিক্ষা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে উৎকর্ষতা অর্জনের পথ প্রশস্ত হবে এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থায় জ্ঞানভিত্তিক অগ্রগতি নিশ্চিত করা যাবে। প্রেসক্রিপশন যাচাই, রোগী পরামর্শ সময় নির্ধারণ এবং সেবার গুণমান নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। জনসংখ্যাভিত্তিক ডেটা অনুসারে হাসপাতাল নির্মাণ ও যন্ত্রণাবেক্ষণে নিরীক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]
- ঝ. সরকারি মেডিকেল কলেজসমূহে অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার অধ্যক্ষের নেতৃত্বে একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হবে, যা কলেজ ব্যবস্থাপনা, কলেজের কোর্স কারিকুলাম, তার বাস্তবায়ন ও শিক্ষার মান নিশ্চিত করবে। [স্বল্প-মেয়াদী]
- ঝঃ. প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ আইন সংস্কার: স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সরকারি তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করতে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ আইনের আওতায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে মনোনীত অধাপক পদমর্যাদার একজন মেডিকেল কলেজ শিক্ষককে কো-চেয়ারপারসন হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।। [স্বল্প-মেয়াদী]

১৬. জনবল সংস্কার ও সুশাসন : [মধ্য-মেয়াদী]

যেসব বিষয়ে জনবল সংকট প্রকট (যেমন: মেডিকোলিগাল, বেসিক, ক্লিনিক্যাল অনকোলজি ও অন্যান্য ক্লিনিক্যাল সাবজেক্ট), সেখানে আগ্রহ সৃষ্টি ও জনবল ধরে রাখতে বিশেষ ভাত্তা এবং উপযুক্ত আর্থিক ও অন্যান্য প্রযোগের ব্যবস্থা করতে হবে।

সকল বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র পূর্ণকালীন শিক্ষক ক্যাটেগরি চালু করতে হবে। এই ক্যাটেগরির জন্য নন-প্র্যাকটিসিং ভাত্তা ও অতিরিক্ত প্রযোগের নির্ধারণ করতে হবে, যাতে শিক্ষকরা শিক্ষা ও গবেষণায় পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারেন। এর ফলে এই খাতে দীর্ঘমেয়াদে প্রেরণাগত উৎকর্ষতা নিশ্চিত করা যাবে।

স্বাস্থ্য অবকাঠামোর বিভিন্ন স্তরে প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি করতে হবে। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে বেতন ভাতাদি দিতে হবে। পদোন্নতির জন্য যোগ্যতা, দুর্গম এলাকায় সেবা ও প্রশিক্ষণ, এবং নির্ধারিত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী সেবা প্রদান কে বিবেচনা করা হবে; অন্যথায় এর ব্যত্যয় ঘটলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

দুর্গম এলাকায় সেবা প্রদানের জন্য সেবা প্রদানকারীদের বিশেষ ভাতা এবং বসবাসের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রস্তাবিত ‘বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস’ কাঠামো এবং অন্যান্য সেবা ও পরিষেবা সংক্রান্ত সুপারিশের আলোকে সারাদেশে স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় জনবলের ধরন ও পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বিদ্যমান শূন্যপদগুলো প্রয়োজনে ব্যক্তিখাতের সেবাপ্রদানকারীদের চুক্তির মাধ্যমে অবিলম্বে পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে নতুন পদ সৃষ্টি ও জনবল নিয়োগের উদ্যোগ নিতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

১৭. বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালীকরণ ও সুশাসন : [স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী]

- ক. চিকিৎসা এমন একটি সামাজিক প্রতিশুভি, যা সমাজের প্রয়োজন মেটাতে উদ্ভাবনী ও টেকসই উপায়ে পরিচালিত হয়, আর্থিক লাভের চেয়েও সামাজিক চুক্তি যেখানে মুখ্য। বাংলাদেশে একটি কার্যকর ও টেকসই স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে, সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ, মান ও দক্ষতা বাড়াতে সামাজিক ব্যবসার মডেল প্রয়োগের জন্য সঠিক নীতিমালা ও অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এতে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে, স্বাস্থ্যসেবা জনমূর্খী ও সহজলভ্য হবে এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা আরও কার্যকর ও টেকসই হবে। [মধ্য-মেয়াদী]
- খ. বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক কেন্দ্র ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের লাইসেন্স ও প্রশাসনিক কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য একটি “একক সেবা কেন্দ্র” চালু করতে হবে। করছাড়, প্রগোদনা ও সহজতর নীতিগত সহায়তার মাধ্যমে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]
- গ. মাননির্ভর গ্রেডঁ ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং এজন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সেবার স্থীরুত্বিতে অ্যাক্রিডিটেশন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, যেখানে নিবিড় পরিচর্যা ইউনিট (ICU) ব্যবহারের মান হাসপাতালে সংক্রমণের হার ও অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবস্থাপনার ওপর নজরদারি থাকবে এবং প্রতিটি ৫০ শয়ার হাসপাতালে একজন সিনিয়র চিকিৎসকের নেতৃত্বে ব্যবস্থাপনা বোর্ড (দুই-তৃতীয়াংশ চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা পেশাজীবী) গঠনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সেবার মান ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এ সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের তদারকি ও সেবার পরিমাণ, মান ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং অপ্রয়োজনীয় সেবা ও প্রেসক্রিপশন মান নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সাথে মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের (প্রস্তাবিত) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিকস)। [স্বল্প-মেয়াদী]
- ঘ. বেসরকারি হাসপাতাল সম্প্রসারণ: রোগীদের বিদেশস্থিতা রোধ ও দেশে আন্তর্নির্ভরশীল চিকিৎসা ব্যবস্থার সম্পর্কে প্রশিক্ষিত (কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট ও অন্যান্য অঙ্গ প্রতিস্থাপন, ক্যান্সার, কার্ডিয়াক সার্জারি, বৰ্ক্যুত, ও দুর্লভ রোগ চিকিৎসা ইত্যাদির উন্নয়ন, চিকিৎসায় করছাড়, আমদানিতে সুবিধা ও অর্থনৈতিক প্রগোদনা দিতে হবে। প্রয়োজনে সরকার বেসরকারি খাতের সাথে অংশীদারিত (PPP) ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন, ঝুঁকি বঞ্চন ও সেবার মান উন্নয়ন করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

১৮. স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জন্য বেতন বোর্ড গঠন: [স্বল্প-মেয়াদী]

বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশনের অধীনে ইন্টার্ন চিকিৎসক, মাতাকোত্তর ছাত্র-ছাত্রীদের ভাতা, বেসরকারি চিকিৎসক, নার্স, সব ধরনের স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য একটি সুসংগঠিত এবং যুগোপযোগী বেতন কাঠামো প্রণয়ন করতে হবে। এই কাঠামো প্রণয়ন করলে, কর্মীদের আর্থিক স্থায়িত্ব এবং চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। এটি স্বাস্থ্য সেবা কর্মীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী উৎসাহ এবং কাজের পরিবেশের উন্নতি করতে সহায়তা করবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

১৯. কাগজবিহীন (Paperless) ডিজিটাল স্বাস্থ্যব্যবস্থায় সুশাসন: [মধ্য-মেয়াদী]

বাংলাদেশে একটি সম্পূর্ণ কাগজবিহীন স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে স্বাস্থ্যখাতের সব সেবা ও ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে রূপান্তর করতে হবে। প্রতিটি নাগরিকের জন্য ইউনিক স্বাস্থ্য আইডি ও স্মার্ট স্বাস্থ্য কার্ড চালু করতে হবে। সেবার ধারাবাহিকতা ও তথ্য সংরক্ষণের জন্য ইলেক্ট্রনিক হেলথ রেকর্ড সিস্টেম চালু করা জরুরি। সরবরাহ ও মজুত ব্যবস্থাপনার জন্য আধুনিক ডিজিটাল লজিস্টিক সিস্টেম এবং প্রক্রিয়াগত স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ডিজিটাল প্রোকিউরমেন্ট ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। জাতীয় ফার্মেসি নেটওয়ার্ক-কে ডিজিটাল ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে। এই সমষ্টি ডিজিটাল ব্যবস্থা দেশীয় প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের নেতৃত্বে স্থানীয়ভাবে তৈরি ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

২০. সেইফ ফুড, ড্রাগ, ও আইভিডি-মেডিকেল ডিভাইস প্রশাসন গঠন: [স্বল্প ও মধ্য-মেয়াদী]

একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে তিনটি শাখা থাকবে: ঔষধ-টিকা-প্রসাধনী, আই ভি ডি-মেডিকেল ডিভাইস, ও নিরাপদ খাদ্য। [স্বল্প-মেয়াদী]

- ক. ঔষধ-টিকা-প্রসাধনী খাতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে প্রতি দুই বছর অন্তর অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের তালিকা পর্যালোচনা, অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট (API)-এর মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণ, স্থানীয় রোগীদের উপর ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল বাধ্যতামূলক করা, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত নিরপেক্ষ নিরীক্ষা কর্মসূচি গঠন এবং বৈদেশিক যৌথ বিনিয়োগকে উৎসাহ প্রদান। [মধ্য-মেয়াদী]
- খ. মেডিকেল ডিভাইস খাতে মধ্য-মেয়াদে টেলিমেডিসিন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন একটি মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি, মীতিমালা হালনাগাদ, স্থানীয় উন্নতবনকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে উৎসাহ প্রদান, পুরনো যন্ত্রপাতি পরিয়ত্যাগ এবং বৈদেশিক যৌথ বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]
- গ. খাদ্য নিরাপত্তা খাতে সংক্ষিপ্ত-মেয়াদে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (Food Safety Authority) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্থানান্তর, ২০১৩ সালের খাদ্য আইন হালনাগাদ, খাদ্য উৎপাদন ও বিপণনে ট্রেসেবিলিটি চালু, স্থানীয় পর্যায়ে অফিসার নিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড নিশ্চিতকরণ। [স্বল্প-মেয়াদী]
- ঘ. চিকিৎসক-ফার্মাসিউটিক্যাল কর্মসংস্থতি সম্পর্কিত নীতি: [মধ্য-মেয়াদী]

World Medical Association – (WMA) এর প্রস্তাবনার আলোকে নিরোক্ত প্রস্তাবনা দেওয়া হচ্ছে, যাতে করে ধীরে ধীরে (মধ্য-মেয়াদে) একটি নৈতিক ও ভারসাম্যপূর্ণ চিকিৎসক-ফার্মাসিউটিক্যাল কর্মসংস্থতি গড়ে তোলা যায়:

১. ঔষধের নমুনা বা উপহার প্রদান করে কোনো ধরনের প্রভাব বিভাবের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে;
২. মেডিকেল কনফারেন্স আয়োজনের পূর্বে অবশ্যই বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (BMEAC) অনুমোদিত CPD ক্রেডিট পয়েন্ট গ্রহণের জন্য আবেদন করতে হবে এবং মেডিক্যাল কনফারেন্সের সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব ট্যাক্স অফিসে জমা দিতে হবে এবং এর একটি কপি বিএমইএসি-তে জমা দিতে হবে;
৩. কনফারেন্সে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির অংশগ্রহণ: ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো অনুমোদিত কনফারেন্সে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে পারবে, তবে কেবলমাত্র প্রদর্শনী এলাকায় পণ্যের উপস্থাপনার জন্য তাদের প্রতিনিধির শারীরিক উপস্থিতি অনুমোদিত থাকবে। কোনো ধরনের খাবার, উপহারের ব্যাগ বা অন্য কোনো উপহার সামগ্রী সরবরাহ ও ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাখুলা, রাফেল ড্র ইত্যাদি করতে পারবে না;
৪. ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো শুধুমাত্র ডাক্তারদের ই-মেইল বা ডাকযোগের মাধ্যমে তাদের পণ্য সম্পর্কিত তথ্য পাঠাতে পারবে। প্রতিনিধিরা সরাসরি সাক্ষাতের মাধ্যমে দৈনন্দিন প্রোডাক্ট প্রমোশন করতে পারবে না;
৫. চিকিৎসকের চেম্বার বা হাসপাতাল প্রাঙ্গণে কোনো ধরনের ঔষধের/পণ্য প্রচার কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে, কারণ এসব কর্মকাণ্ডে চিকিৎসকের মনোযোগ বিস্থিত হয় এবং রোগীরা সঠিকভাবে চিকিৎসাস্বার্থে থেকে বষ্টিত হন;
৬. চিকিৎসকদের যেকোনো পেশাগত সংগঠন, যেমন—চিকিৎসক সমিতি, পেশাগত সংস্থা বা বিশেষজ্ঞ সমাজ (Professional Associations or Societies)—এ কোনো ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে থাকতে পারবে না; ও
৭. নতুন ওষুধ বা নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্য থাকলে তা প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক না করে কেন্দ্রীয়ভাবে নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক সভার মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

২১. ঔষধ ও প্রযুক্তি সুশাসন : [মধ্য-মেয়াদী]

জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের বিবেচনায় মানসম্মত এপিআই, ভ্যাকসিন এবং মেডিকেল ডিভাইস উৎপাদনে দেশীয় স্বনির্ভরতা অর্জন করতে হবে। বৈদেশিক মুদ্রা সশ্রম এবং আমদানি নির্ভরতা কমাতে এই খাতে গবেষণা ও উৎপাদন সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। প্রয়োজনে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের যৌথ বিনিয়োগে উৎসাহ দিতে হবে। এজন্য পর্যাপ্ত প্রণোদনা, স্বল্পসুদের দীর্ঘমেয়াদি খণ্ড, ট্যাক্স ও ভ্যাট ছাড়সহ প্রয়োজনীয় নীতিগত সুবিধা প্রদান করতে হবে। এজন্য আইন প্রয়োগ করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

২২. বিদেশে চিকিৎসা নির্ভরতা হাস এবং মেডিকেল ট্যুরিজম উন্নয়ন: [মধ্য-মেয়াদী]

- ক. প্রতিবছর বিপুল বিদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং বিদেশগামী রোগীর সংখ্যা হাসের লক্ষ্যে একটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। ক্যান্সার চিকিৎসা, অঙ্গ প্রতিস্থাপন সার্জারি, হৃদরোগ, জটিল কিডনি রোগ, বৰ্দ্ধ্যাত্ব ব্যবস্থাপনা এবং উন্নত রোগনির্ণয়ের জন্য আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন উৎকর্ষকেন্দ্র (Centers of Excellence) প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেওয়া হবে, যাতে দেশেই উচ্চমানের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা যায়। এই উদ্যোগের জন্য পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP)-কে উৎসাহ দিতে হবে এবং উচ্চপ্রযুক্তি নির্ভর বিশেষায়িত হাসপাতালে বিনিয়োগ সহযোগিতা করতে হবে। দক্ষ জনবল উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি (যেমন: JCI, ISO) অর্জন এবং সেবার মানোন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় স্বাস্থ্যসেবায় জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পাবে। [মধ্য-মেয়াদী]
- খ. একইসঙ্গে, মেডিকেল ট্যুরিজম সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি আঞ্চলিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিকল্পিত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এ জন্য রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য দেশের পুরাতন ল্যাবরেটরীগুলির দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]
- গ. কোন চিকিৎসক মেডিক্যাল বোর্ডের সিদ্ধান্ত ব্যতীত কোন রোগী বিদেশে রেফার করতে পারবেন না। একটি দালাল চক্র রোগীদের বিদেশে প্রেরণ করে। রোগীরা আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সকল রোগীকে বিদেশ যাবার পূর্বে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অন লাইন ফরম পূরণ করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে তাতে কোন রোগের জন্য যাচ্ছেন তার বিস্তারিত ড্রল্লেখ থাকবে কোন চিকিৎসক এর বিদেশের কোন হাসপাতালের এর সাথে রোগী আদান প্রদানের সম্পর্ক থাকতে পারবে না। এতে অনৈতিক সম্পর্ক থাকার সম্ভবনা থাকে। এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে। বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল এই বিষয়টির ওপর সময় সময় নজরদারি করবে। [মধ্য-মেয়াদী]

২৩. প্রবাসী বাংলাদেশি স্বাস্থ্যসেবা পেশাজীবীদের সম্পৃক্ততায় বিশেষ নীতিমালা : [মধ্য-মেয়াদী]

বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি চিকিৎসক, নার্স, প্রযুক্তিবিদ এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা পেশাজীবীদের দেশের স্বাস্থ্যবস্থার শক্তিশালীকরণ ও উন্নয়নের জন্য তাদের মূল্যবান দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরে আসার জন্য আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য একটি বিশেষ নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে, যা প্রত্যাবর্তনকারী পেশাজীবীদের প্রয়োজনীয় সুবিধা ও সহায়তা প্রদান করবে।

২৪. ক্রয় ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কার: [মধ্য-মেয়াদী]

ই-জিপি চালু, স্বাধীন নিরীক্ষা, স্বাস্থ্য সমস্যার আলোকে স্থানীয়ভাবে বাস্তবসম্মত বাজেট ব্যবস্থাপনা, পারফরম্যান্সভিত্তিক প্রশোদন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর চাহিদা পূর্বাভাস চালু করতে হবে এবং সে অনুযায়ী ক্রয় সংগ্রহ কাজ সম্পাদিত হতে হবে। বাজেট প্রাঙ্গনে উন্নয়ন, রাজস্ব ও পরিচালনা ভিত্তিক বাজেট এক সাথেই প্রতিফলিত হতে হবে। স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থাপনার সকল স্তরে জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা, বাজেট, কর্মসূচির পর্যালোচনা করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

২৫. দুর্নীতি প্রতিরোধ : [স্বল্প-মেয়াদী]

- ক. প্রতিটি মহাপরিচালকের দপ্তরে অবস্থিত স্বাধীন ইন্টারনাল অডিট ইউনিট অধিকতর শক্তিশালী এবং কার্যকর করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]
- খ. কোন চিকিৎসক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হাসপাতাল সেবা, ঔষধ, রোগ নির্ণয়ক পরীক্ষার পরামর্শ দিবেন না। কোন ঔষধ কোম্পানীর প্যাডে ঔষধের নির্দান (প্রেসক্রিপশন) লিখবেন না। [স্বল্প-মেয়াদী]

২৬. ক) সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও বেশ কিছু দীর্ঘস্থায়ী জিটিল ব্যাধির অতি দুর্ত হার বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলির রেজিস্ট্রি তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা জরুরি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এই রেজিস্ট্রি, সঠিক পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে, এসকল ব্যাধির চিকিৎসা ও প্রতিরোধ পরিকল্পনায় প্রচুর ভূমিকা রাখতে পারে।

- খ) উপরোক্ত সুপারিশের ধারাবাহিকতায়, অগ্রাধিকারভিত্তিতে, অত্যন্ত ব্যয়বহুল মরণব্যাধি ক্যান্সারকে প্রথমে নির্বাচন করে একটি পরিকল্পনা সমর্থিত পরিকল্পনা গ্রহণ করার সুপারিশ করা হচ্ছে। এর আওতায়, জেলা ও উর্ধ্বতন সকল সরকারি হাসপাতাল এবং ১০০ শয়ার অধিক বেসরকারি হাসপাতালে প্রাথমিক ক্যান্সার শনাক্তকরণ কেন্দ্র স্থাপন এবং ক্যান্সার রেজিস্ট্রি চালু নিয়মিত ক্রিনিং কর্মসূচি চালু, ক্যান্সার শনাক্তকরণ ও চিকিৎসার জন্য হিপ্পোপ্যাথোলজিস্ট, ক্লিনিক্যাল অনকোলজিস্ট, গাইনি অনকোলজিস্ট, মেডিক্যাল অনকোলজিস্ট, নার্স, টেকনোলজিস্টসহ প্রয়োজনীয় জনবল গড়ে তুলতে হবে এবং ক্যান্সার ট্রান্স ফান্ড সৃষ্টি করতে হবে। ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন-এর মাধ্যমে ক্যান্সার দুর্ত শনাক্ত, চিকিৎসা এবং মৃত্যুহার কমানো সম্ভব হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

২৭. স্বাস্থ্য গবেষণায় সুশাসন: [মধ্য-মেয়াদী]

দেশের স্বাস্থ্য গবেষণার নেতৃত্ব মান উন্নয়ন ও প্রামিতকরণ, গবেষণা সংক্রান্ত নীতিমালা ও গাইড লাইন প্রণয়ন, গবেষণা অনুদান ব্যবস্থাপনা, যথাযথ আইনের অধীনে, BMRC-র অবকাঠামোগত ও আর্থিক-প্রশাসনিক সামর্থ্য বৃক্ষির সুপারিশ করা হলো। জাতীয় স্বাস্থ্য গবেষণায় বরাদ্দ বাজেট প্রাথমিকভাবে মোট স্বাস্থ্য বাজেটের অন্তর্ভুক্ত ১% পর্যন্ত উন্নীত করতে হবে। ধাপে ধাপে বৃক্ষি করে অন্তত ২% বা তার বেশি করা প্রয়োজন, যাতে প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নীতিনির্ধারণ, এবং প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়নকে শক্তিশালী করা যায়।

[মধ্য-মেয়াদী]

২৮. পরিবেশগত এবং পেশাগত স্বাস্থ্য নিশ্চিতে আইন : [মধ্য-মেয়াদী]

পরিবেশগত এবং পেশাগত স্বাস্থ্যকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে, এজন্য আইন তৈরি করতে হবে।

২৯. নারী স্বাস্থ্য ও সুস্থতা নিশ্চিতে আইন : [মধ্য-মেয়াদী]

মা, শিশু, কিশোরকালীন ও বিশেষ প্রয়োজনীয় জনগণের জন্য উপযুক্ত ও সম্মানজনক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে, এবং প্রয়োজনভিত্তিক সেবা-প্রদান ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। নারীর স্বাস্থ্য ও সুস্থতা নিশ্চিত করতে জাতীয় নারীস্বাস্থ্য ইনসিটিউট প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। জাপানে উন্নাবিত মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য (MCH) হ্যান্ডবুক মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য জোরদার, ধারাবাহিক পরিচর্যা নিশ্চিতকরণ, পরিবারকে ক্ষমতায়ন এবং স্বাস্থ্যশিক্ষার ব্যবধান দুরীকরণে বিশ্বব্যাপী একটি শক্তিশালী ও কার্যকর উদ্যোগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি সকল পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে এবং দুর্যোগ-নিরোধক, নারী, শিশু, কিশোর-কিশোরী ও বয়স্ক বাস্তব স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান নিশ্চিত করতে হবে।

৩০. নবজাতকের, শিশু, কিশোর-কিশোরীর স্বাস্থ্য বিকাশ এবং মঙ্গল আইন: [মধ্য-মেয়াদী]

একটি নিরবচ্ছিন্ন ডিজিটাল তথ্য সম্পর্কার ব্যবস্থার মাধ্যমে, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রগুলির সার্বজনীন নজরদারি এবং সময়োচিত ও যথাযথভাবে মাধ্যমিক ও তৃতীয় পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে রেফার করার মাধ্যমে নবজাতক, শিশু, কিশোর-কিশোরীর স্বাস্থ্য, বিকাশ এবং মঙ্গল সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করা।

৩১. রূপান্তর প্রক্রিয়া:

রূপান্তর প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে প্রায় ২ বছর লাগবে এবং একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে এটি বাস্তবায়ন প্রয়োজন। স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন এ পরিকল্পনায় কার্যকর সহযোগিতা দিতে পারে।

পরিচ্ছেদ ৫

স্বাস্থ্য জনবল ব্যবস্থাপনা

স্বাস্থ্য জনবল ব্যবস্থাপনা – সুপারিশসমূহ

প্রতিটি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নির্মাণে স্বাস্থ্য জনবল একটি অপরিহার্য শৈল। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বেশ কিছু সাফল্য অর্জন করেছে, কিন্তু একই সঙ্গে, এমনকি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলেও জনগণের সংখ্যা অনুপাতে স্বাস্থ্যকর্মীদের ঘনত্ব এ দেশে সবচেয়ে কম। বিভিন্ন অধিদপ্তর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশে সর্বমোট ১,৬৬,৮৩৪ জন স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োজিত রয়েছেন। এক্ষেত্রে অনুমোদিত পদ রয়েছে ২৪৪,৭১১ টি; অর্থাৎ অনুমোদিত পদের মধ্যে ৩২ শতাংশ (৭৭,৮৭৭) এখনো শূন্য হয়ে আছে।

- ৫.১ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অধিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রচুর সংখ্যক খালি পদে জনবল নিয়োগের জন্য আশু পদক্ষেপ গ্রহণের জোরালো সুপারিশ করা হচ্ছে।
- ৫.২ ‘নেতৃত্ব, সুশাসন ও কর্মসংস্কৃতি’ পরিচ্ছেদের প্রস্তাবিত ‘বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন’-এর স্বাস্থ্য প্রযুক্তি ও জনবল মূল্যায়ন ও নিরূপণ সংক্রান্ত শাখার মাধ্যমে সারাদেশের জন্য প্রয়োজনভিত্তিক ও সমন্বিত একটি দীর্ঘমেয়াদী ক্যাটেগরি বিভাজিত জনবল পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। হেলথ লেবার মার্কেট বিশ্লেষণ (লেবার মার্কেট অ্যানালিসিস বা এইচ এল এম এ)-এর মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় প্রয়োজনকে এতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
- ৫.৩ বিএইচএস নির্দিষ্ট সময়সূচিক রিক্রুটমেন্ট পরিকল্পনা করবে।
- ৫.৪ বিএইচসি-র জনবল পরিকল্পনা ও বি এইচ এস -এর রিক্রুটমেন্ট প্রস্তাব, উভয় ক্ষেত্রে সংস্থা দুটি দেশের ডেমোগ্রাফিক, টোপোলজিক্যাল, রোগতত্ত্ব, সেবা ব্যবহারের মাত্রা, এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তন বিবেচনায় রাখবে এবং এগুলির ভিত্তিতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির (পেশা ও স্তর) সংখ্যা ও অনুপাত, দক্ষতার যথাযথ মিশ্রণ, এবং গুণগত মানের বিষয়গুলির প্রতি মনোযোগ প্রদান করবে।
- ৫.৫ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অধিদপ্তর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অনেক জনবলের দায়িত্বে অধিক্রমন (overlapping), হৈততা ও অস্পষ্টতা পরিহার করে প্রত্যেককে প্রস্তাবিত তিনটি অধিদপ্তর (অনুচ্ছেদ ২.৬)- এর একটিতে নির্দিষ্ট দায়িত্ব সহ পদায়ন করার সুপারিশ করা হচ্ছে।
- ৫.৬ ৫.৫-এ উল্লেখিত অধিদপ্তরগুলি হচ্ছে ‘জনস্বাস্থ্য’ অধিদপ্তর, খ. ‘ক্লিনিক্যাল সেবা’ অধিদপ্তর, ও গ. ‘মেডিকেল ও সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষা অধিদপ্তর’। স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরসহ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে অন্যান্য অধিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠানে যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রমোশন ও প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত রয়েছেন তাদের চাকরি প্রস্তাবিত জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরে ন্যস্ত করার প্রস্তাব করা হলো। যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদায়নে কোন অস্পষ্টতা দেখা দিতে পারে তার সমাধানে পরামর্শদানে একটি টাসকফোস গঠন করতে হবে।
- ৫.৭ স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবেলা করার জন্য বিভিন্ন অধিদপ্তরের অধীনে প্রয়োজনীয় নতুন ক্যাটেগরির জনবল সৃষ্টির তালিকা তৈরি করা প্রয়োজন এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাদের নিয়োগ প্রদান করা অত্যন্ত প্রয়োজন।
- ৫.৮ বর্তমান সুপারিশমালার ‘স্বাস্থ্যসেবা দান’ অধ্যায়ে বর্ণিত সুপারিশের সঙ্গে সংগতি রেখে বর্তমানের সকল অধিদপ্তর, প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পে স্বাস্থ্য প্রমোশন, ব্যাধি প্রতিরোধ ও প্রাথমিক ক্লিনিক্যাল সেবা প্রদানকারী স্বাস্থ্যকর্মীদের ‘বাংলাদেশ হেলথ সার্টিসেস’-এর অংশ হিসেবে নবপ্রতিষ্ঠিত জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সঙ্গে সংযুক্ত করার সুপারিশ করা হলো। এক্ষেত্রে বর্তমান চুক্তির অধীনে চাকরির অন্তর্ভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী নতুন ব্যবস্থায় যেতে সম্মত না হলে তাকে পূর্বতন ব্যবস্থার অধীনে থাকার অপশন দেয়া যেতে পারে; তবে এক্ষেত্রে তার দায়িত্ব-কর্তব্যের যুক্তিসম্মত বিন্যাস হতে হবে।
- ৫.৯ স্বাস্থ্যসেবাদানে উপরোক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত টিমের নেতৃত্বে থাকবেন একজন ‘প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ান’ বা পিসিপি। শুরুতে পর্যাপ্ত জনবলের অভাবে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও পর্যাপ্ত অভিজ্ঞ একজন স্বীকৃত মেডিকেল অফিসার নিয়োগ দেয়া হবে; তবে যত দূর সম্ভব দুই বছর মেয়াদী ফ্যামিলি হেলথ বিষয়ে একাডেমিক ডিগ্রিপ্রাপ্ত একজন চিকিৎসককে এই দায়িত্ব প্রদান করা হবে। এই ব্যবস্থায় ইউনিয়ন ও নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে শুরু করে সকল প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেতৃত্ব দানকারী পিসিপি ছাড়াও প্রয়োজনীয় সংখ্যক পিসিপি নিয়োগ দিতে হবে।

- ৫.১০ প্রাতিক পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা অধিদপ্তর, পরিবার কল্যাণ অধিদপ্তর ও বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে কর্মরত এইচ এ, পি এইচ এ, সি এইচ সি পি এবং সমমানের যোগ্যতা ও দক্ষতাসহ কর্মীবৃন্দকে কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার (CHW) নামক একটি ক্যাটেগরিতে নিয়ে আনা ও বি এইচ এস -এর অধীনে তাদের নিয়োজিত করার সুপারিশ করা হলো।
- ৫.১১ ৫.১০ অনুচ্ছেদে একীভূত CHW-দেরকে ক্যাটাগরি-ভিত্তিক প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা নিজেদের পূর্বতন যোগ্যতা ও দক্ষতার সংগে সংগে স্বাস্থ্যসেবা দান অধ্যায়ে অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার মৌলিক বিষয়গুলিতে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ হতে পারে।
- ৫.১২ উপজেলা হাসপাতালসহ দেশের সকল হাসপাতালের বর্তমান অবকাঠামোর একটি নির্দিষ্ট অংশ (যেমনঃ বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা সেবার জন্য ব্যবহৃত অংশ) পি এইচ সি সংক্রান্ত সেবাদানের জন্য নির্দিষ্ট করার সুপারিশ করা হলো।
- ৫.১৩ স্বাস্থ্যসেবাদান অধ্যায়ের সুপারিশ অনুযায়ী দেশের সকল উপজেলা হাসপাতালে মৌলিক বিশেষজ্ঞ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইন্টারনাল মেডিসিন, জেনারেল সার্জারি, গাইনেকোলজি-অবস্টেট্রিকস, পেডিয়াট্রিকস ও এনেসথেসিওলজি-তে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের জনবল নিয়োগকে অগ্রাধিকার দেয়ার পরামর্শ দেয়া হলো।
- ৫.১৪ উপজেলা হাসপাতাল থেকে শুরু করে উচ্চতর প্রতিটি পর্যায়ের হাসপাতালে, যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকের নেতৃত্বে, প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল ও সহায়ক জনবল সমন্বয়ে একটি মেডিকোলিগ্যাল টিম-এর উপস্থিতি নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যকীয় হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।
- ৫.১৫ বর্তমান সুপারিশমালা অনুযায়ী, সংস্কারকৃত ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্ক স্বাস্থ্যব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে, বর্তমানকালে অতি প্রয়োজনীয় হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত কিছু নতুন ডিসিপ্লিন -এর জনবলকে স্বাস্থ্যকর্মী পুলের অংশ করে তুলতে হবে।
- ৫.১৬ স্বাস্থ্যকর্মীদের উদ্যম ও কর্মসূহা বৃদ্ধির জন্য বিবিধ গবেষণালক্ষ নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলির বাস্তবায়নে মনোযোগ দেয়ার সুপারিশ করা হলো: ক. কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের সাপেক্ষে উচ্চতর ডিগ্রিবিহীন মেডিকেল অফিসারদের জন্য সিনিয়র, প্রিসিপাল ও চীফ অফিসার – এর পদে প্রোমোশন-সুযোগ সৃষ্টি করা; খ. অন্যান্য ক্যাটেগরির স্বাস্থ্যকর্মী (যেমন গ্রাজুয়েট ও ডিপ্লোমা নার্স, গ্রাজুয়েট টেকনোলজিস্ট এবং ডিপ্লোমা টেকনিশিয়ান)-দের পদ যৌক্তিকীকরণ ও তাদের জন্য যথাযথ প্রমোশনাল সিডির সৃষ্টি; গ. নবগঠিত বি এইচ এস -এর অধীনে সকল স্বাস্থ্যকর্মীর আর্থিক প্রগোদনার যৌক্তিক বৃদ্ধি এবং বাড়ি ভাড়া কর্তনের পরিমাণ পুনর্বিবেচনা সহ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য ক্যাম্পাসের ভিতরে নিরাপদ ও মানসম্পন্ন বাসস্থানের ব্যবস্থা করা; ঘ. পশ্চাদপদ ও দুর্গম এলাকায় সেবাদানকারীদের জন্য আকর্ষণীয় আর্থিক প্যাকেজের প্রগোদন এবং একটি স্বচ্ছ ও অবশ্য পলনীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ করে দেয়া এবং বিভিন্ন পর্যায়ে যথাযথ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ও প্রচারের মাধ্যমে উত্তম হিসেবে নির্বাচিত স্বাস্থ্যকর্মীদের যথাযথ সামাজিক স্বীকৃতি প্রদান।
- ৫.১৭ প্রতিটি অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প যেন অধীনস্থ স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে গুপ্ত বা সাব-গুপ্ত ভিত্তিতে যথাযথ ও আধুনিক কারিগুলাম-এর সাহায্যে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং সেবাদান প্রক্রিয়ায় উক্ত প্রশিক্ষণের প্রভাব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করতে হবে।
- ৫.১৮ প্রতিটি স্বাস্থ্যকর্মীর ক্ষেত্রে বর্তমানে পরিচালিত বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর-ভিত্তিক যা শুধুমাত্র উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মতামত নির্ভর) কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ডিজাইনকৃত ৩৬০ ডিগ্রী পদ্ধতি (যেখানে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও সেবাগ্রহণকারীসহ সংশ্লিষ্ট সহকর্মী, নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণকারী ইত্যাদি অংশীজনের মতামতের প্রতিফলন থাকবে) চালু করার সুপারিশ প্রদান করা হলো।
- ৫.১৯ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ‘স্বাস্থ্যসেবা গ্রহিতা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সুরক্ষা আইনের’ আওতায়, ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রে, নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি-বেসরকারি যে কোনো সেক্টরে নিয়োগকর্তা কিংবা অন্য যে কোন গুপ্ত বা ব্যক্তি কর্তৃক অবকাঠামো, পরিবেশজনিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং দৈহিক-মানসিক নিগীড়ন বা অপব্যবহারের প্রতিবিধান এই আইনের অংশ হতে হবে।
- ৫.২০ পাবলিক সেক্টরে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আউটসোর্সিং পদ্ধতির জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া, যথাসম্ভব দ্রুত বৰ্ক করে নিয়মিত নিয়োগের প্রক্রিয়া চালু করতে হবে।

- ৫.২১ নেতৃত্ব, সুশাসন ও কর্মসংস্কৃতি অধ্যায়ে উল্লেখিত সকল ক্যাটেগরির স্বাস্থ্যকর্মীকে যথাযোগ্য যথাযোগ্য কাউন্সিল বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিবন্ধিত হতে হবে ও ক্ষেত্রবিশেষে নিবন্ধন নবায়ন করতে হবে।
- ৫.২২ সকল ক্যাটেগরীর স্বাস্থ্যকর্মীকে (নেতৃত্ব ও সুশাসন অধ্যায়ের অনুচ্ছেদে) উল্লেখিত নিবন্ধন প্রক্রিয়া একটি সমন্বিত এইচ আর আই এস-এর সঙ্গে যুক্ত থাকবে এবং প্রতিটি স্বাস্থ্যকর্মীর জন্য যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সহ নিজের অ্যাকাউন্ট আপডেট করার সুযোগ থাকবে।
- ৫.২৩ কিছু কিছু জটিল মাল্টিডিসিপ্লিনারি প্রযুক্তি নির্ভর বিষয় (যেমন Biomedical Equipment Maintenance, ICT)-এর ক্ষেত্রে, জনবলের একান্ত অপ্রতুলতার কারণে, ২.২৩ অনুচ্ছেদের উল্লেখিত বিষয়টি শিখিল করে, যথাযথ নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমে, বর্ধিত ওয়ারেন্টি, সমন্বিত সংরক্ষণ চুক্তি ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

পরিচ্ছেদ ৬

স্বাস্থ্য জনবলের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

স্বাস্থ্য জনবল-এর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ – সুপারিশসমূহ

বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতে দক্ষ ও পর্যাপ্ত জনবল নেই, যার ফলে সেবার মান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শিক্ষার অভাব, প্রশিক্ষক সংকট, এবং অবকাঠামোগত দুর্বলতা এসব সমস্যার মূল কারণ। বর্তমানে চিকিৎসক ও নার্স-মিডওয়াইফ অনুপাত ১:১.৫ হলেও বাস্তবে তা ১:০.৭, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ডের তুলনায় অনেক কম। এছাড়া, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের ঘাটতি এবং প্রাইভেট খাতের দ্বৃত সম্প্রসারণও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ২০৩০ সালের মধ্যে জনবল চাহিদা পূরণের জন্য স্বাস্থ্যকর্মী সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃক্ষি করা প্রয়োজন।

- ৬.১ বর্তমান সুপারিশমালার ‘নেতৃত্ব, সুশাসন ও কর্মসংস্কৃতি’ অধ্যায়ের উল্লেখিত সুপারিশ অনুযায়ী সৃষ্টি ‘বাংলাদেশ হেলথ সার্টিস’-এর আওতায় ‘মেডিকেল শিক্ষা অধিদপ্তরের’ অধীনে পূর্ণকালীন নিরবেদিত শিক্ষকদের জন্য একটি বিশেষ ক্যাটেগরির পেশাগত স্নিম চালু করার সুপারিশ করা হলো। এর অন্তর্ভুক্ত শিক্ষক এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য গবেষণা ও স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে আবশ্যিকভাবে একটি নন-প্র্যাকটিসিং ব্যবস্থার অধীনে দায়িত্ব পালনে সম্মত হতে হবে এবং এর প্রতিদানে আর্থিক ও অন্যান্য বিশেষ প্রগোদনা (যেমন প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ইনস্টিউশনে প্র্যাকটিস)-এর ব্যবস্থা থাকবে।
- ৬.২ গ্র্যাজুয়েট ও তদুর্ধ স্বাস্থ্য জনবল সৃষ্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভবিষ্যতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৩.১ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত পদ্ধতি বাধ্যতামূলক হবে, তবে বর্তমানে কর্মরত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বিষয়টি অগ্রণী থাকবে; ফলে পূর্ণকালীন পদ্ধতিতে যোগ দিতে অনিচ্ছুক শিক্ষকগণ প্রাইভেট প্র্যাকটিসের সুযোগসহ বর্তমান চুক্তির অধীনে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।
- ৬.৩ আদর্শগতভাবে, গ্র্যাজুয়েট ও তদুর্ধ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনাকারী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে, একটি সমর্পিত জাতীয় নীতিমালার ভিত্তিতে, স্থানীয় পর্যায়ে গভর্নি বডির অধীনে, যথাসম্ভব অধিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের প্রস্তাব করা হচ্ছে যার মধ্যে অবদলিযোগ্য জনবল নিয়োগ-এর ক্ষমতাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তবে বাস্তবায়নের সুবিধা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে, সুনির্বাচিত জাতীয় পর্যায়ের কিছু ইনস্টিউটে, প্রাথমিকভাবে, এই পদ্ধতি চালুর সুপারিশ করা হলো।
- ৬.৪ দেশের বিভিন্ন স্থানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ্য শিক্ষক-প্রশিক্ষক আকর্ষণের লক্ষ্যে, একটি সুপরিকল্পিত গাইডলাইনের ভিত্তিতে, স্বতন্ত্র আর্থিক প্রগোদনার ব্যবস্থা করতে হবে।
- ৬.৫ মেডিকেল শিক্ষায় প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে প্রতিটি বিভাগে মেডিকেল শিক্ষা অধিদপ্তর-এর কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করার সুপারিশ করা হচ্ছে।
- ৬.৬ সকল পোস্টগ্র্যাজুয়েট মেডিকেল ডিগ্রির পরিচালনা ঢাকায় কেন্দ্রীভূত না রেখে, গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল শিক্ষার অনুসরণে, পোস্টগ্র্যাজুয়েট মেডিকেল ডিগ্রীসমূহ দেশের অন্যান্য মেডিকেল ইউনিভার্সিটির অধীনেও পরিচালনা করার সুপারিশ করা হচ্ছে।
- ৬.৭ আর্থিক-প্রশাসনিক ও সম্ভাব্য অন্যান্য সকল প্রগোদনার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট সব ধরনের গবেষণা-উন্নয়ন-উন্নাবনকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা এবং স্বাস্থ্য বাজেটে এই উদ্দেশ্যে যথাযথ বরাদ্দ রাখার সুপারিশ করা হলো।
- ৬.৮ দেশের স্বাস্থ্য গবেষণার নেতৃত্ব মান উন্নয়ন ও প্রমিতকরণ, গবেষণা সংক্রান্ত নীতিমালা ও গাইড লাইন প্রণয়ন, গবেষণা অনুদান ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কর্মকাণ্ড ছাড়াও এই ক্ষেত্রে ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গবেষণায় প্রত্যক্ষ অবদান রাখার জন্য, যথাযথ আইনের অধীনে, বিএমআরসি-র অবকাঠামোগত ও আর্থিক-প্রশাসনিক সামর্থ্য বৃক্ষির সুপারিশ করা হলো। এই প্রস্তাবনার সূত্র ধরে, বিএমআরসি-র অধীনে বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন সেলুলার-মলিকিউলার ল্যাবরেটরি দ্বৃত চালু করার পরামর্শ দেয়া হলো।
- ৬.৯ বর্তমান সুপারিশমালার ‘নেতৃত্ব, সুশাসন ও কর্মসংস্কৃতি’ অধ্যায়ে উল্লেখিত আইনগত ও অন্যান্য সংস্কারের মাধ্যমে মেডিকেল শিক্ষা ও গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা (যেমন, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, বিএমডিসি, বিসিপিএস, বিএমআরসি, সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর ইত্যাদির বিধি-বিধান ও নীতিমালা পুনর্মূল্যায়ন ও আধুনিকায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

- ৬.১০ মেডিকেল শিক্ষা-প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নতুন কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে, যথাযোগ্য বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রয়োজন মির্ধারণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে, উচ্চ পর্যায়ের সুচিত্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হবে।
- ৬.১১ বর্তমান পর্যায়ে নারীস্বাস্থ্য বিষয়ক সার্বিক পরিকল্পনা, বিশেষ রোগ-ব্যাধি বিষয়ক গবেষণা এবং প্রতিরোধ ও চিকিৎসা গাইডলাইন সৃষ্টি ইত্যাদি কার্যক্রমের আশু প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে কমিশন নারীস্বাস্থ্য বিষয়ক একটি জাতীয় ইনসিটিউট স্থাপনের সুপারিশ প্রদান করছে।
- ৬.১২ সরকারি-বেসরকারি উভয় সেক্টরে স্বাস্থ্যকর্মীদের উচ্চতর শিক্ষা-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে জনবল নিয়োগ, পদায়ন, প্রমোশন, বদলি, ডেপুটেশন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে পরিচালনাগত জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন এবং এ উদ্দেশ্যে BHC-র নির্দিষ্ট শাখায় মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করার প্রস্তাব করা হচ্ছে।
- ৬.১৩ স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য পরিচালিত শিক্ষা-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে বর্তমান শূন্য পদগুলি অতিসত্ত্ব পূরণের জন্য জোরালো সুপারিশ করা হচ্ছে।
- ৬.১৪ প্রতিটি স্বাস্থ্যকর্মী শিক্ষা-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে যথাসম্ভব দুট, প্রমিত, নিয়মমাফিক, শিক্ষক-প্রশিক্ষক-ছাত্র অনুপাত অর্জনে একটি বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণের প্রস্তাব করা হচ্ছে।
- ৬.১৫ শিক্ষার্থীরা যেন তাত্ত্বিক ধারণাগুলোকে বাস্তব ক্লিনিক্যাল প্রয়োগের সাথে সংযুক্ত করতে পারে, সেজন্য প্রচলিত বিচ্ছিন্ন/খণ্ডিত কারিকুলামের পরিবর্তে সমন্বিত ও মডিউলভিত্তিক (integrated & modular) কারিকুলাম চালুর প্রস্তাব করা হচ্ছে।
- ৬.১৬ গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল শিক্ষায় নিয়োজিত পরিবর্তনগুলিকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হিসেবে সুপারিশ করা হচ্ছে:
- ক. তথ্য-প্রমান-ভিত্তিক (evidence-based) সমন্বিত ও গবেষণামূল্যী লার্নিং মডিউলের মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন;
 - খ. যত দুট সম্ভব (আদর্শগতভাবে প্রথম বর্ষ থেকেই) ক্লিনিক্যাল সমস্যাসমূহের সঙ্গে পরিচিতির উদ্যোগ; ও
 - গ. সমস্যা সমাধান এবং রোগীর সঙ্গে মিথস্কিয়ার দক্ষতা সৃষ্টি এবং ক্লিনিক্যাল দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মডিউলার প্রশিক্ষণ।
- ৬.১৭ সমস্যাভিত্তিক লার্নিং (Problem-based Learning বা PBL), ক্ষুদ্র গুপ লার্নিং (Small Group Learning বা SGL) এবং ট্রিট ক্লাস রুম (Treat Class Room) মডেলে গুরুত্ব দিয়ে বর্তমান গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল শিক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের সুপারিশ করা হচ্ছে।
- ৬.১৮ ওয়ার্ড-কেন্দ্রিকতার পরিবর্তে, মুখ্যত আউটডোরকেন্দ্রিক গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল শিক্ষা চালু দ্বারা, প্রকৃত বাস্তবতা-ভিত্তিক রোগী ও সমাজকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা অর্জনে ছাত্র-ছাত্রীকে সক্ষম করে তোলার জন্য শিক্ষা-প্রশিক্ষণ পদ্ধতি পরিবর্তনের সুপারিশ করা হলো।
- ৬.১৯ চিকিৎসকদের মধ্যে মানবিক ও হলিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির লক্ষ্যে মেডিকেল শিক্ষার কারিকুলামে নেতৃত্বাত্মক, পেশাদারিত্ব ও পারস্পরিক যোগাযোগ ক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হচ্ছে।
- ৬.২০ শুধুমাত্র মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে ক্লিনিকাল যুক্তি, তথ্যভিত্তিক চিন্তা ও হাতেকলমে দক্ষতা যাচাইয়ে গুরুত্ব দিতে হবে; এজন্য মূল্যায়ন পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস এবং ন্যায়সংগত ও পক্ষপাতাইন মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে প্রচলিত সাবজেক্টিভ পদ্ধতির বিপরীতে অবজেক্টিভ মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালুর প্রস্তাব করা হচ্ছে।
- ৬.২১ বর্তমান যুগের বৈশ্বিক অগ্রযাত্রার সঙ্গে সংগতি রেখে, সংশ্লিষ্ট নতুন নতুন শাখায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিদ্যার পাঠ ও প্রশিক্ষণ বিস্তৃত করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনীয় অর্থাত অবহেলিত যেমনঃ বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল ফিজিঝুর্স, হেলথ ইনফরমেটিক্স এবং বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স বিষয়গুলিতে বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়ার সুপারিশ করা হচ্ছে।
- ৬.২২ যেসব বিষয়ে দক্ষ বিশেষজ্ঞের অভাবে রোগীরা বিদেশে চলে যাচ্ছেন (এবং এর ফলে প্রচুর বিদেশী মুদ্রা নষ্ট ও দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে) সেইসব গুলির মধ্যে কিছু চিহ্নিত বিষয়ে (যেমনঃ অনকোলজির বিবিধ শাখা-উপশাখা ও ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারি) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করতে হবে।

- ৬.২৩ বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত অবহেলিত অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দক্ষ চিকিৎসক, টেকনোলজিস্ট ও সহায়ক জনবল সৃষ্টির জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- ৬.২৪ ইন্টার্নী চিকিৎসক ও পোস্টগ্র্যাজুয়েট ট্রেইনীদের আর্থিক প্রগোদনা যৌক্তিক পরিমাণে বৃদ্ধি করতে হবে।
- ৬.২৫ রোগতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে নির্বাচিত কিছু বিশেষ বিশেষ অসুখ কিন্তু অবস্থা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জনবলের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়া হলো।
- ৬.২৬ বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলিতে টিউশন ফি-কে যৌক্তিক মাত্রায় রাখার বিষয়ে আরো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

পরিচ্ছেদ ৭

অত্যাবশ্যকীয়/ অপরিহার্য ঔষধপত্র, চিকিৎসা প্রযুক্তি ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ

আবশ্যিক ঔষধপত্র, প্রযুক্তি ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদির প্রাপ্যতা ও লভ্যতা – সুপারিশসমূহ

- ১) বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে, ডিজিডি-কে এখন থেকে চিকিৎসা যন্ত্রপাতির নিবন্ধন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করতে হবে এবং শুধুমাত্র বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন (BHC) কর্তৃক মূল্য নির্ধারণের পরেই নিবন্ধন প্রদান করবে।
- ২) (১) ঔষধ ও চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিগোর খরচ ও বাজারমূল্য পর্যালোচনার মাধ্যমে মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) একইসাথে, সাশ্রয়ী মূল্যে এইসব পণ্য নিশ্চিত করতে কর হাস অথবা উৎপাদকদের জন্য নগদ প্রগোদনা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- ৩) ক্যান্সার, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, নির্দিষ্ট কিছু আ্যান্টিবায়োটিক এবং ব্যবহৃত ঘরোয়া যন্ত্রপাতি ও একবার ব্যাবহার উপযোগী/ডিসপোজেবল পণ্যের মতো মৌলিক চিকিৎসা সামগ্ৰীৰ উপর আরোপিত ভ্যাট/কৰ উল্লেখযোগ্যভাৱে হাস কৰে সাধাৰণ মানুষেৰ মধ্যে নিয়ে আসা প্ৰয়োজন। এইসব পণ্যে ৱোগীৱা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগত ব্যয় কৰেন, যা হাস কৰতে হবে।
- ৪) (১) ভিটামিন, খনিজ, প্ৰোৰায়োটিক, বুকেৰ দুধেৰ বিকল্প এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যিক নয় এমন পণ্যেৰ উপৰ কৰ/ভ্যাট বৃদ্ধি কৰে প্ৰয়োজনীয় ঔষধে কৰ হাসেৰ ফলে যে আৰ্থিক ক্ষতি হবে তা ভাৰসাম্যপূৰ্ণভাৱে পূৰণ কৰা যেতে পাৰে, (২) ঔষধেৰ দাম কমানোৰ অংশ হিসেবে প্যাকেজিং প্ৰক্ৰিয়া সৱলীকৰণ এবং ফাৰ্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিৰ বিপণন ব্যয় কৰাতে হবে।
- ৫) (১) চিকিৎসকদেৱ সঙ্গে ঔষধ কোম্পানিৰ সম্পর্কেৰ ক্ষেত্ৰে (যেমন: কোম্পানিৰ প্ৰতিনিধিদেৱ (রিপ্ৰেজেন্টেটিভ) মাধ্যমে তথ্য প্ৰদান, উপহাৰ, স্পন্সৰশিপ, সেমিনাৰ ইত্যাদি) নৈতিকতা নিশ্চিত কৰতে কঠোৱ নিয়ন্ত্ৰণব্যবস্থা প্ৰবৰ্তন কৰা জৱুৱি, (২) একটি এমন কাঠামো গড়ে তুলতে হবে, যেখানে ৱোগীৱা সৰ্বোত্তম স্বার্থে চিকিৎসকদেৱ স্বাধীনতা, স্বচ্ছতা ও পোশাগত সততা বজায় রাখা আইনগতভাৱে বাধ্যতামূলক হবে।
- ৬) ডায়াবেটিস মাপক, রক্তচাপ মাপক, থাৰ্মোমিটাৰ, স্টেথোস্কোপসহ ঘৰোয়া ব্যবহাৰেৰ প্ৰয়োজনীয় পুনঃব্যবহাৰযোগ্য যন্ত্রপাতিৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৌশল বাস্তবায়নে বেসৱকাৰি খাতকে সম্পৃক্ত কৰে একটি যৌথ উদ্যোগ গড়ে তুলতে হবে। এতে কৰে সবাৰ জন্য প্ৰয়োজনীয় যন্ত্রপাতিৰ প্রাপ্যতা ও নাগালযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।
- ৭) বাংলাদেশ সৱকাৱেৰ অধীনে একটি উচ্চপৰ্যায়েৰ বিশেষজ্ঞ টাঙ্কফোৰ্স গঠন কৰতে হবে, যা দেশেৰ ফাৰ্মাসিউটিক্যাল খাতেৰ একটি প্ৰমাণভিত্তিক মূল্যায়ন পৰিচালনা কৰবে। এই মূল্যায়নে অন্তৰ্ভুক্ত থাকবে: এপিআই (API) উৎপাদন ও আমদানি, উৎপাদন সক্ষমতা, গুণগত মান, নিয়ন্ত্ৰক তদারকি, সৱবৱাহ চেইনেৰ দক্ষতা এবং বিপণন কাৰ্যক্ৰম। এই টাঙ্কফোৰ্সেৰ মূল কাজ হবে:
 - (৭.১) খাতভিত্তিক মূল্যায়ন: বাংলাদেশেৰ ঔষধ উৎপাদন সক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্ৰক কাঠামোৰ মূল্যায়ন, ত্ৰুটি, অদক্ষতা, অপচয় ও চৌৰ্যবৃত্তিৰ উৎস চিহ্নিত কৰা;
 - (৭.২) ইডিসিএল ফৱেনসিক অভিত: ইডিসিএল (EDCL)-এৰ দুৰ্নীতি, ব্যবস্থাপনা অদক্ষতা ও অভিযোগগুলোৰ তদন্ত কৰে সুশাসন সংস্কাৱ, কাঠামোগত পুনৰ্গঠন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিৰ জন্য সুপারিশ প্ৰদান।
- ৮) বেসৱকাৰি ঔষধ শিল্পে কথিত অনৈতিক অনুশীলন—যেমন: ট্ৰান্সফাৰ-প্রাইসিং কৌশল, আগ্ৰাসী বিপণন কৌশল এবং অতিৰিক্ত প্ৰেসক্ৰিপশনেৰ জন্য প্ৰোচনা—যেগুলি ঔষধেৰ ব্যয় বৃদ্ধি কৰে, তা রোধে একটি শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰা প্ৰয়োজন, যা জনসাধাৰণেৰ জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এই প্ৰতিবেদনে শোষণমূলক অনুশীলন রোধ, মূল্য নিৰ্ধাৰণে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং ৱোগীৱা কল্যাণ সুৱক্ষায় অগ্ৰাধিকাৰ এবং প্ৰমাণভিত্তিক নীতিগত ও নিয়ন্ত্ৰণমুখী সংস্কাৱেৰ সুপারিশ থাকবে।
- ৯) (১) বাংলাদেশেৰ অত্যাবশকীয় ঔষধেৰ তালিকা—যা সৰ্বশেষ ২০১৬ সালে হালনাগাদ হয়েছিল, সেটা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ ২৩তম সংস্কৰণ (২০২৩) অনুযায়ী হালনাগাদ কৰা প্ৰয়োজন, এবং সেটিকে দেশেৰ বৰ্তমান ৱোগসংক্ৰান্ত চালচিত্ৰ (প্ৰোফাইল) ও জনস্বাস্থ্যেৰ অগ্ৰাধিকাৱেৰ সঙ্গে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ কৰতে হবে, (২) এই সংশোধন প্ৰক্ৰিয়া বাংলাদেশ হেলথ কমিশনেৰ অধীনে গঠিত বহমুখী বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বাৰা পৰিচালিত হবে, যেখানে ক্লিনিক্যাল, ফাৰ্মাকোলজিক্যাল এবং জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰা অংশগ্ৰহণ কৰবেন, (৩) অংশীজনদেৱ সঙ্গে নিয়ে একটি স্বচ্ছ পৰামৰ্শ প্ৰক্ৰিয়া নিশ্চিত কৰতে হবে, যাতে তালিকাভুক্ত ঔষধগুলো যথাযথ, সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী হয়।

- ১০) নতুন বা উদীয়মান স্বাস্থ্য সংকট (যেমন: মহামারী, সংক্রামক রোগ, অথবা নতুনভাবে শনাক্তকৃত জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা) মোকাবিলায় দুটি প্রতিক্রিয়া প্রদানের একটি কার্যকর প্রক্রিয়া তৈরি করতে হবে, যাতে প্রয়োজনীয় ওষুধ ও যন্ত্রপাতি দুটি তালিকাভুক্ত করা সম্ভব হয়।
- ১১) ইডিসিএল (Essential Drugs Company Limited)-কে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, দক্ষ এবং আরো বৃহৎ আকারে একটি জাতীয় ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য একটি ধারাবাহিক, টেকসই, নীতিনির্ভর কৌশল বাস্তবায়ন করতে হবে এবং ইডিসিএল যাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পর্যায়ের সকল ঔষধ উৎপাদন করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবেঃ
- (১১. ১) **স্বল্পমেয়াদী (১—২ বছর):** নির্বাচিত কিছু অত্যাবশকীয় ঔষধ সম্পূর্ণরূপে দেশীয়ভাবে উৎপাদন নিশ্চিত করতে উৎপাদন কেন্দ্র আধুনিকায়ন, গুণগত মানের উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা অর্জনে মূলধন বিনিয়োগ করতে হবে।
- (১১. ২) **মধ্যমেয়াদী (৩—৫ বছর):** ইডিসিএলের উৎপাদন সক্ষমতা সম্প্রসারণ করে, হালনাগাদকৃত অত্যাবশকীয় ঔষধের তালিকাভুক্ত বেশিরভাগ ওষুধ—বিশেষত বায়োলজিক ও বায়োসিমিলার, উৎপাদনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং দক্ষ মানসম্পদ, সরবরাহ চেইনের উন্নয়ন এবং দেশীয় কাঁচামাল সংগ্রহে প্রগতিশীল প্রদানকে গুরুত্ব দিতে হবে।
- (১১. ৩) **দীর্ঘমেয়াদী (১০ বছরের মধ্যে):** সম্পূর্ণ অত্যাবশকীয় ঔষধ তালিকার ঔষধসমূহ বৃহৎ পরিসরে দেশীয়ভাবে উৎপাদন করে স্থানীয় উৎপাদক ও আমদানির উপর নির্ভরতা নির্মূল করতে হবে। এজন্য গবেষণা ও উন্নয়নে টেকসই বিনিয়োগ অপরিহার্য।
- (১২) (১) স্থানীয় ঔষধ প্রস্তুতকারকদের সাথে কৌশলগত সম্পর্ক গড়ে তুলে প্রয়োজনীয় ঔষধের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য একটি শক্তিশালী নীতিগত কাঠামো গঠন করতে হবে, (২) ইডিসিএল-এর উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে সরকারকে ব্যবস্থিতিক মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে এবং স্থানীয় প্রস্তুতকারকদের সাথে দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত ক্রয়চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে, যাতে পূর্বনুমেয় চাহিদা অনুযায়ী অন্তিবিলম্বে, ঔষধ উৎপাদনের দক্ষতা তৈরি হয় এবং ব্যাপক উৎপাদনের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হয়।
- (১৩) দেশীয় ঔষধ শিল্পে স্বনির্ভরতা অর্জনে একটি সমর্পিত ও সময়-সীমাবদ্ধ কাঠামোর অধীনে Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) এর স্থানীয় উৎপাদন দুটি সম্প্রসারণ জরুরি। এজন্য (১) API উৎপাদনে সরকারের সমর্থিত দীর্ঘমেয়াদী, স্বল্প সুদের অর্থায়ন চালু করা, (২) দেশীয় API ব্যবহারে ঔষধের ওপর ভ্যাট রিফাস্ট প্রণোদনা দেওয়া, (৩) উৎপাদন সক্ষমতা থাকা API-এর ক্ষেত্রে আমদানিতে শুল্ক আরোপ ও পূর্ণ চাহিদা পূরণে আমদানি নিষিদ্ধকরণ, এবং (৪) একচেটিয়াত্তা রোধে প্রতিটি কোম্পানির API পোর্টফোলিও ১০—১৫টির মধ্যে সীমিত রাখা প্রয়োজন। এসব পদক্ষেপ দেশে মানসম্পন্ন API উৎপাদনে বিনিয়োগ উৎসাহিত করবে, বাজারে প্রতিযোগিতা ও সরবরাহ বৈচিত্র্য বজায় রাখবে, এবং বৈশিক সংকটে ওষুধ সরবরাহ সুরক্ষিত করে সাশ্রয়ী চিকিৎসা নিশ্চিত করবে।
- ১৪) (১) ওষুধ নির্ধারণের দক্ষতা, ওষুধের ট্র্যাকিং ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় ই-প্রেসক্রিপশন পোর্টাল চালু করুন, (২) সারা দেশে একটি সরকারি ফার্মেসি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে, যাতে প্রত্যেক সরকারি হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র (জিপি ক্লিনিক) একটি সম্পূর্ণ মজুদকৃত এবং পেশাদারভাবে পরিচালিত ফার্মেসিরূপে সেবা দিতে পারে, (৩) লাইসেন্সধারী ফার্মাসিস্টদের দ্বারা পরিচালিত এই ফার্মেসিগুলো ঔষধ বিতরণ, ঔষধ সম্পর্কিত পরামর্শ এবং যুক্তিসংগত প্রেসক্রিপশন প্রয়োগ নিশ্চিত করবে।
- ১৫) সকল সরকারি হাসপাতালে ২৪ ঘণ্টা খোলা ইন-হাউস ফার্মেসি চালু করতে হবে, যাতে ভর্তি ও বহির্বিভাগের রোগীরা সার্বক্ষণিক প্রয়োজনীয় ওষুধ পেতে পারেন। এই নীতির আওতায়, সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান থেকে বিতরণকৃত সকল প্রয়োজনীয় ঔষধ রোগীকে স্বল্প বা বিনামূল্যে প্রদান করতে হবে, যা দরিদ্রদের সেবা গ্রহণে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূর করবে এবং দেশের স্বাস্থ্যসেবায় সমতা নিশ্চিত করবে। [মধ্য-দীর্ঘমেয়াদী]
- ১৬) বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পে নতুন ওষুধ, মলিকুল এবং বায়োসিমিলার উন্নাবনে গবেষণা ও উন্নয়নকে উৎসাহিত করতে একটি নীতিনির্ভর আর্থিক প্রগতিশীল কাঠামো গঠন জরুরি। এজন্য (১) গবেষণায় বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে কর্পোরেট কর্হাড় সুবিধা দিতে হবে—বিশেষত ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল, পেটেন্ট আবেদন ও বায়োসিমিলার উন্নয়ন কার্যক্রমে, (২) এই সুবিধার আওতায় আসতে হলে ডিজিডি-তে পর্যায়ক্রমিক উন্নয়নভিত্তিক স্বচ্ছ প্রতিবেদন বাধ্যতামূলক করতে হবে, যাতে অগ্রগতি নিরীক্ষণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। এর ফলে উন্নাবনী গবেষণায় আর্থিক প্রতিবন্ধকতা কমবে, দেশি-বিদেশি

বিনিয়োগ বৃক্ষি পাবে, এবং দেশীয়ভাবে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা উন্নত হবে—বাংলাদেশ পাবে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় একটি অগ্রণী অবস্থান। এটি Sustainable Development Goal (SDG) 3.b অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ও মুখ্য উন্নতাবনে গবেষণাকে প্রগোদন দেওয়ার প্রতিশুভ্রতির সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

- ১৭) আই ডি সেলাইন এর মতো পণ্যগুলোর উৎপাদন সক্ষমতা বৃক্ষি করতে হবে, যাতে ডেংগু, ডায়ারিয়া বা যেকোনো মহামারী ও দুর্বোগ পরিস্থিতিতে এসব ওষুধের ঘাটতি না হয়। [স্বল্প-মধ্যমেয়াদী]
- ১৮) (১) বিএমডিসিকে একটি নিয়ম প্রণয়ন করতে হবে, যাতে চিকিৎসকরা ব্র্যান্ড নাম লিখলেও অবশ্যই জেনেরিক নামও লিখবেন, (২) চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপশনে অন্তত ২০% ব্যবহৃত ওষুধ জেনেরিক নামে লিখতে বাধ্য করতে হবে, (৩) সকল প্রয়োজনীয় ওষুধের প্রেসক্রিপশনে জেনেরিক ও ব্র্যান্ড উভয় নামই অন্তর্ভুক্ত করা বাধ্যতামূলক হবে, যাতে স্বচ্ছতা বাড়ে, রোগীরা সহজে বুঝতে পারেন এবং সরকারি ও বেসরকারি ফার্মেসিতে সঠিক ওষুধ বিতরণ নিশ্চিত হয়।
- ১৯) (১) বিএমডিসি রেজিস্ট্রার্ড চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপশন ছাড়া কোনো ঔষধ বিতরণ করা যাবে না, শুধুমাত্র 'ওভার-দ্য-কাউন্টার' (OTC) ঔষধ ছাড়া, (২) যার তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করে প্রত্যেক ফার্মেসিতে প্রকাশ্যে প্রদর্শন করতে হবে। [স্বল্পমেয়াদী]
- ২০) (১) ইডিসিএল কর্তৃক বর্তমানে বিদ্যমান ঔষধের গুণাগুন পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগারগুলোর (ল্যাবগুলোর) সক্ষমতা বৃক্ষি করতে হবে এবং প্রতিটি বিভাগীয় শহরে নতুন ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে, (২) চলমান প্রাম্যমাগ 'মিনি ল্যাব' ভ্যান স্থাপন করতে হবে, যাতে দূরবর্তী এলাকাগুলোতে ঔষধের মান পরীক্ষা করা যায়। এই ল্যাবগুলোতে ঔষধের মান ও ভেজাল শনাক্তের ব্যবস্থা থাকতে হবে। [স্বল্প-মধ্যমেয়াদী]
- ২১) সাশ্রয়ী ঔষধের প্রাপ্ত্যা নিশ্চিত রাখতে, দেশীয় উৎপাদন সক্ষমতা জোরদার করার লক্ষ্য নিয়ে অস্থায়ী আন্তর্জাতিক সহযোগিতা চুক্তি করা এবং TRIPS সুবিধা অব্যাহত রাখার জন্য নতুন উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে আন্তর্জাতিকভাবে আলোচনা করতে হবে।
- ২২) সরকার ও ব্যক্তিগত অংশীদারিত্বের (পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ মডেলের) মাধ্যমে, গবেষণা, উন্নয়ন ও উন্নত করতে হবে, যাতে উচ্চমানের ও সাশ্রয়ী ঔষধ দেশেই উৎপাদন করা যায়। [মধ্য-দীর্ঘমেয়াদী]
- ২৩) সকল ঔষধ প্রস্তুতিতে Good Manufacturing Practices (GMP) পদ্ধতি অনুসরণ নিশ্চিত করতে একটি দক্ষ এবং শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কাঠামো গঠন করতে হবে। [স্বল্প-মধ্যমেয়াদী]
- ২৪) জাতীয় ই-প্রেসক্রিপশন পোর্টাল চালু করতে হবে, যা সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সঙ্গে সংযুক্ত ও সমর্পিত থাকবে এবং যা প্রেসক্রিপশনের কার্যকারিতা, ঔষধের অবস্থিতি ও স্থিতি অনুসরণ (ট্র্যাকিং) এবং জবাবদিহিতা বাড়াবে। [মধ্যম-দীর্ঘমেয়াদী]
- ২৫) ঔষধের পুন: বিতরণ এবং অপব্যবহার রোধে, জাতীয় পরিচয়পত্র, স্মার্ট কার্ড বা জন্ম নিবন্ধনের মাধ্যমে সংযুক্ত ডিজিটাল রোগী শনাক্তকরণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে, যার মাধ্যমে ঔষধের বিতরণ নিয়ন্ত্রিত ও অনুসরণযোগ্য (ট্র্যাকযোগ্য) হবে। [মধ্যম-দীর্ঘমেয়াদী]
- ২৬) দেশের ভিতরে নীতিগত সংস্কার এবং আন্তর্জাতিক উৎকৃষ্টতা অনুশীলনের সমন্বয়ের মাধ্যমে উৎপাদন ও সরবরাহ চেইনের স্থিতিশীলতা জোরদার করতে হবে, যাতে একটি সাশ্রয়ী, দক্ষ ও প্রযুক্তিনির্ভর ঔষধ সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়।
- ২৭) সাশ্রয়ী মূল্যের জেনেরিক ঔষধ: সরকারের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে জেনেরিক ওষুধ ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করতে হবে—প্রাথমিকভাবে সবচেয়ে ব্যবহৃত ওষুধের অন্তত ২০% ক্ষেত্রে। একই জেনেরিক ওষুধ উৎপাদনে একাধিক প্রস্তুতকারকের অংশগ্রহণের ফলে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হবে, যা মূল্য হাসে সহায়ক হবে।
- ২৮) (১) ঔষধের যুক্তিসংগত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে—এর জন্য রোগীদের শিক্ষার উদ্যোগ, কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা কার্যক্রম, চিকিৎসক ও প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণ, পলিফার্মেসি (একাধিক ওষুধের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ, অপ্রয়োজনীয় ডায়াগনস্টিক পরীক্ষা এবং অপ্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে, (২) ক্লিনিক্যাল অভিটের মাধ্যমে প্রেসক্রিপশনের কঠোর নজরদারি চালু করতে হবে।

- ২৯) ঔষধের বক্টন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে সমতা সংক্রান্ত ঘাটতি দূর করতে হবে। এর অংশ হিসেবে, আঞ্চলিক ইডিসিএল এবং ঔষধের গুদাম স্থাপন এবং অবহেলিত অঞ্চলে ঔষধের সরবরাহের জন্য উন্নাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- ৩০) (১) ঔষধ ও টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণের জন্য উপজেলা পর্যন্ত ফার্মাকোভিজিল্যান্স ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে, (২) পাশাপাশি, নকল ও নিম্নান্বেশ ঔষধ প্রতিরোধে রাকচেইন বা অন্যান্য ট্রেসেবিলিটি প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে হবে।
- ৩১) (১) নিয়ন্ত্রণমূলক তদারকি (Regulatory Oversight) জোরদার করতে হবে, যাতে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও সরবরাহ চ্যানেলগুলোর নিরাপত্তা মানদণ্ডে নিয়মিত মিল রয়েছে কি না তা নিশ্চিত করা যায়, (২) নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের অবকাঠামোতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে সময়মতো পরিদর্শন ও কার্যকর লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা যায়, (৩) ডিজিটিএ কর্তৃক ঔষধ, সরঞ্জামাদি, যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি ও কৃতিস্থত (পেটেন্ট) এর নিবন্ধন এক মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।
- ৩১) (১) ডিজিটাল প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা কার্যকর করার মাধ্যমে রিয়েল-টাইম ইনভেন্টরি ট্র্যাকিং জোরদার করতে হবে, (২) চাহিদাভিত্তিক প্রক্রিয়াকরণ কৌশল বাস্তবায়ন, কেনাকাটার অনিয়মের জন্য কঠোর শাস্তি নির্ধারণ এবং সব ধরনের প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে, (৩) সরবরাহ চেইন ও লজিস্টিক ব্যবস্থাগুলির উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় ইনভেন্টরি ব্যবস্থাগুলি পদ্ধতি চালু করতে হবে এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর চাহিদা পূর্বাভাস (AI-Driven Demand Forecasting) ব্যবস্থা চালু করতে হবে।
- ৩২) (১) ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের পাশাপাশি তথ্য নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে রোগী ও সরবরাহ চেইনের তথ্য সুরক্ষিত থাকে, (২) শক্তিশালী তথ্য সুরক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন ও নিরাপদ প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে, যাতে সব অংশীদারদের মধ্যে আস্থা তৈরি হয়।
- ৩৩) অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ, টিকা ও চিকিৎসা সামগ্রীর টেকসই প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে বহমুখী কৌশল গ্রহণ করতে হবে, যেমন:
- ৩৩.১) TRIPS সমাপ্তকালীন সময়সীমা নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ;
 - ৩৩.২) বাধ্যতামূলক লাইসেন্সিং পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ
 - ৩৩.৩) TRIPS সুবিধার আওতায় নিম্নলিখিত বাজার থেকে জেনেরিক ওষুধের সমান্তরাল আমদানি উৎসাহিত করা;
 - ৩৩.৪) দেশীয় ঔষধ গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) বিনিয়োগ বৃদ্ধি;
 - ৩৩.৫) ক্রয় ও বিতরণ কৌশলের উন্নয়ন (প্রয়োজনের নীরিখে বিতরণ);
 - ৩৩.৬) প্রয়োজনীয় অর্থায়ন এবং অর্থায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ;
 - ৩৩.৭) টিকা চুক্তির স্বচ্ছতা ও যথার্থতা নিশ্চিতকরণ;
 - ৩৩.৮) জাতীয় বাজেটভিত্তিক টিকা নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রণয়ন;
 - ৩৩.৯) জাতীয় ঔষধ ও টিকা নীতিমালা প্রণয়ন;
 - ৩৩.১০) স্বল্পের স্বল্পের উন্নয়ন বিবেচনায় দীর্ঘমেয়াদি কৌশল প্রণয়ন, যা দেশের ফার্মাসিউটিক্যাল খাতকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেবে;
 - ৩৩.১১) দেশের ভিতর মেশিন, যন্ত্রাদি, যন্ত্রের অংশ, কাঁচামাল, কেমিক্যাল, জারক, টিকা উন্নাবন ও তৈরী, দূর-চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা (টেলিমেডিসিন ও টেলিসার্জারি), তথ্য সংগ্রহ ও প্রেরণের সফটওয়্যার তৈরি ইত্যাদি, যা অতি উচ্চ মূল্যের সেবার মূল্য হাস করতে সাহায্য করবে ও ব্যবস্থাগুলির সমন্বয় করতে এসব প্রচেষ্টায় ও উন্নাবনীতে সরকারকে আর্থিক প্রগোদ্ধনা দিতে হবে।
- ৩৪) ডেন্টাল ইমপ্লান্ট, হাঁটুর জয়েন্ট ও হিপ জয়েন্ট প্রতিস্থাপন, কার্ডিয়াক ও অন্যান্য স্টেন্ট এবং কিডনি ডায়ালাইসিসের ব্যয় হাসে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন (BHC) নিম্নলিখিত বিষয়গুলো তদারকি করবে:

- ৩৪.১) DGDA কর্তৃক বাংলাদেশ ঔষধ ও প্রসাধনী আইন, ২০২৩ অনুসারে জারিকৃত নির্দেশিকাসমূহ বেসরকারি খাতে যথাযথভাবে অনুসরণ করছে কিনা; ৩৪.২) প্রযুক্তিনির্ভর চিকিৎসা যন্ত্রপাতি মূল্যসামগ্ৰী ও সবার নাগালের মধ্যে রাখা নিশ্চিতে সরকারি-বেসরকারি খাতের কার্যকর অংশীদারিত; ৩৪.৩) প্রতিটি প্রস্তুতকারী/নির্মাতা ও আমদানিকারকের DGDA থেকে দেশীয় নিবন্ধন গ্রহণ; (এই নিবন্ধনগুলো হতে হবে নিয়ন্ত্রন কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ, যা বাজারজাতকরণ ও বিক্রয়ের অনুমতি হিসেবে কাজ করবে); ৩৪.৪) বৈধ লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিনিধি তথা “বাংলাদেশ লাইসেন্স হোল্ডার”-এর মাধ্যমে অনুমোদন/ স্বীকৃতি প্রাপ্ত কি না; ৩৪.৫) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করতে হবে, যা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ড্রাগ কন্ট্রোল কমিটির প্রযুক্তিগত উপকরণটি হিসেবে কাজ করবে।

প্রযুক্তির মাধ্যমে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের উন্নতি

সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তির ব্যবহারে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে গুরুতর অগ্রগতি হয়েছে। বিশেষ করে, ইলেক্ট্রনিক লজিস্টিকস ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (eLMIS) এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট পোর্টাল (SCMP) বাস্তবায়নের মাধ্যমে মেডিকেল পণ্যের ক্রয়, বিতরণ ও ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বেড়েছে। এসব ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম স্টক মনিটরিং, ইনভেন্টরি ট্র্যাকিং এবং ডেটা-নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করছে, যা সার্বিক স্বাস্থ্য সেবায় গুণগত উন্নয়ন নিশ্চিত করছে।

রিয়েল-টাইম ইনভেন্টরি ট্র্যাকিং উন্নত করা

- **ডিজিটাল ক্রয় ব্যবস্থা প্রবর্তন:** মেডিকেল সরবরাহ ও সরঞ্জামের ক্রয়ে e-GP বাধ্যতামূলক করা হলে স্বচ্ছতা বাড়বে, রাজনৈতিক প্রভাব কমবে এবং রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে সরবরাহ ব্যবস্থাপনা আরও দক্ষ হবে। HSD-তে এটির প্রয়োগ জরুরি, কারণ এখানে এখনও ব্যবস্থাটি পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়নি। রিয়েল-টাইম ইনভেন্টরি সিস্টেম ও IoT ব্যবহারে সংকট মোকাবিলা, স্টক পর্যবেক্ষণ, সময়মতো পুনঃস্থাপন ও কোল্ড চেইন সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সম্ভব। এটি SDG 3 (সকলের জন্য স্বাস্থ্য ও মঙ্গল) ও SDG 16 (দুর্নীতি হাস ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান) অর্জনে সহায়ক।
- **প্রয়োজনভিত্তিক ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগ:** মেডিকেল সরঞ্জামের ক্রয়ের জন্য একটি কঠোর মূল্যায়ন প্রোটোকল তৈরি করা (এতে সরঞ্জামের প্রিসেট স্পেসিফিকেশন এবং হাসপাতালের চাহিদার হিসাব অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যেমন হাসপাতালের সাইজ এবং ব্যবহার হার) যাতে হাসপাতালের প্রকৃত চাহিদার সাথে সঙ্গতি বজায় রাখা যায় এবং অপ্রয়োজনীয় ক্রয় প্রতিরোধ করা যায়।
- **ক্রয় অস্বাভাবিকতার জন্য কঠোর শাস্তি প্রবর্তন:** ক্রয় জালিয়াতি এবং অনৈতিক প্রক্রিয়া (যেমন লবিং) এর সঙ্গে জড়িতদের জন্য আইনি পরিণতি কার্যকর করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।

স্মার্ট স্বাস্থ্য কার্ড

স্মার্ট স্বাস্থ্য কার্ড আলাদা অথবা জাতীয় পরিচয় পত্রের স্মার্ট কার্ডের মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্য সুবিধা চালু করতে হবে।

পরিচ্ছেদ ৮

স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা

বাংলাদেশের জন্য স্বাস্থ্য তথ্য সিস্টেম (HIS) সংক্ষার সুপারিশসমূহ

বাংলাদেশের বিদ্যমান স্বাস্থ্য তথ্য সিস্টেম (HIS) বিভক্ত, দীর্ঘকালীনভাবে অপ্রতুল অর্থায়িত এবং বাহ্যিক প্রযুক্তি ও দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল। এই বিভাজন আমাদের সমান, কার্যকর এবং রোগী-কেন্দ্রিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান সক্ষমতাকে দুর্বল করে। এটি স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং আমাদের জাতীয় নিরাপত্তাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে।

HIS সংক্ষার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে আমরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক যত্ন এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্য কভারেজ (UHC)-এর লক্ষ্য অর্জন করতে পারি। একটি পূর্ণাংশ ডিজিটাল রূপান্তরের তাড়াতাড়ি প্রয়োজন, যা তথ্য-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করবে, তথ্য ও ডিজিটাল সার্বভৌমত নিশ্চিত করবে এবং প্রতিটি নাগরিকের জন্য সমান স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করবে, বিশেষত সবচেয়ে বুঁকিপূর্ণ জনগণের জন্য। স্থানীয় সক্ষমতা এবং প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করে, আমরা একটি টেকসই এবং প্রতিক্রিয়া প্রদানকারী HIS গড়ে তুলতে পারি, যা আমাদের অনন্য জাতীয় প্রেক্ষাপট এবং স্বাস্থ্যসেবা চ্যালেঞ্জগুলোকে সঠিকভাবে সমাধান করবে।

আমরা ২০টি আন্তঃসংযুক্ত সুপারিশ উপস্থাপন করছি, যা চারটি মৌলিক স্তরের মাধ্যমে গভীর-জাতীয় প্রাচীরগুলি সমাধান করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে: নীতি, আইন এবং শাসন ব্যবস্থা এবং জাতীয় নিরাপত্তা উদ্দেগ হিসেবে স্বীকৃতি দিন এবং জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করুন

বাংলাদেশের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে স্বাস্থ্য তথ্য সিস্টেম (HIS) কে জাতীয় নিরাপত্তার একটি বিষয় এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক সম্পদ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। স্বাস্থ্য তথ্যের সেবা ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় নীতির সর্বোচ্চ স্তরে স্বাস্থ্য তথ্যের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা হবে, যা সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য স্থাপন করবে: শক্তিশালী ডিজিটাল অবকাঠামো নির্মাণ, কার্যকর আন্তঃমন্ত্রণালয় সমষ্টয় নিশ্চিত করা এবং যথাযথ কৌশলগত বিনিয়োগ সংগ্রহ করা। উন্নত এবং একীভূত HIS সমাধানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, যা দেশীয় প্রকৌশলী এবং আইটি বিশেষজ্ঞরা তৈরি করবেন, যা সার্বভৌমত, বিভাজন এবং বিস্তৃততার সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলো সুনির্দিষ্টভাবে সমাধান করবে। দেশে দক্ষতা এবং উন্নয়নে বিনিয়োগ করলে বাংলাদেশ একটি টেকসই এবং প্রতিক্রিয়াক্ষম HIS গড়ে তুলতে সক্ষম হবে, যা জাতীয় প্রেক্ষাপটের জন্য বিশেষভাবে তৈরি হবে এবং স্বাস্থ্য সিস্টেমের স্বায়ত্ত্বাসন এবং প্রস্তুতি শক্তিশালী করবে।

২. স্বাস্থ্য তথ্য সিস্টেমের জন্য একটি পূর্ণাংশ কৌশল তৈরি করুন, যা সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজেশন জন্য একটি সময়সীমাবদ্ধ রোডম্যাপ অন্তর্ভুক্ত করবে

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পূর্ণাংশ ডিজিটাল রূপান্তরের জন্য একটি সময়সীমাবদ্ধ বাস্তবায়ন রোডম্যাপসহ একটি জাতীয় কৌশল ও শাসন কাঠামো তৈরি করা হবে। এই কৌশলটি সকল স্তরের (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, তৃতীয়) এবং সকল ধরনের (সরকারি, বেসরকারি, এনজিও) স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করে, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং ডিজিটাল করার একটি জাতীয় ভিত্তি উপস্থাপন করবে। এতে সামনে ও ব্যাকএন্ড উভয় দিকের ডিজিটাল সমাধান (যেমন: নিরীক্ষন, চিকিৎসা, নিরাপদ ডাটাবেস, তথ্য বিনিয়য়) অন্তর্ভুক্ত থাকবে। একইসঙ্গে, একটি জাতীয় স্বাস্থ্য তথ্য শাসন কাঠামো গড়ে তোলা হবে, যা তথ্য ব্যবহারে জবাবদিহিতা ও মৈতিকতা নিশ্চিত করে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বিশ্বাস গড়ে তুলবে এবং CRVS ও SVRS-এর মতো বিদ্যমান ব্যবস্থার সাথে সমষ্টয় করবে।

৩. স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন প্রবর্তন করুন, যা গোপনীয়তা, সাইবার নিরাপত্তা এবং রোগীর অধিকার সুরক্ষিত করবে

স্বাস্থ্যখাত তথ্য সুরক্ষা আইন প্রবর্তন করা উচিত, যা স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, অ্যাক্সেস, ব্যবহার এবং শেয়ারিংয়ের জন্য একটি স্পষ্ট ও কার্যকর আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করবে। এই আইনটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের GDPR, OECD সুপারিশ, এবং WHO নীতিমালার মতো বিশ্বব্যাপী সেরা প্রথাগুলি অনুসরণ করবে, তবে বাংলাদেশের আইনগত, প্রযুক্তিগত এবং প্রতিষ্ঠানগত প্রেক্ষাপটে

ভিত্তি স্থাপন করবে। এতে রোগীর সম্মতি, তথ্য অ্যাক্সেস অধিকার, তথ্য শেয়ারিং প্রটোকল, লঙ্ঘনের নোটিফিকেশন, প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জরিমানা সম্পর্কিত পরিষ্কার বিধান থাকবে। ভবিষ্যতের প্রযুক্তি যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইলেক্ট্রনিক ডেটা উন্নত বিশ্লেষণ সমর্থন করতে সক্ষম হবে, যা স্বাস্থ্য তথ্য ইকোসিস্টেমে নিরাপত্তা, দায়বদ্ধতা এবং জনগণের আস্থা নিশ্চিত করবে।

৪. স্বাস্থ্য তথ্য সিস্টেমের শাসন ব্যবস্থাগনার জন্য একটি জাতীয় স্বাস্থ্য তথ্য কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করুন

স্বাস্থ্য তথ্য সিস্টেমের শাসন ব্যবস্থাপনা এবং কৌশলগত তত্ত্বাবধানে একটি স্বাধীন নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ হিসেবে জাতীয় স্বাস্থ্য তথ্য কাউন্সিল (NHIC) প্রতিষ্ঠা করুন। NHIC-কে জাতীয় তথ্য মান তৈরি এবং কার্যকর করতে, স্বাস্থ্য আইটি সিস্টেমগুলোকে অনুমোদন দিতে, কম্প্লায়েন্স মনিটর করতে এবং স্বাস্থ্য এবং অস্বাস্থ্য খাতগুলোর মধ্যে সমর্থয় সাধন করতে বাধ্য করা উচিত যাতে সিস্টেমের মধ্যে সামগ্রিক সমর্থন বজায় থাকে। এর নিয়ন্ত্রক সতত এবং কৌশলগত তত্ত্বাবধানের ভূমিকা সুরক্ষিত রাখতে, NHIC-কে বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কার্যক্রমগুলির থেকে স্বাধীন থাকতে হবে, শুধুমাত্র শাসন ব্যবস্থা, দায়বদ্ধতা এবং HIS ইকোসিস্টেমের মধ্যে সংজ্ঞান নিশ্চিত করতে মনোযোগী থাকতে হবে।

স্তৱ্য ২: মূল ডিজিটাল অবকাঠামো এবং প্ল্যাটফর্ম

৫. "স্বাস্থ্য-সেতু (Shasthyo-Shetu)" নামে জাতীয় একীভূত HIS প্ল্যাটফর্ম চালু করুন

'স্বাস্থ্য-সেতু' হবে বাংলাদেশের জাতীয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মূলভিত্তিক অবকাঠামো, যা সরকারি, বেসরকারি ও এনজিওসহ সকল স্তরের (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও তৃতীয়) স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে একীভূত একটি প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত করবে। স্থানীয় প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা নির্মিত এই মডুলার ও ওপেন-সোর্স আর্কিটেকচারের প্ল্যাটফর্মটি রিয়েল-টাইম ডেটা ও দীর্ঘমেয়াদি তথ্য সংরক্ষণের সুবিধা প্রদান করবে। এটি 'স্বাস্থ্য-চাবি' (রোগী শনাক্তকরণ), 'স্বাস্থ্য-ব্রতান্ত' (EHR), 'স্বাস্থ্য-চিত্র' (ডায়াগনস্টিক ইমেজিং), 'স্বাস্থ্য-উপকরণ' (লজিস্টিক্স ও ঔষধ), এবং 'স্বাস্থ্য-বিকাশ' (ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য তথ্য অ্যাক্সেস) সহ জাতীয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য স্যুটের বিভিন্ন মডিউলের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে। প্ল্যাটফর্মটি বিদ্যমান ও ভবিষ্যতের সিস্টেমের সাথে আন্তঃসংযোগ, স্বয়ংক্রিয় রিপোর্টিং, জিও-ট্যাগিং, GIS সংযুক্তি ও উন্নত বিশ্লেষণ সমর্থন করবে, এবং শক্তিশালী ডেটা শাসন প্রটোকলের মাধ্যমে নিরাপত্তা, গোপনীয়তা ও নিয়ন্ত্রক নীতির সাথে সংজ্ঞানিক স্বাস্থ্যখাতে প্রমাণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে।

৬. জাতীয় পরিচয়পত্র/ জন্ম নিবন্ধন (১৮ বছরের নিচে)-এর সাথে সংযুক্ত একটি 'ইউনিভার্সাল হেলথ আইডি' বাধ্যতামূলক করুন এবং "স্বাস্থ্য-চাবি (Shasthyo-Chabi)" কার্ড চালু করুন

প্রতিটি নাগরিককে একটি অনন্য ডিজিটাল স্বাস্থ্য আইডি প্রদান করা হবে, যা জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্ম নিবন্ধনের সাথে যুক্ত থেকে 'স্বাস্থ্য-চাবি' নামে একটি স্মার্ট স্বাস্থ্য কার্ডের মাধ্যমে কার্যকর হবে। এই স্বাস্থ্য আইডি স্বাস্থ্যসেবায় সার্বজনীন ও নিরাপদ অ্যাক্সেস নিশ্চিত করবে এবং 'স্বাস্থ্য-সেতু' প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ব্যক্তির ইলেক্ট্রনিক স্বাস্থ্য রেকর্ড ('স্বাস্থ্য-ব্রতান্ত'), ঔষধ ও লজিস্টিক্স ('স্বাস্থ্য-উপকরণ'), এবং ডায়াগনস্টিক ইমেজিং ('স্বাস্থ্য-চিত্র') এর সঙ্গে যুক্ত থাকবে। এটি প্রাথমিক সেবা, সরকারি ঔষধ, এবং সামাজিক স্বাস্থ্য সীমার মতো সুবিধাগুলিতে প্রবেশ সহজ করে দেবে, চরম স্বাস্থ্য ব্যয় ছাস করবে, এবং সেবা ধারাবাহিকতা, পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধ ও জালিয়াতি রোধে সহায়ক হবে।

৭. স্থায়ীভাবে "স্বাস্থ্য-ব্রতান্ত (Shasthyo-Brittanto)" কে জাতীয় ইলেক্ট্রনিক স্বাস্থ্য রেকর্ড (EHR) সিস্টেম হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য করুন

'স্বাস্থ্য-ব্রতান্ত' কে জাতীয় ইলেক্ট্রনিক স্বাস্থ্য রেকর্ড (EHR) সিস্টেম হিসেবে চালু করুন, যা 'স্বাস্থ্য-সেতু' প্ল্যাটফর্মের অধীনে দীর্ঘমেয়াদী, একাধিক সেবা প্রদানকারী, আন্তঃখাত এবং রোগী-কেন্দ্রিক তথ্য ব্যবস্থাপনা সক্ষম করবে।

'স্বাস্থ্য-ব্রতান্ত' সাধারণ EMR থেকে ডিন, যা শুধুমাত্র একক সুবিধায় সীমাবদ্ধ, এটি একজন ব্যক্তির স্বাস্থ্য ইতিহাসের একটি বিস্তৃত এবং একীভূত চিত্র সরবরাহ করবে যা পুরো সেবা ধারাবাহিকতায় থাকবে। এটি যত্রের পূর্ণ জীবনচক্রের নথিভুক্তি সমর্থন করবে, যেমন ক্লিনিক্যাল পরামর্শ, ডায়াগনস্টিক, ইনপেশনেট ট্রিটমেন্ট, রেফারেল, ফলো-আপ, এবং ঔষধ প্রদান। 'স্বাস্থ্য-চিত্র' এর মাধ্যমে তৈরি করা সমস্ত ডায়াগনস্টিক ইমেজিং ব্যক্তির EHR-এ এমবেড করা হবে, এবং 'স্বাস্থ্য-উপকরণ' এর মাধ্যমে সকল প্রেসক্রিপশন এবং ঔষধ লেনদেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের রেকর্ডে ক্যাপচার এবং সংযুক্ত হবে। 'স্বাস্থ্য-চাবি' এর মাধ্যমে ডিজিটালভাবে সংযুক্ত থাকা সিস্টেমটি রেকর্ডে নিরাপদ, প্রমাণিত অ্যাক্সেস নিশ্চিত করবে এবং যেভাবে গুণগত মান উন্নত করতে ক্লিনিক্যাল সিদ্ধান্ত সমর্থন সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত করবে। 'স্বাস্থ্য-ব্রতান্ত' এর গ্রহণযোগ্যতা তথ্যের বিভাজন এবং পুনরাবৃত্তি করারে, ক্লিনিক্যাল গুণমান শক্তিশালী করবে এবং রোগী-কেন্দ্রিক, সমষ্টি সেবা সরবরাহের জন্য ভিত্তি তৈরি করবে।

৮. জাতীয় ইমেজিং প্ল্যাটফর্ম চালু করুন, যা “স্বাস্থ্য-চিত্র (Shasthyo-Chitro)” নামে পরিচিত হবে

‘স্বাস্থ্য-চিত্র’ কে জাতীয় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বাস্তবায়ন করুন, যা ডায়াগনস্টিক ইমেজিং ধারণ, সংরক্ষণ এবং শেয়ারিংয়ের জন্য সম্পূর্ণরূপে ‘স্বাস্থ্য-সেতু’ অবকাঠামোর অধীনে একটীভূত হবে। এটি একটি DICOM-সামঞ্জস্য পিকচার আর্কাইভিং এবং কমিউনিকেশন সিস্টেম (PACS) হিসেবে ডিজাইন করা হবে, অথবা একটি তুলনামূলক ওপেন-স্ট্যান্ডার্ড সমাধান, যা সুরক্ষিত ইমেজ এক্সচেঞ্জ সক্ষম করবে এবং AI-ভিত্তিক ডায়াগনস্টিক সমর্থন সরঞ্জামগুলির সাথে সংযোগ স্থাপন করবে।

৯. ঔষধ এবং স্বাস্থ্য লজিস্টিকস ব্যবস্থাপনার জন্য একটি জাতীয় প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করুন, যা “স্বাস্থ্য-উপকরণ (Shasthyo-Upokoron)

১০. জাতীয় তথ্য কেন্দ্রে সমস্ত স্বাস্থ্য তথ্য হোস্ট করুন এবং একটি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য তথ্য বিনিয়য় এবং ডেটা রিপোজিটরি তৈরি করুন ‘স্বাস্থ্য-সেতু’, ‘স্বাস্থ্য-চাবি’, ‘স্বাস্থ্য-বৃত্তান্ত’, ‘স্বাস্থ্য-চিত্র’ ও ‘স্বাস্থ্য-উপকরণ’ প্ল্যাটফর্ম থেকে উৎপন্ন সব স্বাস্থ্য তথ্য জাতীয় তথ্য কেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে, যা ICT বিভাগের অধীনে থেকে ডেটা সার্ভিসেস, নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করবে। একটি জাতীয় স্বাস্থ্য তথ্য বিনিয়য় (HIE) স্তর এবং স্বাস্থ্য ডেটা রিপোজিটরি গড়ে তুলে সিস্টেমগুলোর মধ্যে আন্তঃসংযোগ, নিরাপদ ডেটা শেয়ারিং ও দুটু অ্যাক্সেস নিশ্চিত করতে হবে। এ অবকাঠামো শক্তিশালী ডেটা সুরক্ষা প্রোটোকল এবং জাতীয় ডেটা শাসন কাঠামোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে, যা গোপনীয়তা, সম্মতি ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করে তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা ও নীতিনির্ধারণে সহায়তা করবে।

১১. বৈশ্বিক আন্তঃসংযোগযোগ্যতা মানদণ্ডের অধীনে ডিজিটাল স্বাস্থ্য সিস্টেম এবং ডেভেলপারদের জন্য একটি জাতীয় সার্টিফিকেশন কাঠামো প্রবর্তন করুন

বাংলাদেশে স্থাপিত সব ডিজিটাল স্বাস্থ্য সিস্টেমকে HL7 FHIR, ICD-11, DICOM, SNOMED CT ও LOINC-এর মতো আন্তর্জাতিকভাবে স্থীরূপ আন্তঃসংযোগযোগ্যতা মানদণ্ড মেনে চলতে হবে। এসব মানদণ্ডের স্থানীয় বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সরকারকে গাইডলাইন ও ব্যবহার প্রোটোকল তৈরি করতে হবে। একটি সরকারি নিয়ন্ত্রিত সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়া চালু করতে হবে, যা সকল স্বাস্থ্য IT ডেভেলপার ও সিস্টেম বাস্তবায়নকারীদের জন্য বাধ্যতামূলক হবে এবং জাতীয় প্ল্যাটফর্মে (যেমন ‘স্বাস্থ্য-সেতু’ ও ‘স্বাস্থ্য-বৃত্তান্ত’) একটীভূকরণের পূর্বশর্ত হবে। এই কাঠামো সিস্টেমের আন্তঃসংযোগ, তথ্যের ধারাবাহিকতা, গুণমান, জবাবদিহি ও টেকসইতা নিশ্চিত করবে।

স্তৰ্ণ ৩: ডেটা অ্যানালিটিক্স, ডেটা ইনটেলিজেন্স এবং ডেটার ব্যবহার

১২. অগ্রাধিকার প্রাপ্ত অবস্থাগুলির জন্য ‘জাতীয় রোগ রেজিস্ট্রি’ প্রতিষ্ঠা করুন

বাংলাদেশকে জাতীয় রোগ রেজিস্ট্রি তৈরি করার প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত, প্রথমে ক্যান্সার থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে অন্যান্য উচ্চ অগ্রাধিকার পরিস্থিতি, যেমন ডায়াবেটিস, দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ, রিউমাটোলজিক্যাল রোগ, গর্ভবত্তা ফিস্টুলা, বিশেষ চাহিদাসম্পর্ক শিশু, বিরল রোগ এবং অস্বাভাবিক মৃত্যুর অন্তর্ভুক্ত করতে। এই নিবন্ধনগুলো ‘স্বাস্থ্য-সেতু’ প্ল্যাটফর্মে সম্পূর্ণভাবে ইন্টিগ্রেটেড এবং ‘স্বাস্থ্য-চাবি’ দিয়ে রোগী শনাক্তকরণ, ‘স্বাস্থ্য-বৃত্তান্ত’ দিয়ে ক্লিনিক্যাল রেকর্ড, ‘স্বাস্থ্য-চিত্র’ দিয়ে ইমেজিং ডেটা এবং ‘স্বাস্থ্য-উপকরণ’ দিয়ে চিকিৎসা এবং ঔষুধ ট্র্যাকিং এর সাথে সংযুক্ত করা হবে। রিয়েল-টাইম অ্যানালিটিক্স ক্ষমতা সহ ডিজাইন করা, নিবন্ধনকৃত রোগের সংক্রমণ, চিকিৎসার ধরণ, ফলাফল এবং যন্ত্রের ভৌগোলিক এবং জনগণভিত্তিক বৈশম্য নিরীক্ষণের জন্য কার্যকর হবে। এগুলো ক্লিনিক্যাল গবেষণা, স্বাস্থ্য কর্মী পরিকল্পনা এবং উচ্চ অঞ্চলে লক্ষ্যভিত্তিক জনস্বাস্থ্য হস্তক্ষেপের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে। এই নিবন্ধনগুলোর প্রতিষ্ঠা একটি তথ্যভিত্তিক, প্রতিক্রিয়াক্ষম স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে।

১৩. জাতীয় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং মেশিন লার্নিং (ML) অন্তর্ভুক্ত করুন, যাতে প্রাকৃতিক, পূর্বাভাসমূলক, এবং সুনির্দিষ্ট স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ চালিত হয়

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং মেশিন লার্নিং (ML) ক্ষমতাগুলো জাতীয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর মধ্যে, যেমন ‘স্বাস্থ্য-সেতু’, ‘স্বাস্থ্য-বৃত্তান্ত’, ‘স্বাস্থ্য-চিত্র’, এবং ‘স্বাস্থ্য-উপকরণ’, সিস্টেম্যাটিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এই প্রযুক্তিগুলো প্রাদুর্ভাবের পূর্বাভাস, রোগ বোার পূর্বীনুমান, সেবার ব্যবহার পূর্বাভাস, এবং লজিস্টিক চাহিদা অনুমান করতে সহায়তা করবে, যার ফলে সম্পদ বরাদ্দ এবং পরিকল্পনা উন্নত হবে। AI-চালিত ক্লিনিক্যাল সিন্ড্রোম সহায়ক টুলগুলো ‘স্বাস্থ্য-বৃত্তান্ত’ এ অন্তর্ভুক্ত হলে, চিকিৎসা কার্যক্রম উন্নত হবে এবং ডায়াগনস্টিক ভুল কমবে। ‘স্বাস্থ্য-চিত্র’ এ, AI-ভিত্তিক চিত্র বিশ্লেষণ ডায়াগনস্টিক সহায়তা প্রদান করবে। সঠিকভাবে প্রয়োগ করলে, AI এবং ML পূর্বাভাসমূলক স্বাস্থ্যসেবায় রূপান্তর করতে সহায়তা করবে, যা বাংলাদেশকে একটি তথ্যভিত্তিক এবং কার্যকরী স্বাস্থ্য সিস্টেমের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

১৪. জাতীয় স্বাস্থ্য তথ্য সিস্টেম থেকে কার্যকরী ধারণা উত্তোলনের জন্য একটি নিরবেদিত স্বাস্থ্য ইনফরমেটিকস ইউনিট প্রতিষ্ঠা করুন
বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সেবার অধীনে একটি বিশেষ স্বাস্থ্য ইনফরমেটিকস ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা উচিত, যা ‘স্বাস্থ্য-সেতু’, ‘স্বাস্থ্য-চাবি’, ‘স্বাস্থ্য-বৃত্তান্ত’, ‘স্বাস্থ্য-চিত্র’ এবং ‘স্বাস্থ্য-উপকরণ’ থেকে একত্রিত স্বাস্থ্য ডেটা বিশ্লেষণ করে এবং কার্যকরী ধারণা তৈরি করে। এই ইউনিটটি জাতীয় এবং উপ-জাতীয় তরে রোগ পর্যবেক্ষণ, স্বাস্থ্য সেবা পরিকল্পনা, গুণমান মনিটরিং এবং রিয়েল-টাইম সিন্ক্রান গ্রহণে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করবে। ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিকল্পনার পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে, স্বাস্থ্য ইনফরমেটিকস ইউনিট সময়মতো, প্রমাণভিত্তিক তথ্য প্রদান করবে, যা নীতি প্রণয়ন, সম্পদ বরাদ্দ এবং কার্যক্রমতা উন্নতির জন্য সহায়ক হবে—এবং বাংলাদেশকে একটি আরও প্রতিক্রিয়া-ক্ষমতাসম্পন্ন, জবাবদিহি প্রতিষ্ঠিত এবং তথ্যভিত্তিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়তে সহায়তা করবে।

১৬. স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সচেতন জন বিতর্কে উজ্জ্বালিত করতে একটি ওপেন-অ্যাক্সেস পাবলিক স্বাস্থ্য তথ্য পোর্টাল চালু করুন
একটি জাতীয় ওপেন-অ্যাক্সেস ডিজিটাল পোর্টাল তৈরি করা উচিত, যা ‘স্বাস্থ্য-সেতু’ এবং এর অন্তর্ভুক্ত প্ল্যাটফর্মগুলো—‘স্বাস্থ্য-বৃত্তান্ত’, ‘স্বাস্থ্য-চাবি’, ‘স্বাস্থ্য-চিত্র’, এবং ‘স্বাস্থ্য-উপকরণ’—থেকে নিষ্ক্রিয়কৃত পাবলিক স্বাস্থ্য ডেটাসেট প্রকাশ করবে। এই পোর্টালটি গবেষক, সাংবাদিক, নীতিনির্ধারক এবং নাগরিকদের নিরাপদভাবে কিউরেটেড ডেটাসেট অ্যাক্সেসের সুযোগ দেবে, যা স্বাধীন বিশ্লেষণ, জনসমালোচনা এবং নাগরিক অংশগ্রহণকে সক্ষম করবে। অধিকাংশ ডেটা (অ্যাননিমাইজড) সেবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে, তবে কিছু ডেটা সীমিত থাকবে। পোর্টালটি স্ট্যান্ডার্ডাইজড মেটাডেটা, ডেটা ডকুমেন্টেশন প্রোটোকল এবং ডেটা নেভিগেশনের জন্য ব্যবহারকারী-বান্ধব টুলস অন্তর্ভুক্ত করবে। নজরদারি ‘জাতীয় স্বাস্থ্য তথ্য কাউন্সিল’ (NHIC) এর মাধ্যমে হতে হবে, যাতে ডেটার ব্যবহার নৈতিক, সমান এবং জাতীয় স্বাস্থ্য তথ্য সুরক্ষা আইন অনুযায়ী থাকে। ওপেন ডেটা অ্যাক্সেসকে প্রতিষ্ঠানিকরণ করে, বাংলাদেশ স্বচ্ছতা এবং প্রমাণভিত্তিক সংলাপের একটি সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারে।

স্তৰ ৪: সক্ষমতা, অন্তর্ভুক্তি এবং উত্তোলন

১৭. "স্বাস্থ্য-সাক্ষরতা (Shasthyo-Shakkhorota)" নামক জাতীয় ডিজিটাল সাক্ষরতা উদ্যোগ চালু করন

স্বাস্থ্য-সাক্ষরতা একটি জাতীয় উদ্যোগ হিসেবে চালু করা উচিত, যাতে ডিজিটাল সাক্ষরতা বৃদ্ধি করা যায় এবং ডিজিটাল স্বাস্থ্য প্ল্যাটফর্মগুলির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত হয়। এর মধ্যে চিকিৎসক, নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের জন্য ডিজিটাল দক্ষতা প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের জন্য ধারাবাহিক ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পাশাপাশি, কমিউনিটি-ভিত্তিক ডিজিটাল সাক্ষরতা ক্যাম্পেইন চালু করা উচিত, বিশেষ করে নারী স্বাস্থ্য কর্মীদের ক্ষমতায়ন এবং প্রাপ্তিক জনগণের ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে।

১৮. শিশু ও কিশোরদের উন্নয়ন, সুস্থতা এবং সুরক্ষা: শিশু ও কিশোরদের সুস্থতা বৃদ্ধি এবং তাদের মানসিক, শারীরিক এবং যৌন নির্যাতন ও শোষণ থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সকল নাগরিকদের কাছে বৃহৎ আকারে এসএমএস পাঠানো। শিশু ও কিশোরদের কার্যকর উন্নয়ন সম্পর্কে জ্ঞান প্রচারের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা, যাতে এনিমেটেড ভিডিও এবং অন্যান্য কার্যকর যোগাযোগ উপকরণ ব্যবহার করে, বাড়িতে ভিত্তি কর্মসূল মূল্যায়ন সরঞ্জাম দিয়ে স্ফীনিং করা এবং বিশ্বাসযোগ্য সেবাগুলোর মানচিত্র তৈরি করে যত্ন গ্রহণের অভ্যাসগুলো সহজতর করা।

১৯. স্বাস্থ্য তথ্যবিজ্ঞান এবং স্বাস্থ্য ডেটা সম্পর্কিত ইঞ্জিনিয়ারিংকে একটি আনুষ্ঠানিক শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং ডিজিটাল স্বাস্থ্য নেতৃত্ব ও বাস্তবায়নে ক্যারিয়ার পথ তৈরি করা: স্বাস্থ্য তথ্যবিজ্ঞান এবং ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিংকে আনুষ্ঠানিক শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যাতে ডিজিটাল স্বাস্থ্য নেতৃত্ব এবং বাস্তবায়নে ক্যারিয়ার তৈরি হয়। সরকারি সেবা ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রশিক্ষণ এবং ডিপ্রি প্রোগ্রাম স্থাপন করা উচিত, যাতে ডিজিটাল স্বাস্থ্য ইকোসিস্টেমের নেতৃত্ব নিশ্চিত হয়।

২০. জাতীয় HIS-এ বেসরকারি হাসপাতাল এবং ক্লিনিকগুলোকে পর্যায়ক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে লাইসেন্সিং চাহিদা হিসেবে বাধ্যতামূলক করা: একটি ডিজিটাল স্বাস্থ্য ইকোসিস্টেম প্রতিষ্ঠা করতে বেসরকারি ও এনজিও পরিচালিত স্বাস্থ্য সুবিধাগুলোকে জাতীয় HIS-এর সাথে সংযুক্ত করা জরুরি। এর মধ্যে ‘স্বাস্থ্য-সেতু’ এবং ‘স্বাস্থ্য-বৃত্তান্ত’ প্ল্যাটফর্ম, রোগ নিবন্ধন এবং মাসিক সেবার পরিসংখ্যান নিয়মিত রিপোর্টিং অন্তর্ভুক্ত থাকবে। বাস্তবায়ন বড় বেসরকারি হাসপাতাল থেকে শুরু হয়ে পর্যায়ক্রমে ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোতে হবে, সরকারকে প্রযুক্তিগত সহায়তা ও প্রশংসনোদ্দেশ প্রদান করতে হবে। লাইসেন্সিং নবায়ন সফল সংযুক্তির উপর নির্ভরশীল হবে। জনসচেতনতা বাড়াতে ‘স্বাস্থ্য-সাক্ষরতা’ প্রচারাভিযান চালানো উচিত। সংযুক্তি না করা প্রতিষ্ঠানগুলো রোগী সেবা সুবিধা ও সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা থেকে বন্ধিত হবে, যা সম্মতির গুরুত্ব বাড়াবে। ডিজিটাল স্বাস্থ্য সংযোগ বাধ্যতামূলক করলে বাংলাদেশে সেবার গুণমান এবং স্বাস্থ্য সিস্টেম শাসনে উন্নতি হবে।

পরিচ্ছেদ ৯

স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়ন

স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়নের টেকসই সংস্কারের সুপারিশমালা

বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হলে প্রয়োজন একটি পর্যাপ্ত (adequate), ন্যায্য (equitable) এবং টেকসই (sustainable) অর্থায়ন ব্যবস্থা। স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়ন ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য আমরা তথ্য-প্রমাণ নির্ভর (evidence-based) এবং বাস্তবভিত্তিক (feasible) সুপারিশমালা উপস্থাপন করছি। এই সুপারিশগুলোকে পাঁচটি কৌশলগত স্তরে (strategic pillar) ভাগ করা হয়েছে। প্রথম স্তরটি স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়নের মৌলিক ভিত্তি (fundamental value) সংক্রান্ত। পরবর্তী তিনটি স্তর স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়নের মূল কার্যক্রম (core functions) সংক্রান্ত। শেষ স্তরটি পুরো ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অপচয় হাসের সঙ্গে সম্পর্কিত।

এই পাঁচটি স্তর হলো:

- ক) স্বাস্থ্যকে জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং স্বাস্থ্যখাতে টেকসই অর্থায়নকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া;
- খ) স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়নের জন্য রাজস্ব আহরণ ও তহবিল সংগ্রহ ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী করা;
- গ) সম্পদ একত্রিকরণ ও ঝুঁকি হাসের সমর্থিত পদ্ধতি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা;
- ঘ) সম্পদের ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করা এবং ব্যয়-সাশ্রয়ী (cost-effective) ক্রয় প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করা;
- ঙ) সার্বিক ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি ও অপচয় হাস করা

এই সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার পরিধি (coverage) ও গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে, বিপর্যয়কর চিকিৎসা ব্যয় (catastrophic health expenditure) হাস পাবে এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা (Universal Health Coverage) অর্জনের পথ আরও গতিশীল হবে।

স্তর ক: স্বাস্থ্যকে জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং স্বাস্থ্য খাতে টেকসই অর্থায়নকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া

একটি জনমুখী (people-centered), সহজলভ্য (accessible) এবং সর্বজনীন (universal) স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন একটি কার্যকর (effective) ও দীর্ঘমেয়াদি (sustainable) অর্থায়ন কাঠামো। স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগ কেবল মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করে না, বরং এটি জাতীয় অর্থনৈতিক গতিশীল করে, সামাজিক সংহতি (social cohesion) বজায় রাখে এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে (human development) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তবে স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়নের পর্যাপ্ততা, ন্যায্যতা এবং টেকসই হওয়া নির্ভর করে রাষ্ট্র স্বাস্থ্যকে কতটা অগ্রাধিকার দিচ্ছে তার ওপর। যদি স্বাস্থ্য রাজনৈতিক আলোচনা, আইনি কাঠামো, নীতিমালা এবং কৌশলগত পরিকল্পনার কেন্দ্রে না থাকে, তবে একটি কার্যকর ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন কাঠামো নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

সুতরাং, এখনই সময়—স্বাস্থ্যকে জাতীয় ও রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসার। একটি পর্যাপ্ত, ন্যায্য এবং টেকসই অর্থায়ন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে স্বাস্থ্যকে আমাদের সংবিধান, আইন, নীতি ও জাতীয় কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এই প্রেক্ষাপটে আমরা নিম্নোক্ত কর্মপদ্ধাগুলো সুপারিশ করছি:

৯.১ সুপারিশ: সংবিধান সংশোধন করে স্বাস্থ্যকে বাধ্যতামূলক অধিকার এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্থীরূপ দেওয়া
স্বাস্থ্যকে বাধ্যতামূলক অধিকার (Obligatory Right) হিসেবে সংবিধানে স্থীরূপ দিতে হবে। এতে এটি রাষ্ট্রের একটি সাংবিধানিক দায়িত্বে পরিণত হবে। অর্থাৎ, সরকারকে সীমিত সম্পদের মধ্যেও পরিকল্পিত ও ধারাবাহিক পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে ধাপে ধাপে দেশের প্রতিটি নাগরিকের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করা যায়। পাশাপাশি, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে (Primary Health Care - PHC) মৌলিক অধিকার (fundamental right) হিসেবে স্থীরূপ দিতে হবে। এতে প্রতিটি নাগরিক আইনি ভিত্তিতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সব ধরনের পরিসেবা কোনো আর্থিক চাপ ছাড়াই পাওয়ার অধিকার অর্জন করবেন। সংবিধানে স্থীরূপ বাধ্যতামূলক অধিকার ধাপে ধাপে বাস্তবায়নযোগ্য হলেও, মৌলিক অধিকার তাৎক্ষণিকভাবে রাষ্ট্রীয় কর্তব্যে পরিণত হয়। এই দুটি সাংবিধানিক স্থীরূপ সম্পর্কিতভাবে স্বাস্থ্যকে একটি জনকল্যাণমূখী খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব আরও স্পষ্টভাবে

নির্ধারণ করবে। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাও এই প্রস্তাবের পক্ষে শক্তিশালী প্রমাণ হাজির করে। উদাহরণস্বরূপ, থাইল্যান্ড ২০০২ সালে সংবিধানে স্বাস্থ্যকে মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে এবং Universal Coverage Scheme (UCS) চালু করে। এর ফলে ব্যক্তিগর্যায়ের ব্যয় (out-of-pocket expenditure) উল্লেখযোগ্যভাবে হাস্প পায়। দক্ষিণ আফ্রিকাও একই পথে হেঁটেছে। ১৯৯৪ সালে গর্ভবতী নারী ও শিশুদের জন্য, এবং ১৯৯৬ সালে সব নাগরিকের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিনামূল্যে চালু করে—এর পেছনে ছিল সংবিধানে স্বাস্থ্যকে অধিকার হিসেবে স্থীরূপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত। এই অভিজ্ঞতাগুলো দেখায়, সংবিধানে স্বাস্থ্যকে অধিকার হিসেবে স্থীরূপ দিলে তা টেকসই রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং পর্যাপ্ত অর্থায়নের পথ তৈরি করে। এমনকি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও এই অগ্রাধিকার আটু থাকে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এক্ষেত্রে রয়েছে শক্তিশালী জনসমর্থন। স্বাস্থ্যখাত সংস্কার বিষয়ে পরিচালিত এক জাতীয় জনমত জরিপে দেখা গেছে—৯২ শতাংশ মানুষ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে (PHC) সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্থীরূপ দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। এ ধরনের সাংবিধানিক পরিবর্তন স্বাস্থ্যখাতে পর্যাপ্ত, ন্যায্য এবং টেকসই অর্থায়নের জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা জোরদার করতে সহায় করবে।

৯.২ সুপারিশ: স্বাস্থ্যখাতে পর্যাপ্ত, ন্যায্য এবং টেকসই অর্থায়ন নিশ্চিত করতে একটি “স্বাস্থ্য অর্থায়ন সুরক্ষা আইন” প্রণয়ন করা

স্বাস্থ্যখাতে পর্যাপ্ত, ন্যায্য এবং টেকসই অর্থায়ন নিশ্চিত করতে একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে হবে—যা “স্বাস্থ্য অর্থায়ন সুরক্ষা আইন” নামে পরিচিত হতে পারে। এই আইন একটি আইনগত বাধ্যবাধকতা আরোপ করবে, যাতে সরকার প্রতি বছর মোট জাতীয় আয়ের (GDP) একটি নির্দিষ্ট শতাংশ এবং বার্ষিক বাজেটের একটি ন্যূনতম অংশ স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ দিতে বাধ্য হয়। এছাড়া, এই আইন নিশ্চিত করবে যে, স্বাস্থ্যখাত বার্ষিক বাজেটের সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত খাতগুলোর একটি হিসেবে বিবেচিত হয়। এই আইন সরকারি, বেসরকারি ও এনজিও খাতের সম্পদ একত্রিকরণ ও ঝুঁকি হাসের (resource and risk pooling)—এর জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দেবে, এবং বিভিন্ন উৎস থেকে পরিসেবা ক্রয় (service purchasing) ও কোশলগত ক্রয়ের (strategic purchase) স্থায়ী ভিত্তি তৈরি করবে। একই সঙ্গে, এটি স্বাস্থ্য বিষয়ক সকল নীতি ও কৌশল প্রণয়ন, এবং কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে তথ্য-প্রমাণ নির্ভরতা, ব্যয়-সাধায়িতা (cost-effectiveness) এবং অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ (economic impact analysis) বাধ্যতামূলক করবে। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা এই ধরনের কার্যকারিতা স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। ব্রাজিল ২০০০ সালে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও স্থানীয় সরকারকে স্বাস্থ্য খাতে একটি ন্যূনতম ব্যয়ের বাধ্যবাধকতার আওতায় আনে। এর পর ২০১২ সালে ‘Complementary Law No. 141’ নামে একটি আইন পাস করা হয়, যা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে যে ফেডারেল সরকারকে কমপক্ষে তার আয়ের ১৫%, রাজ্য সরকারকে ১২% এবং পৌর সরকারকে ১৫% স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করতে হবে। এই আইনি বাধ্যবাধকতা ব্রাজিলকে অর্থনৈতিক মন্দার সময়েও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ বজায় রাখতে সহায়তা করেছে। অন্যদিকে বুয়ান্ডা ২০০৮ সালে একটি স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়ন আইন প্রণয়ন করে, যার ফলে তারা দেশের প্রায় ৯০% জনগণকে কমিউনিটি-ভিত্তিক স্বাস্থ্য বীমার আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী, সরকারকে প্রতি বছর স্বাস্থ্য খাতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে। পাশাপাশি, সরকারি, দাতা এবং ব্যক্তিগত উৎস থেকে পাওয়া অর্থ একত্র করে একটি সমষ্টিত তহবিল ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। বুয়ান্ডা এই ধরনের কাঠামো ব্যবহার করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌছে দিতে পেরেছে এবং জনগণের আর্থিক সুরক্ষাও অনেক বেড়েছে। এই অভিজ্ঞতা দেখায়, বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য অর্থায়ন আইন থাকলে সরকার আরও দায়বদ্ধ হয়, স্বাস্থ্য খাতের জন্য নিয়মিত অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত হয়, এবং রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সংকটের মাঝেও স্বাস্থ্যখাত সুরক্ষিত থাকে। এমন একটি আইন একটি কার্যকর, সাশ্রয়ী ও টেকসই স্বাস্থ্যবস্থা গড়ে তুলতে দৃঢ় ভিত্তি তৈরি করে।

৯.৩ সুপারিশ: জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি সংশোধন করে স্বাস্থ্যকে একটি জনকল্যাণমূলক ও মেধা-ভিত্তিক খাত হিসেবে স্থীরূপ দেওয়া, যা জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান কোশলগত উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা

জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিকে এমনভাবে সংশোধন করতে হবে যাতে স্বাস্থ্যকে একটি জনকল্যাণমূলক (public good) এবং মেধা-ভিত্তিক (merit good) খাত হিসেবে স্থীরূপ দিতে হবে। একে জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং টেকসই উন্নয়নের অন্যতম প্রধান কোশলগত চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এই নীতিমালায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে যে, সকল অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ, জাতীয় কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত টিকা, অত্যাবশ্যকীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং স্বাস্থ্য তথ্যবস্ত্র—এসবই জাতীয় নিরাপত্তা ও সহনশীলতা (resilience) গঠনের জন্য কোশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ খাত। এখানে আন্তর্ভুক্ত অর্জন রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে সেবাদান কাঠামোর মূলভিত্তি হিসেবে স্থাপন করতে হবে। একইসঙ্গে, কার্যকর রেফারেল এবং স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়নকে অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা জরুরি।

বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে স্বাস্থ্যকে জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের অংশ হিসেবে বিবেচনা করলে স্বাস্থ্য সমতা ও সহনশীলতায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, থাইল্যান্ড তাদের স্বাস্থ্য নীতিকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুরক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত করে দুটি সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা (Universal Health Coverage - UHC) অর্জনের দিকে এগিয়েছে। শ্রীলঙ্কা স্বাধীনতার পর থেকে বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে (Primary Health Care) তাদের উন্নয়ন কৌশলে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং জনগণের সামগ্রিক কল্যাণের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছে। এর ফলে, কম ব্যয়ের মধ্যে দেশটি স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সুযোগ ও পরিসর বৃদ্ধি এবং সেবার সমতা নিশ্চিত করতে পেরেছে। বাংলাদেশের জন্য এ ধরনের সংক্ষার সময়োচিত ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি সাহসী ও সমন্বিত স্বাস্থ্য নীতি স্বাস্থ্যখাতে আর্থিক বরাদ্দ ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করবে, খাতভিত্তিক সমন্বয়কে উৎসাহিত করবে এবং সর্বোপরি, স্বাস্থ্যকে বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের কেন্দ্রে স্থাপন করবে।

৯.৪ সুপারিশ: সব নীতিতে স্বাস্থ্যকে অন্তর্ভুক্ত করা, এবং সকল জাতীয় ও খাতভিত্তিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য প্রভাব মূল্যায়ন (HEALTH IMPACT ASSESSMENT) বাধ্যতামূলক করা

একটি সহনশীল (resilient), সমতাভিত্তিক (equitable) এবং টেকসই (sustainable) স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে “সব নীতিতে স্বাস্থ্য” (Health in All Policies - HiAP) ধারণাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। মানুষের স্বাস্থ্য শুধুমাত্র স্বাস্থ্যখাতের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে না; বরং শিক্ষা, পরিবেশ, কৃষি, কর্মসংস্থান ও অবকাঠামোসহ বিভিন্ন অ-স্বাস্থ্য খাতের নীতি ও কর্মপরিকল্পনার ওপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। এসব খাতে কৌশলগত বিনিয়োগ (strategic investments) করলে রোগের প্রকোপ কমে, দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় হ্রাস পায়, এবং স্বাস্থ্য অর্থায়নের জন্য নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়। HiAP কার্যকর করতে জাতীয় ও খাতভিত্তিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য প্রভাব মূল্যায়ন (health impact assessment) বাধ্যতামূলক করতে হবে; স্বাস্থ্যবান্ধব রাজস্ব নীতিমালা (health-promoting fiscal policies) গ্রহণ করতে হবে—যেমন তামাক, চিনি-যুক্ত পানীয় এবং দূষণকারী শিল্প থেকে প্রাপ্ত আয়ের নির্দিষ্ট অংশ স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ রাখা; এবং যৌথ অর্থায়ন কাঠামো (co-financing mechanisms) গড়ে তুলতে হবে, যেখানে বিভিন্ন খাতের বিনিয়োগ জনস্বাস্থ অগ্রাধিকারের সঙ্গে সমন্বিত হয়। সফল বাস্তবায়নের জন্য শক্তিশালী আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় (inter-ministerial collaboration) এবং যৌথ দায়বদ্ধতা (joint accountability) নিশ্চিত করতে হবে। বিশ্বব্যাপী বেশ কিছু দেশ ইতিমধ্যেই HiAP কাঠামো সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। ফিনল্যান্ড HiAP ধারণাকে নীতিনির্ধারণের কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বাস্থ্য লক্ষ্য সংযুক্ত করতে শক্তিশালী আন্তঃখাতীয় শাসন কাঠামো (intersectoral governance) গড়ে তুলেছে। থাইল্যান্ড তাদের Universal Coverage Scheme (UCS) বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষা, কৃষি, পরিবেশ এবং নগর উন্নয়ন খাতের সঙ্গে সমন্বয় করে জনস্বাস্থে বিনিয়োগ বাঢ়িয়েছে। WHO-এর “More Money for Health, More Health for the Money” ধারণা দেখায়—যদি সব খাতে স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, তবে একই বিনিয়োগ থেকে আরও বেশি স্বাস্থ্য ফলাফল অর্জন করা সম্ভব। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে HiAP কাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করলে নতুন রাজস্ব উৎস (revenue streams) সৃষ্টি হবে, নীতিমালার খণ্ডতা ও অর্থায়নের বিচ্ছিন্নতা কমবে, এবং সরকারের একটি সম্মিলিত প্রয়াসে স্বাস্থ্য সমতার (health equity) পথে অগ্রগতি হ্রাসিত হবে। এই সংক্ষার শুধুমাত্র বিদ্যমান বিনিয়োগের ফলাফলকে আরও কার্যকর করবে না, বরং সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা (Universal Health Coverage - UHC) অর্জন এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার পথও সুদৃঢ় করবে।

৯.৫ সুপারিশ: জাতীয় স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়ন কৌশল সংস্কার করা; প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে এর মূল ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা; এবং ব্যক্তিগৰ্মায়ে ব্যয়ের ঝুঁকি, বিশেষ করে বিপর্যয়কর চিকিৎসা ব্যয় কমাতে লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসূচি চালু করা

বাংলাদেশে একটি কার্যকর এবং টেকসই স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়তে হলে জাতীয় স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়ন কৌশলকে (National Health Financing Strategy)-কে সার্বিকভাবে সংশোধন ও পরিমার্জন করতে হবে। এই কৌশলের কেন্দ্রে থাকতে হবে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, যাতে তা সহজলভ্য ও সর্বজনীন হয়। একইসঙ্গে, এই কৌশলে কিছু লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসূচি নির্ধারণ করতে হবে যেন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে ব্যক্তিগত ব্যয় (out-of-pocket expenditure), বিশেষত বিপর্যয়কর চিকিৎসা ব্যয় (catastrophic health expenditure) হাস পায়। এক্ষেত্রে বিপর্যয়কর চিকিৎসা ব্যয়ের মূল কারণসমূহ—যেমন উচ্চমূল্যের ওষুধ, দীর্ঘমেয়াদি রোগ ব্যবস্থাপনা (chronic disease management), জটিল অঙ্গের পরিপুরণ (complex surgeries), জরুরি চিকিৎসা (emergency services, ইত্যাদি- চিহ্নিত করে আর্থিক সুরক্ষার কৌশল নির্ধারনে তাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। এই কৌশলে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে একটি শক্তিশালী প্রিপেমেন্ট পদ্ধতি (prepayment) এবং একটি সমন্বিত তহবিল একত্রিতকরণ ও ঝুঁকি সমন্বয় ব্যবস্থাপনা (risk pooling)। অর্থ বরাদ্দে ব্যয়-সাশ্রয়িতা (cost-effectiveness) এবং ফলাফলভিত্তিক বিনিয়োগ (impact-based investment) উপর জোর দিতে হবে, যাতে প্রতিটি টাকার

সর্বোচ্চ ফল পাওয়া যায়। ঘানা (Ghana) ও ভিয়েতনাম (Vietnam)-এর অভিজ্ঞতা আমাদের দেখিয়েছে যে, যখন স্বাস্থ্যখাতের অর্থায়ন কৌশলে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়, তখন তা সেবার পরিধি (service coverage) বৃদ্ধি করে, নাগরিকদের জন্য আর্থিক সুরক্ষা (financial protection) নিশ্চিত করে এবং বাজেট ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও স্থিতিশীলতা নিয়ে আসে। এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশকে অবশ্যই এমন একটি কৌশল তৈরি করতে হবে, যেখানে অগ্রাধিকার ঠিক করে ধাপে ধাপে বাস্তবায়নযোগ্য (phased implementation) টেকসই অর্থায়ন (sustainable financing) কাঠামো নিশ্চিত করা হবে।

এই সংস্কার হবে বাংলাদেশের জন্য একটি বৃপ্তাত্তরমূলক পদক্ষেপ, যা "More Money for Health, More Health for the Money" নীতির বাস্তবায়নকে ভরার্থিত করবে। এর মাধ্যমে একটি অস্তর্ভুক্তিমূলক, দক্ষ, এবং জনগণের চাহিদার প্রতি সাড়া দিতে সক্ষম স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে উঠবে—যেখানে প্রতিটি টাকার বিনিয়োগ সরাসরি মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা, কার্যকারিতা এবং দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সুরক্ষা (long-term financial protection) নিশ্চিত করতে কাজে লাগবে।

স্তৰ্ণ ২: স্বাস্থ্য অর্থায়নের জন্য রাজস্ব আহরণ শক্তিশালীকরণ"

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে পর্যাপ্ত, ন্যায্য এবং টেকসই অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হলে বিদ্যমান সম্পদের সুষু আহরণ ও ব্যবস্থাপনাকে আরও দক্ষ ও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। এজন্য কর আদায়ের পদ্ধতি উন্নত করা এবং জনস্বাস্থ্য-সম্পর্কিত খাতে কর (health-related taxes) কার্যকরভাবে আরোপ ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। রাজস্ব বৃদ্ধির এই পদক্ষেপগুলো সরকারের স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্যোগ্য অর্থের পরিসর (fiscal space for health) বাড়াবে, ব্যক্তি পর্যায়ে স্বাস্থ্য ব্যয়ের (out-of-pocket expenditure) চাপ কমাবে এবং একইসঙ্গে স্বাস্থ্যবান্ধব আচরণ (healthier behaviors) গঠনে উৎসাহিত করবে।

নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো জাতীয় উন্নয়ন অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত উদাহরণ হিসেবে সেরা অনুশীলনের (international best practices) ভিত্তিতে প্রণীত, যা বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে টেকসই জনসম্পদ বৃদ্ধি করতে সহায়ক হবে।

৯.৬ সুপারিশ: কর আদায় সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ট্যাক্স-টু-জিডিপি অনুপাত বাড়ানো, এবং সর্বোচ্চ আয়শ্রেণি থেকে আদায়কৃত করের অন্তত ৫% স্বাস্থ্যখাতে বরাদের জন্য নির্ধারিত করা

বাংলাদেশের ট্যাক্স-টু-জিডিপি অনুপাত বিশ্বের অন্যতম সর্বনিম্ন, যা দেশের স্বাস্থ্য খাতে টেকসই অর্থায়নের অন্যতম প্রধান বাধা। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় কর ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, রাজস্ব প্রশাসনে স্বচ্ছতা, কর ফাঁকি রোধ, ডিজিটাল কর ব্যবস্থাপনা এবং কর কাঠামোর সরলীকৰণসহ একটি সমন্বিত সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরি। পাশাপাশি, অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিকে আনুষ্ঠানিক খাতে নিয়ে আসা এবং উচ্চ আয়ের ব্যক্তিদের কর পরিধি আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বৃহত্তর কর সংস্কার কৌশলের অংশ হিসেবে, সর্বোচ্চ আয়শ্রেণি থেকে আদায়কৃত করের অন্তত ৫% স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্য দিতে হবে। এই ধরনের লক্ষ্যভিত্তিক বরাদ্য একটি পূর্বানুমেয় ও স্বচ্ছ অর্থায়নের ধারা তৈরি করবে—বিশেষত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, এবং দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে। এটি একটি নীতিগত পরিবর্তনের বার্তা দেবে—যেখানে স্বাস্থ্যকে রাষ্ট্রীয় অগ্রাধিকারের কেন্দ্রে রাখা হবে এবং আর্থিক সুরক্ষা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বাস্থ্য বৈষম্য কমানো সম্ভব হবে।

আঞ্চলিক দেশগুলোর অভিজ্ঞতা বলে, ট্যাক্স-টু-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও সামাজিক খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা যায়। ভিয়েতনাম ২০০০-এর দশকের শুরুতে কর সংস্কার করে ই-ফাইলিং, সহজ করপদ্ধতি এবং কর অফিস বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে কর আহরণ সক্ষমতা বাড়ায়, যার ফলস্বরূপ শিক্ষা ও সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। ভারত ২০১৭ সালে একাধিক কর বাতিল করে গুছানো একটি পণ্য ও সেবা কর (GST) প্রবর্তন করে এবং আয়কর ব্যবস্থাকে ডিজিটাল করে, PAN-আধার সংযোগ ও বিশ্লেষণভিত্তিক কর ফাঁকি শনাক্তকরণ প্রযুক্তি চালু করে। এই ব্যবস্থাগুলোর ফলে রাজস্ব বৃদ্ধি ও সুশাসন নিশ্চিত হয় এবং স্বাস্থ্যখাতে 'আয়ুগ্রান্ত ভারত'-এর মতো বৃহৎ কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

বাংলাদেশের জন্য এই ধরনের কর সংস্কার এবং উচ্চ আয় শ্রেণির করের একটি অংশ স্বাস্থ্য খাতে নির্ধারিত করা একটি সময়োপযোগী ও সাহসী পদক্ষেপ। এটি শুধু স্বাস্থ্য খাতে দেশীয় অর্থায়নের একটি টেকসই ভিত্তি গড়ে তুলবে না, বরং দাতা নির্ভরতা ও ব্যক্তিগত ব্যয়ের চাপও কমাবে। সর্বোপরি, এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি শক্তিশালী, ন্যায্য এবং আর্থিকভাবে সুরক্ষিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি তৈরি করবে।

৯.৭ সুপারিশ: স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ভোগ্যপণ্যের ওপর আবগারি করা আরোপ/বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যখাতের জন্য নির্দিষ্ট বরাদ্দ সংরক্ষণ করা বাংলাদেশে স্বাস্থ্যবৃক্ষ কমানো এবং স্বাস্থ্যখাতে টেকসই অর্থায়নের (sustainable health financing) লক্ষ্যে তামাক (tobacco), চিনি-যুক্ত পানীয় (sugar-sweetened beverages), ক্যাফেইনসমৃদ্ধ এনার্জি ড্রিংক (caffeinated energy drinks), বুকের দুধের বিকল্প (breast milk substitutes), অ্যালকোহল (alcohol), অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবার (ultra-processed foods), ট্রান্স ফ্যাটযুক্ত প্যাকেটজাত খাবার, অতিরিক্ত লবণ্যযুক্ত ভাজা ম্যাকস, উচ্চমাত্রায় প্রক্রিয়াজাত ইনস্ট্যান্ট নুডলস এবং সুইটেনড কনডেন্সড মিঞ্চ-এর মতো স্বাস্থ্যক্ষতিকর পণ্যের ওপর আবগারি কর (excise tax) আরোপ করা বা বৃদ্ধি করতে হবে, এবং স্বাস্থ্যখাতের জন্য পুরুণ্যাধীনিক বরাদ্দ সংরক্ষণ করা। এসব পণ্য বাংলাদেশের বাজারে সহজলভ্য এবং শহরাঞ্চল ও তরুণদের মধ্যে দুট জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এর ফলে ডায়াবেটিস (diabetes), উচ্চ রক্তচাপ (hypertension), হৃদরোগ (cardiovascular diseases) এবং ক্যান্সারের মতো অসংক্রামক রোগের (non-communicable diseases - NCDs) হার ক্রমবর্ধমান। এই পণ্যে আবগারি কর আরোপ করলে একদিকে এর ব্যবহার কমবে, অন্যদিকে স্বাস্থ্য খাতে টেকসই ও পূর্বানুমেয় আয় (predictable revenue) সৃষ্টি হবে। এই কর থেকে প্রাপ্ত আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ স্বাস্থ্যখাতের জন্য নির্ধারিত (earmarked) রাখতে হবে, বিশেষ করে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য কর্মসূচি (preventive health programs), স্বাস্থ্য সচেতনতা কার্যক্রম (health promotion initiatives) এবং আর্থিক সুরক্ষা ব্যবস্থার (financial protection mechanisms) জন্য।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা নির্দেশ করে যে, আবগারি কর জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়নের জন্য একটি কার্যকর পদ্ধতি। উদাহরণস্বরূপ, ফিলিপাইন ২০১২ সালে “Sin Tax Reform Law” পাস করে, যা তামাক ও অ্যালকোহলের ওপর কর বৃদ্ধি করে এবং সেই কর থেকে প্রাপ্ত অর্থ সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা (Universal Health Care) সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে ব্যয় করা হয়। থাইল্যান্ড উচ্চ হারে চিনি-যুক্ত পানীয় ও তামাকজাত পণ্যে কর আরোপ করে, যার রাজস্ব “Health Promotion Foundation”-এ বরাদ্দ হয় এবং তা প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা (primary care) ও রোগ প্রতিরোধে (disease prevention) ব্যয় করা হয়। মেক্সিকো একটি সোডা ট্যাক্স (soda tax) চালু করে, যার ফলে প্রথম দুই বছরে চিনি-যুক্ত পানীয়ের ব্যবহার ৭.৬% হাস পায় এবং এই কর স্থূলতা প্রতিরোধ কর্মসূচির (obesity prevention efforts) অর্থায়নে সহায়তা করে। WHO সুপারিশ করে যে, তামাকজাত পণ্যের খুচরা মূল্যের অন্তত ৭৫ শতাংশ কর হিসাবে আরোপ করা উচিত এবং অন্যান্য ক্ষতিকর পণ্যের ওপরও অনুরূপ কৌশল প্রয়োগ করা উচিত। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রয়েছে এই পদক্ষেপের জন্য দৃঢ় জনসমর্থন। স্বাস্থ্যখাত সংক্ষার বিষয়ে পরিচালিত জাতীয় জনমত জরিপে দেখা গেছে—১০০ শতাংশ মানুষ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ভোগ্যপণ্যের ওপর শুরু ও কর বাড়ানোর পক্ষে মত দিয়েছেন। এই প্রেক্ষাপটে, স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত আবগারি কর (health-related excise tax) সম্প্রসারণ বাংলাদেশের জন্য একটি সাহসী ও সময়োপযোগী নীতিগত পদক্ষেপ হতে পারে—যা একদিকে অসংক্রামক রোগের বিস্তার রোধে সহায়ক হবে, অন্যদিকে জনস্বাস্থবান্ধব আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। একইসঙ্গে, এই সংক্ষার জাতীয় স্বাস্থ্যখাতে টেকসই অর্থায়নের জন্য একটি নতুন ও নির্ভরযোগ্য উৎস তৈরি করবে। এর মাধ্যমে সরকার ন্যায়, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জনমুখী স্বাস্থ্যসেবায় বিনিয়োগের সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে পারবে।

৯.৮ সুপারিশ: অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসবহুল পণ্য ও সেবার ওপর পৃথক স্বাস্থ্য কর চালু করা

বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতে টেকসই অর্থায়ন নিশ্চিত করতে অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসবহুল পণ্য ও সেবার ওপর মুসক (VAT) ভিত্তিক পৃথক একটি স্বাস্থ্য কর (Health Levy) চালু করতে হবে। এই কর কৌশলগতভাবে নির্ধারণ করা এবং এমন সব পণ্য ও সেবায় আরোপ করা, যা সাধারণ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় নয়—যেমন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রেফ্রিজেরেন্ট, তিন তারকা ও তার উর্ধ্বের প্রিমিয়াম হোটেল, বিলাসবহুল শপিং মল (centrally air-conditioned), অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, মাল্টিপ্লেক্স সিনেমা হল, উচ্চমূল্যের ইলেক্ট্রনিক্স, বিলাসবহুল বিউটি ও ওয়েলনেস স্পা এবং অভিজ্ঞতা প্রাইভেটেট ক্লাব। এই করটি এমনভাবে নকশা করতে হবে যাতে নিম্নায়ের জনগোষ্ঠীর ওপর কোনো অতিরিক্ত চাপ না পড়ে এবং এই আয়ের সম্পূর্ণ অংশ যেন শুধুমাত্র স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করার জন্য সংরক্ষিত (earmarked) থাকে।

দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা এই ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। দেশটি ২০১৮ সালে মুসক কাঠামোর অংশ হিসেবে চিনি-যুক্ত পানীয়ের ওপর স্বাস্থ্য প্রচার কর (Health Promotion Levy) চালু করে। খুচরা মূল্যের আনুমানিক ১১ শতাংশের সমপরিমাণ এই কর একদিকে যেমন চিনি-যুক্ত পানীয়ের ক্রয় উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে দেয়, তেমনি স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ কর্মসূচিতে ব্যয়যোগ্য একটি উল্লেখযোগ্য সরকারি আয়ও সৃষ্টি করে। ঘানা তার জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা কর্মসূচি (National Health Insurance Scheme - NHIS) অর্থায়নের জন্য মুসকের একটি নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারিত রেখেছে, যার মাধ্যমে একটি পূর্বানুমেয় এবং টেকসই রাজস্বধারা নিশ্চিত হয়। এই অভিজ্ঞতাগুলো দেখায় যে, অপ্রয়োজনীয় বা স্বাস্থ্য-ক্ষতিকর পণ্য ও সেবার ওপর লক্ষ্যভিত্তিক মুসক স্বাস্থ্য

কর আরোপ করলে তা একদিকে যেমন আয় বৃদ্ধির মাধ্যম হয়, তেমনি জনস্বাস্থ্য উন্নয়নেও কার্যকর অবদান রাখে। বাংলাদেশের জন্য স্বাস্থ্য খাত-নির্ভর একটি পৃথক মুসক স্বাস্থ্য কর প্রবর্তন একটি নির্ভরযোগ্য ও অভ্যর্থনীয় রাজস্ব উৎস তৈরি করবে—যা প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ, প্রয়োজনীয় ওষুধ ও ডায়াগনস্টিক সেবায় ভর্তুকি প্রদান, এবং সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা (social health insurance) বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। এই পদক্ষেপটি দেশের জনস্বাস্থ্য অবকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করবে এবং একটি অধিক ন্যায্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও আর্থিক ভাবে সুরক্ষিত স্বাস্থ্যব্যবস্থার দিকে বাংলাদেশের উত্তরণ নিশ্চিত করবে।

৯.৯ সুপারিশ: করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) কাজে লাগিয়ে জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা তহবিল গঠন করা

স্বাস্থ্যখাতে টেকসই দেশীয় অর্থায়ন নিশ্চিত করতে একটি ‘জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা তহবিল’ (National Health Impact Fund) গঠন করতে হবে। ওষুধ, ব্যাংক, বীমা, টেলিযোগাযোগ ও রাসায়নিক শিল্পসহ বড় করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর সিএসআর বাজেটের একটি নির্দিষ্ট অংশ—কমপক্ষে ২০ শতাংশ—এই তহবিলে জমা রাখা বাধ্যতামূলক করতে হবে। তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্য একটি স্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে, যাতে এই অর্থ শুধু স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় হয় এবং সরকারের অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচিতে সরাসরি ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। তহবিলটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের যৌথ তত্ত্বাবধানে, একটি স্বাধীন এবং বেসরকারি হস্তক্ষেপমুক্ত ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে। এ তহবিল থেকে মা ও শিশু স্বাস্থ্য, অসংক্রান্ত রোগ প্রতিরোধ, ডিজিটাল স্বাস্থ্য অবকাঠামো, জরুরি সেবা এবং পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে সেবা সম্প্রসারণে লক্ষ্যভিত্তিক বিনিয়োগ করা হবে। প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের অবদানের কার্যকারিতা পর্যালোচনার জন্য একটি প্রকল্পভিত্তিক ড্যাশবোর্ড ও প্রতিবেদন ব্যবস্থার মাধ্যমে ফলাফল পর্যবেক্ষণ করতে পারবে—যা জবাবদিহিত ও স্বচ্ছতা বাঢ়াবে। বাধ্যতামূলক অবদানের পাশাপাশি ষষ্ঠীয় অতিরিক্ত অবদান উৎসাহিত করতে সরকার ধাপে ধাপে ‘Health Impact Champions’ স্বীকৃতি, সরকারি অনুষ্ঠানে সম্মাননা, নীতিনির্ধারণী ফোরামে অংশগ্রহণের সুযোগ এবং কর ছাড় বা সিএসআর ক্রেডিটের মতো আর্থিক প্রগোদনার ব্যবস্থা চালু করতে পারে। এই উদ্যোগ স্বাস্থ্যখাতে বেসরকারি অংশীদারিত্বকে আরও সংগঠিত ও প্রভাবসৃষ্টিকারী রূপ দেবে। ভারতের ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী, বড় করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের নিট মুনাফার ২% সিএসআর-এ ব্যয় করতে হয়—যার অনেকটাই স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন খাতে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় CSR অর্থায়ন জাতীয় এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ এবং ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে কর্মক্ষেত্রে ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে ব্যবহৃত হয়েছে।

বাংলাদেশে এই জাতীয় স্বাস্থ্য তহবিল চালু হলে সিএসআর বিনিয়োগ আরও সংগঠিত, স্বচ্ছ ও প্রভাবসৃষ্টিকারী হবে। এটি জাতীয় স্বাস্থ্য কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি কার্যকর পাবলিক-প্রাইভেট অংশীদারত গড়ে তুলবে এবং স্বাস্থ্য খাতের জন্য টেকসই অর্থায়নের নতুন পথ উন্মোচন করবে।

৯.১০ সুপারিশ: প্রবাসী বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের স্বাস্থ্য খাতকে শক্তিশালী করার জন্য স্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রবাসী বন্ড চালু করা

স্বাস্থ্য খাতে টেকসই অর্থায়নের নতুন উৎস তৈরি করতে সরকার একটি সরকারি গ্যারান্টিযুক্ত বিশেষ বন্ড চালু করতে পারে—‘স্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রবাসী বন্ড’। এই বন্ডের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিরা সরাসরি দেশের স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ করতে পারবেন। বিনিয়োগকারীদের জন্য থাকবে প্রতিযোগিতামূলক মুনাফার হার, কর ছাড় বা কর রেয়াত, এবং বৈদেশিক মুদ্রায় বিনিয়োগের সুবিধা। প্রাপ্ত অর্থ শুধুমাত্র স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত হবে। এই তহবিল থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করা হবে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামো উন্নয়ন, সরকারি হাসপাতালের মানোন্নয়ন, ডিজিটাল স্বাস্থ্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, সামাজিক স্বাস্থ্য বীমার বিস্তার এবং জরুরি স্বাস্থ্যসেবার প্রস্তুতি ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে একটি স্বচ্ছ, দক্ষ ও যৌথ প্রশাসনিক কাঠামো প্রয়োজন—যেখানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয় যৌথভাবে তহবিল ব্যবস্থাপনা করবে। প্রবাসীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে দুর্বাস, কনস্যুলেট এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রচারণা চালাতে হবে। এই প্রচারণায় তুলে ধরতে হবে—তাদের বিনিয়োগ কীভাবে দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নত করতে ব্যবহার হচ্ছে। এই উদ্যোগ দেশের উপর বিদেশি সহায়তার নির্ভরতা কমাবে এবং স্বাস্থ্য খাতে দীর্ঘমেয়াদি, নিজস্ব ও টেকসই অর্থায়নের একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করবে। পাশাপাশি, এটি প্রবাসীদের দেশপ্রেমকে একটি গর্বিত ও কার্যকর জাতীয় উদ্যোগে ঝুঁপান্ত করবে। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় যে প্রবাসী বন্ড উন্নয়নমূলক প্রকল্পে অর্থায়নের একটি কার্যকর মাধ্যম হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ভারত তাদের প্রবাসী বন্ডের মাধ্যমে ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সংগ্রহ করেছে, যা বিভিন্ন অবকাঠামো এবং স্বাস্থ্য প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে। ইথিওপিয়াও ডায়াসপোরা বন্ডের মাধ্যমে প্রবাসীদের সম্পৃক্ত করে বিদ্যুৎ ও রেলসহ জাতীয় অবকাঠামো খাতে অর্থ বিনিয়োগ করেছে। এই অভিজ্ঞতা দেখায়, সঠিক কাঠামো ও স্বচ্ছতা থাকলে প্রবাসী বন্ড হতে পারে টেকসই ও নিরাপদ অর্থায়নের একটি নির্ভরযোগ্য উৎস। বাংলাদেশের জন্য “স্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রবাসী বন্ড” একটি অনন্য উদ্যোগ হবে, যা প্রবাসীদের দেশের উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেবে। এটি শুধু বিনিয়োগকারীদের সুনিশ্চিত আর্থিক রিটার্ন দেবে না, বরং দেশের স্বাস্থ্যখাতের মানোন্নয়নে সরাসরি অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

৯.১১ সুপারিশ: জাতীয় বায়োব্যাংক গঠন করা—স্বাস্থ্য গবেষণা, উন্নাবন এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য একটি কৌশলগত প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করা

বাংলাদেশে একটি জাতীয় বায়োব্যাংক গঠন করা সময়োপযোগী এবং কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত অবকাঠামোর মাধ্যমে জীববৈজ্ঞানিক নমুনা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং গবেষণার জন্য ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হবে। এর ফলে রোগনির্ণয়, নতুন ওষুধ উন্নাবন, ব্যক্তিক স্বাস্থ্যসেবা (personalized medicine) এবং জনস্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি আসবে। এই বায়োব্যাংক দেশের জন্য একটি জাতীয় সম্পদ হিসেবে কাজ করবে, যা দেশীয় গবেষণা সক্ষমতা বাড়াবে এবং আন্তর্জাতিক গবেষণায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। একইসঙ্গে, এটি দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্য খাতে টেকসই রাজস্ব সৃষ্টি করবে, যা স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগ ও উন্নাবনকে আরও শক্তিশালী করবে।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, একটি কার্যকর বায়োব্যাংক শুধু গবেষণার জন্য নয়—স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ ও অর্থায়নের একটি লাভজনক ক্ষেত্র হিসেবেও কাজ করতে পারে। ধারণা করা হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী এই খাতের বাজার ২০৩০ সালের মধ্যে ১৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। ভারত, যুক্তরাজ্য এবং দক্ষিণ কোরিয়া ইতোমধ্যে বায়োব্যাংক ব্যবহারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ওষুধ কোম্পানি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অংশীদারিত গড়ে তুলেছে, যা দেশীয় রাজস্ব আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসে পরিণত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের ক্যাপ্সার গ্রিড বায়োব্যাংক ও GenomeIndia প্রকল্প, এবং যুক্তরাজ্যের UK Biobank তথ্য ব্যবহারের বিনিময়ে গবেষকদের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করছে। এই অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, উন্নত তথ্য ব্যবস্থাপনা ও গোপনীয়তা রক্ষার নিশ্চয়তা থাকলে একটি জাতীয় বায়োব্যাংক জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বাংলাদেশ যদি জাতীয় বায়োব্যাংক গঠন করে, তাহলে এটি হবে একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ। এটি প্রমাণভিত্তিক গবেষণা ও স্বাস্থ্যনীতি তৈরিতে সহায়তা করবে, বহুজাতিক গবেষণা ও বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে, এবং বিশ্বমানের চিকিৎসা ও প্রযুক্তি উন্নাবনের সঙ্গে বাংলাদেশকে সংযুক্ত করবে। সবচেয়ে বড় কথা, জাতীয় বায়োব্যাংক স্বাস্থ্য খাতে রাজস্ব সৃষ্টির একটি নতুন ও টেকসই উৎস হিসেবে কাজ করবে, যেখানে গবেষণা ও বিনিয়োগ জনস্বার্থে কাজে লাগবে। এইভাবে, বাংলাদেশ বৈশ্বিক পর্যায়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা ও উন্নাবনের শুধুমাত্র ব্যবহারকারী নয়, বরং একজন সক্রিয় অংশীদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

স্তৰ্ণ ৩: তহবিল একত্রিকরণ এবং ঝুঁকি সমর্থয় ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করে স্বাস্থ্য অর্থায়নে ন্যায্যতা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা

একটি টেকসই, ন্যায্য ও কার্যকর স্বাস্থ্য অর্থায়ন কাঠামো গড়ে তুলতে বাংলাদেশকে একটি মিশ্র মডেল গ্রহণ করতে হবে, যেখানে সাধারণ কর রাজস্ব, সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা (Social Health Insurance) এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত খরচ ভাগাভাগিত (cost-sharing) পদ্ধতি একত্রে কার্যকর হবে। এই পদ্ধতি বৃহৎ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ঝুঁকির পুল তৈরি করবে, যা প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় সর্বজনীন প্রবেশাধিকার, বিশেষায়িত সেবায় সমতা এবং বিপর্যয়কর স্বাস্থ্য ব্যয়ের বিরুদ্ধে শক্তিশালী সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।

৯.১২ সুপারিশ: প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় শতভাগ সরকারি অর্থায়ন নিশ্চিত করা

বাংলাদেশে একটি ন্যায্য, প্রতিক্রিয়াশীল ও আর্থিকভাবে সুরক্ষিত স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে শতভাগ সরকারি অর্থায়নের মাধ্যমে সর্বজনীন ও বিনামূল্যে নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য একটি করভিত্তিক (Beveridge model) অর্থায়ন কাঠামো গ্রহণ করা প্রয়োজন, যেখানে মাত্র ও শিশুস্বাস্থ্য, টিকাদান, সাধারণ রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমসহ সকল প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা রাজস্ব থেকে অর্থায়িত হবে এবং মূলত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে প্রদান করা হবে। এই মডেল চালু হলে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যয় হাসপাতালে এবং নাগরিকরা আয়, অঞ্চল বা সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে প্রয়োজনীয় সেবার ন্যায্য অধিকার লাভ করবে।

এই মডেল বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সফলভাবে কার্যকর হয়েছে। যুক্তরাজ্যের National Health Service (NHS) প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় শতভাগ করভিত্তিক অর্থায়নের মাধ্যমে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার ও আর্থিক সুরক্ষার একটি বিশ্বমানের উদাহরণ। থাইল্যান্ডের Universal Coverage Scheme (UCS) এবং শ্রীলঙ্কার সরকারি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাও দেখিয়েছে, যখন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সর্বজনীন ও বিনামূল্যে প্রদান করা হয়, তখন স্বাস্থ্যগত বৈষম্য কমে, জনগণের স্বাস্থ্য সূচক উন্নত হয় এবং out-of-pocket ব্যয়ের ঝুঁকি উল্লেখযোগভাবে হাসপাতালে এই মডেল চালু করা হলে এটি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জনস্বাস্থের প্রতি একটি স্পষ্ট ও সাহসী প্রতিশুভি হিসেবে দেখা যাবে। এতে গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে, স্বাস্থ্যখাতে জনআশ্রয় জোরদার হবে এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার (UHC) ভিত্তি আরও মজবুত হবে। এটি হবে একটি নীতিগত মাইলফলক, যা ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য খাতে দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই পরিবর্তনের পথ তৈরি করবে।

৯.১৩ সুপারিশ: হাইব্রিড অর্থায়ন মডেল চালু করে সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি সেবায় সমতা, সক্ষমতা ও আর্থিক সুরক্ষা বৃক্ষি করা

প্রাথমিক সেবার বাইরেও, বিশেষ করে সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি সেবায় একটি হাইব্রিড অর্থায়ন মডেল চালু করতে হবে। এই মডেলে অগ্রাধিকারভিত্তিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ সেবা—যেমন মাতৃত্বকালীন সেবা, জরুরি অস্ত্রোপচার এবং দীর্ঘমেয়াদি রোগ ব্যবস্থাপনা—সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে সরকারি অর্থায়নে প্রদান করা হবে। পাশাপাশি, এসব সেবাকে সর্বার জন্য সহজলভ্য করতে সরকার মূল্যনির্ণয়স্ত্রিত পদ্ধতির মাধ্যমে বেসরকারি খাত থেকেও সেবা গ্রহণের সুযোগ তৈরি করবে। এই মিশ্র ব্যবস্থা জনগণের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করবে, সেবায় সমতা বজায় রাখবে এবং পুরো ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা ও টেকসই অগ্রগতি নিশ্চিত করবে। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা দেখায়, এই ধরনের হাইব্রিড মডেল স্বাস্থ্যসেবার ভারসাম্য রক্ষা এবং সামর্থ্য অনুযায়ী সেবায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে কার্যকর। থাইল্যান্ড দরিদ্র জনগোষ্ঠী সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে হাসপাতালে ভর্তি হতে পারে, আর উচ্চ ও মধ্যম আয়ের জনগণ নির্ধারিত সহ-অর্থায়নে সেবা গ্রহণ করে—সবই একটি একীভূত নীতিমালার অধীনে। কলম্বিয়ার স্বাস্থ্যব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি সেবাপ্রদান একই নিয়ন্ত্রিত কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হয়, যার ফলে সেবা বিভাজন করে এবং কার্যকারিতা বাড়ে। এসব মডেল দেখায়—একটি সুসংহত হাইব্রিড ব্যবস্থা স্বাস্থ্যখাতকে আরও টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলে। বাংলাদেশে এই মডেল চালু করা হলে প্রাথমিক ও জটিল সেবা উভয় ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার ও আর্থিক সুরক্ষা বাড়বে। এটি মধ্যম আয়ের জনগণের জন্য একটি সাশ্রয়ী বিকল্প তৈরি করবে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সেবা দেবে এবং সরকারি হাসপাতালের ওপর অপ্রয়োজনীয় চাপ কমাবে। এর ফলে স্বাস্থ্যব্যবস্থা আরও প্রতিক্রিয়াশীল, ব্যয়সামূল্যী এবং ন্যায্য হয়ে উঠবে।

৯.১৪ সুপারিশ: বাধ্যতামূলক সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা চালু করা এবং সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবি ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে ব্যবহৃত চিকিৎসায় আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা। অনানুষ্ঠানিক খাতকে ধাপে ধাপে অন্তর্ভুক্ত করা

বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা (Social Health Insurance - SHI) চালু করতে হবে। এই বীমার মাধ্যমে ক্যান্সার, কিডনি বিকল, জটিল অস্ত্রোপচার এবং অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি রোগ—যা বিপর্যয়কর চিকিৎসা ব্যয়ের ঝুঁকি তৈরি করে—তা থেকে আর্থিক সুরক্ষা প্রদান করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি পেশাজীবীদের বাধ্যতামূলকভাবে এই বীমায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীর ঘোথ প্রিমিয়ামের ভিত্তিতে বীমা পরিচালনা করা। একইসঙ্গে, সরকার কর্তৃক ভর্তুকি দিয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে এই বীমার আওতায় আনা। পরবর্তী পর্যায়ে টার্গেটেড ভর্তুকি ও আংশিক অর্থপ্রদানের মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করা। জার্মানি, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ভিয়েতনাম বাধ্যতামূলক প্রিমিয়াম, ভর্তুকি ও বহমাত্রিক তহবিল একীভূত করে SHI কার্যকর করেছে। ব্যুন্যাস্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক খাতে SHI চালুর পাশাপাশি কমিউনিটি-ভিত্তিক বীমার মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক খাতকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে। এসব অভিজ্ঞতা দেখায়—সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা ধাপে ধাপে চালু করা সম্ভব, এমনকি স্বল্প সম্পদের দেশেও। বাংলাদেশে SHI চালুর মাধ্যমে উচ্চ ব্যয়ের চিকিৎসা সেবায় প্রবেশাধিকার বাড়বে, ব্যয়জনিত দারিদ্র্য হাস পাবে এবং স্বাস্থ্য খাতে পূর্বানুমেয়, সমন্বিত ও স্থিতিশীল অর্থায়নের ভিত্তি তৈরি হবে। এটি সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জনের পথকে আরও স্পষ্ট, শক্তিশালী ও টেকসই করে তুলবে।

স্তৰ ৪: সম্পদের কার্যকর বরাদ্দ (Responsive Allocation of Resources) ও সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা ক্রয় (Cost-Effective Purchasing) নিশ্চিত করা

স্বাস্থ্যখাতে টেকসই এবং ন্যায্য অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হলে, বাংলাদেশকে একদিকে স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়নের পরিমাণ বাড়াতে হবে, অন্যদিকে চালু করতে হবে চাহিদাভিত্তিক ও ফলাফলনির্ভর বাজেটিং প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতিতে বাজেট বরাদ্দ জনস্বাস্থ্য চাহিদা এবং সেবার বাস্তব ফলাফলের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে—ফলে সম্পদের ব্যবহার হবে আরও কৌশলগত, লক্ষ্যভিত্তিক ও কার্যকর। এর মাধ্যমে জনগণের জন্য মানসম্মত সেবায় প্রবেশাধিকার, আর্থিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্যের অবস্থা—সব ক্ষেত্রেই দৃশ্যমান উন্নয়ন ঘটবে।।

৯.১৫ সুপারিশ: স্বাস্থ্যখাতে জিডিপির অন্তত ৫% এবং জাতীয় বাজেটের ~১৫% বরাদ্দ নিশ্চিত করা

সরকারকে এখনই স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে—সামগ্রিক জনস্বাস্থ্য ব্যয় জিডিপির অন্তত ৫ শতাংশ এবং মোট বাজেটের প্রায় ১৫ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। এই বিনিয়োগের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা বিস্তৃত হবে, ব্যক্তিগত ব্যয়ের (Out-of-Pocket Expenditure) চাপ কমবে এবং জনগণের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত হবে। পাশাপাশি, স্বাস্থ্য অবকাঠামো, জনবল, অত্যাবশ্যক ওষুধ এবং আধুনিক স্বাস্থ্য প্রযুক্তিতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি হবে। বিশ্বব্যাপী যেসব দেশ সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা (UHC) অর্জনে এগিয়ে আছে, তারা স্বাস্থ্যখাতে জিডিপির ৫% বা তার বেশি ব্যয় করছে। থাইল্যান্ড সরকার তার মোট বাজেটের ১৪%-এর বেশি ব্যয় করে UCS পরিচালনা

করছে, যা দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। বুয়ান্ডা ২০০০-এর দশকে যেখানে জিডিপির মাত্র ৪% ব্যয় করত, এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭%-এর বেশি—এই বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে দেশে মাত্র ও শিশুমৃত্যুর হার কমেছে এবং দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্যভাবে হাস পেয়েছে। বাংলাদেশেও এই মাত্রার বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, প্রতিক্রিয়াশীল ও জনগণকেন্দ্রিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে উঠবে—যা সর্বজনীন স্বাস্থ্যসুরক্ষার ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে।

৯.১৬ সুপারিশ: প্রয়োজন ও চাহিদাভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে স্বাস্থ্য বাগেটের >৫০% বরাদ্দ নিশ্চিত করা

বাংলাদেশকে একটি চাহিদাভিত্তিক বাজেট পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, যেখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, রোগ প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। মোট সরকারি স্বাস্থ্য ব্যয়ের অন্তত ৫০% প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার জন্য বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে, বিশেষ করে প্রাণ্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটাতে। বরাদ্দ নির্ধারণের সময় অবশ্যই জনসংখ্যাগত পরিবর্তন, অনু-সংক্রামক রোগের (NCDs) ক্রমবৃদ্ধি এবং প্রবীণ জনগণের স্বাস্থ্য চাহিদা বিবেচনায় নিতে হবে।

ব্রাজিলের বিকেন্দ্রীকৃত বাজেট পদ্ধতি এবং ইথিওপিয়ার স্বাস্থ্য এক্সটেনশন প্রোগ্রামসহ বিভিন্ন উদাহরণ প্রমাণ করে—চাহিদাভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ বৈষম্য কমাতে, সেবার প্রবেশাধিকার বাড়াতে এবং জনগণের দোরগোড়ায় কার্যকর সেবা পৌছে দিতে সক্ষম। এই ধরনের ব্যবস্থা স্বাস্থ্য খাতে অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং সিটেমের প্রতিক্রিয়াশীলতা বাড়ায়। বাংলাদেশেও এই পদ্ধতি চালু করতে হবে। তাহলেই প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার প্রবেশাধিকার বাড়বে, বাজেট ব্যবহারে দক্ষতা আসবে, এবং ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যয়—বিশেষ করে ওষুধ, বহির্বিভাগ ও ডায়াগনস্টিক সেবার খরচ—উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে।।

৯.১৭ সুপারিশ: বাজেট বরাদ্দে ফলাফল ও দক্ষতা ভিত্তির পদ্ধতির প্রবর্তন করে ঐতিহাসিক বাজেটিং থেকে খাপে খাপে সরে আসা

বাংলাদেশের উচিত ঐতিহাসিক বাজেটিং থেকে বেরিয়ে এসে আউটপুট ও পারফরম্যান্স-ভিত্তিক বাজেটিং ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাতে বাজেট বরাদ্দ নির্ধারিত হয় সেবার পরিমাণ, মান, রোগীর স্বাস্থ্য অবস্থা এবং ক্লিনিক্যাল গাইডলাইন অনুসরণের ভিত্তিতে। সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচিগুলো নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন করলে তারা অতিরিক্ত বরাদ্দ ও প্রগোদনা পাবে। থাইল্যান্ড NHSO-এর মাধ্যমে এই মডেল বাস্তবায়ন করেছে, যেখানে সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আউটপুট ও মানের উপর ভিত্তি করে অর্থ দেওয়া হয়। বুয়ান্ডা PBF ব্যবস্থা টিকাদান কাভারেজ ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের মতো সূচকের ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ করে। বাংলাদেশে এই পদ্ধতি চালু হলে, সীমিত সম্পদ ব্যবহার আরও কৌশলগত হবে, সেবার গুণগত মান বাড়বে, এবং ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

৯.১৮ সুপারিশ: জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা অফিস গঠন করা এবং কৌশলগত ক্রয়ক্রমতা জোরদার করা

সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা (Social Health Insurance - SHI) কার্যক্রম পরিচালনা ও স্বাস্থ্যসেবা ক্রয়ে কৌশলগত ভূমিকা পালনের জন্য বাংলাদেশে একটি স্বশাসিত জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা অফিস (NHSO) গঠন করতে হবে। NHSO-এর প্রধান দায়িত্ব হবে প্রিমিয়াম সংগ্রহ (Premium Collection), তহবিল পুলিং (Fund Pooling), সেবাদাতা চুক্তি (Provider Contracting), এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পেমেন্ট ব্যবস্থাপনা। থাইল্যান্ডের NHSO, এবং ঘানার National Health Insurance Authority (NHIA) এর অনুকরণে, বাংলাদেশে NHSO গঠিত হলে এটি SHI-এর প্রশাসনিক দক্ষতা, পুলড ফান্ড ব্যবহারে স্বচ্ছতা, এবং সেবার মান বাড়াতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

৯.১৯ সুপারিশ: প্রমাণভিত্তিক সিন্ক্রান্ত গ্রহণ এবং কার্যকরিতা ও ব্যয়-সাধারণতা বিশ্লেষণের জন্য একটি স্বাস্থ্য প্রযুক্তি মূল্যায়ন ইউনিট গঠন করা

বাংলাদেশে একটি স্বাধীন স্বাস্থ্য প্রযুক্তি মূল্যায়ন (HTA) ইউনিট গঠন করতে হবে, যা নতুন প্রযুক্তির (যেমন: ওষুধ, ডায়াগনস্টিক, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, চিকিৎসা পদ্ধতি ও কর্মসূচী) নিরাপত্তা (Safety), কার্যকারিতা (Effectiveness), ব্যয়- সাধারণতা (Cost-Effectiveness) এবং বাজেট প্রভাব (Budget Impact) মূল্যায়ন করবে। এই ইউনিট স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও NHSO-এর জন্য নীতিনির্ধারণে উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবে। যুক্তরাজ্যের NICE, থাইল্যান্ডের HITAP এবং ভারতের HTAIn এই মডেলের সফল উদাহরণ। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য প্রযুক্তি মূল্যায়ন ইউনিট চালু হলে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমবে, সর্বোত্তম প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ নিশ্চিত হবে এবং জনগণের আশ্বা বাড়বে।

৯.২০ সুপারিশ: স্বাস্থ্যখাতে জনক্রয় বিধিমালা (PUBLIC PROCUREMENT RULES) সংস্কার করা

বাংলাদেশের বর্তমান জনক্রয় বিধিমালায় নমনীয়তা ও সময়োচিততা নেই, যা ওষুধ, টিকা ও ডায়াগনস্টিক সরঞ্জাম সংগ্রহে বিলম্ব ঘটায়। স্বাস্থ্যখাতের ক্রয় প্রক্রিয়ার বিশেষ চাহিদাকে বিবেচনা করে পৃথক স্বাস্থ্য জনক্রয় বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে। বাংলাদেশেও এই সংস্কার বাস্তবায়িত হলে সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত হবে, ঘাটতি ও দেরি কমবে, এবং প্রতিটি টাকার কার্যকারিতা বাড়বে।

৯.২১ সুপারিশ: স্বাস্থ্য খাতের সকল ক্রয়ে বাধ্যতামূলক ই-জিপি চালু করা

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্যখাতের সকল ক্রয়ে বাধ্যতামূলকভাবে ই-জিপি চালু করতে হবে। এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ক্রয় প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ রেকর্ড করবে এবং রিয়েল টাইমে মনিটরিং নিশ্চিত করবে। ফিলিপাইনের PhilGEPS ও রুয়ান্ডার Umucyo ব্যবস্থা প্রমাণ করেছে, ই-জিপি ঘূষ, দুর্নীতি ও বিলম্ব কমাতে কার্যকর। বাংলাদেশে CPTU ইতোমধ্যে প্রাথমিক সাফল্য দেখিয়েছে—এখন সময় এসেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে তা পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়নের।

৯.২২ সুপারিশ: সরকারি হাসপাতালসমূহে ধাপে ধাপে আর্থিক স্বায়ত্ত্বাসন চালু করে ব্যবহারকারী ফি সংরক্ষণ ও হাসপাতালের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সরঞ্জাম ক্রয়ে ব্যবহারের ক্ষমতা দেওয়া।

সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে ধাপে ধাপে আর্থিক স্বায়ত্ত্বাসন চালু করতে হবে—প্রথম পর্যায়ে তৃতীয় স্তরের (Tertiary) হাসপাতাল থেকে শুরু করে। আর্থিক স্বায়ত্ত্বাসনের আওতায় হাসপাতালগুলিকে ব্যবহারকারী ফি (user fee) সংরক্ষণ -এর অনুমতি দেওয়া এবং সেই অর্থ মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সরঞ্জাম ও লজিস্টিকস ক্রয়ের জন্য সরাসরি ব্যবহার করার ক্ষমতা দেওয়া। প্রতিষ্ঠানের পারফরম্যান্স ও জবাবদিহিতার নির্দিষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করা। নির্ধারিত বেঝমার্ক অর্জনের পর আর্থিক স্বায়ত্ত্বাসনের পরিসর ধাপে ধাপে বাড়ানো। স্বায়ত্ত্বাসনের সাথে সাথে তাদারকি ও আর্থিক জবাবদিহিত নিশ্চিত করতে একটি শক্তিশালী নজরদারি ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। AIIMS-সহ ভারতের হাসপাতাল বোর্ড, ইথিওপিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার পারফরম্যান্স চুক্তিভিত্তিক মডেল ইতোমধ্যে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশে এই সংস্কার চালু হলে উত্তোলন উৎসাহিত হবে, প্রশাসনিক জটিলতা কমবে এবং সেবার গুণগত মান ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে।

গিলার ৫: খড়িততা দূর করা, দক্ষতা বাড়ানো, এবং সব খাতে অপচয় রোধ করা

৯.২৩ সুপারিশ: ইডিসিএলকে আধুনিক ও সক্ষম করে জাতীয় অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের উৎপাদন সম্প্রসারণ করা। সীমিত সক্ষমতার ক্ষেত্রে বেসরকারি উৎপাদকদের কাছ থেকে খরচভিত্তিক মূল্যে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের কৌশলগত কেনাকাটা নিশ্চিত করা।

অত্যাবশ্যক ঔষধ সর্বস্তরে সহজলভ্য ও সামুদ্রিক করতে হলে, Essential Drugs Company Limited (ইডিসিএল)—কে যুগোপযোগীভাবে আধুনিক ও সক্ষম করতে হবে। একই সঙ্গে, দীর্ঘমেয়াদি ও কৌশলগত চুক্তির মাধ্যমে বেসরকারি খাত থেকে ক্রয় প্রক্রিয়াকে জোরদার করতে হবে, যেন অত্যাবশ্যক ঔষধের সরবরাহে কোনো বিপ্লব না ঘটে। ঔষধে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে ব্যক্তি-পর্যায়ের খরচ কমাতে, ইডিসিএলের উৎপাদন সক্ষমতা জাতীয় অত্যাবশ্যক ঔষধ তালিকার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে সম্প্রসারিত করতে হবে। এই তালিকা হবে WHO নির্দেশনা ও দেশের স্বাস্থ্য অগ্রাধিকার অনুসারে হালনাগাদ। ইডিসিএলের সক্ষমতা যেখানে সীমিত, সেখানে স্বচ্ছ ও খরচভিত্তিক মূল্যে, দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির ভিত্তিতে বেসরকারি উৎপাদকদের কাছ থেকে ঔষধ কেনা হবে। এছাড়া, অত্যাবশ্যক না হলেও চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক রেফারেন্স মূল্যনির্তি অনুসরণ করা উচিত। ব্রাজিল ও ইথিওপিয়া এই ধরনের হাইব্রিড মডেল (সরকারি উৎপাদন + বেসরকারি কৌশলগত কেনাকাটা) ব্যবহার করে ঔষধের প্রাপ্যতা ও খরচ দুই-ই নিয়ন্ত্রণে এনেছে। WHO-এর গবেষণায় দেখা গেছে, কেন্দ্রীভূত কেনাকাটা, যৌথ দরপত্র প্রক্রিয়া এবং খরচভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি ঔষধের যৌক্তিক মূল্য নিশ্চিত করে এবং সবার জন্য সহজলভ্যতা বাড়ায়। এই সংস্কার বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে ব্যক্তি-পর্যায়ের খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে, সরবরাহ ব্যবস্থার খড়িততা দূর হবে এবং সরকারি ঔষধ তহবিলের ব্যবহারে কৌশলগত দক্ষতা বাড়বে।

৯.২৪ সুপারিশ: এপিআই (API) উৎপাদনে কর-প্রণোদন ও কৌশলগত অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দেশীয় উৎপাদন সক্ষমতা গড়ে তোলা

বাংলাদেশে ঔষধ শিল্পের স্বনির্ভরতা বাড়তে হলে Active Pharmaceutical Ingredients (API)—এর দেশীয় উৎপাদন জোরদার করতে হবে। এজন্য সরকারকে কর রেয়াত, স্বল্পসুদে খণ্ড এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) প্রণোদন দিতে হবে। বিশেষ করে যেসব প্রতিষ্ঠান জাতীয় অত্যাবশ্যক ঔষধ তালিকা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় API উৎপাদনে বিনিয়োগ করতে চায়, তাদের জন্য ভ্যাট রিফার্ন, কাঁচামাল আমদানিতে শূন্য শুল্ক, এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্যারান্টি দ্বারা দীর্ঘমেয়াদি স্বল্পসুদের খণ্ড নিশ্চিত

করতে হবে। একই সঙ্গে, যারা প্রথম কোনো গুরুত্বপূর্ণ API, বায়োসিমিলার বা বায়োলজিক উৎপাদনে সফল হবে, তাদের জন্য উন্নতাবনী পুরস্কার ও মাইলস্টোন-ভিত্তিক প্রগোদনা চালু করা যেতে পারে। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে, আন্তর্জাতিক প্রস্তুতকারকদের সঙ্গে যৌথ বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর চুক্তি গড়ে তোলা উচিত। ভারতে API পার্ক এবং চীনের দেশীয় প্রগোদনা মডেল ব্যবহার করে আমদানি নির্ভরতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো গেছে। আজ ভারত নিজ দেশে ৭০ শতাংশের বেশি অগ্রাধিকার API উৎপাদন করে। বাংলাদেশের জন্য এই সংস্কার ঔষধের দাম কমাবে, বৈদেশিক মূদ্রা সাশ্রয় করবে এবং স্বাস্থ্যখনে আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জনে সহায় করবে।

৯.২৫ সুপারিশ: ‘ন্যাশনাল ফার্মেসি নেটওয়ার্ক’ গড়ে তুলে অত্যাবশ্যক ঔষধের সহজ, সাশ্রয়ী ও ন্যায্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা

বাংলাদেশে সকল সরকারি হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং জেনারেল প্র্যাকটিশনার (GP) ক্লিনিকে ২৪ ঘণ্টা খোলা ইন-হাউজ লাইসেন্সপ্রাপ্ত ফার্মেসি চালু করে ‘ন্যাশনাল ফার্মেসি নেটওয়ার্ক (NPN)’ গড়ে তুলতে হবে, যাতে দরিদ্র ও প্রাপ্তিক জনগোষ্ঠী বিনামূল্যে অথবা ভর্তুকিমূল্যে অত্যাবশ্যক ঔষধ পায়। এই ফার্মেসিগুলোতে জাতীয় অত্যাবশ্যক ঔষধ তালিকা অনুযায়ী ঔষধের পর্যাপ্ত মজুত নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রশিক্ষিত ফার্মাসিস্ট দ্বারা পরিচালিত করতে হবে, যারা ঔষধ ব্যবহারে পরামর্শ ও যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারে উৎসাহ দেবেন। হাসপাতালে ভর্তি রোগী ও বহির্বিভাগের রোগী—উভয়ের জন্য এই ফার্মেসির সেবা প্রযোজ্য হবে। ঔষধ সরবরাহ ও বিতরণ ডিজিটাল ট্র্যাকিং করে আগাম চাহিদা নির্ধারণ এবং চুরি/অপচয় রোধ করা যাবে। শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রীয় ফার্মেসি এবং থাইল্যান্ডের ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ প্রোগ্রামের আওতাধীন হাসপাতাল ফার্মেসি ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের জন্য কার্যকর উদাহরণ। এই ব্যবস্থা চালু হলে, অনিয়ন্ত্রিত বেসরকারি ফার্মেসির উপর নির্ভরতা কমবে, সরবরাহ ব্যবস্থার স্বচ্ছতা বাঢ়বে এবং ঔষধ সরবরাহে সরকারি ব্যয়ের কার্যকারিতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

৯.২৬ সুপারিশ: হাসপাতাল ও প্রাথমিক সেবাকেন্দ্রে ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্ট নিয়োগ করে ঔষধের যৌক্তিক ব্যবহার ও ব্যয়-সাশ্রয়ীতা নিশ্চিত করা

বাংলাদেশের প্রতিটি হাসপাতাল ও প্রাথমিক সেবা কেন্দ্রে ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্ট নিয়োগ করতে হবে, যাতে ঔষধ ব্যবহারে নিরাপত্তা, কার্যকারিতা ও খরচ-সাশ্রয়ীতা নিশ্চিত হয়। তাঁদের সক্রিয়ভাবে চিকিৎসা রাউন্ডে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যেন তারা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবস্থাপনা ও ঔষধবিষয়ক পরামর্শ প্রদান করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্টের উপস্থিতি অনিয়ন্ত্রিত ঔষধ ব্যবহারের হার কমায়, polypharmacy প্রতিরোধ করে এবং চিকিৎসার মান ও ফলাফল উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে। যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডার মতো দেশে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ঔষধজনিত ভুল ও অপচয় কমেছে এবং প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। বাংলাদেশেও এই সংস্কার চালু করতে হবে। এতে চিকিৎসা খরচে সাশ্রয় হবে, সেবার গুণগত মান বাঢ়বে এবং ঔষধ ব্যবহারে দক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে—যা স্বাস্থ্য খাতে আর্থিক সুরক্ষার ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করবে।

৯.২৭ সুপারিশ: ‘ন্যাশনাল এসেনশিয়াল ডায়াগনস্টিক লিস্ট’ প্রণয়ন এবং পরীক্ষার মূল্য নির্ধারণে একটি নিয়ন্ত্রিত কাঠামো চালু করা

বাংলাদেশে ডায়াগনস্টিক সেবার মান নির্যন্ত্রণ এবং ব্যয় সাশ্রয় নিশ্চিত করতে একটি জাতীয় ‘এসেনশিয়াল ডায়াগনস্টিক লিস্ট (EDL)’ চালু করতে হবে। এই তালিকা WHO নির্দেশনা ও দেশের রোগপ্রবণতা অনুযায়ী প্রণয়ন করতে হবে এবং এটিকে সকল সরকারি ও বেসরকারি ন্যাবরেটেরিয়ার জন্য মানদণ্ড হিসেবে কার্যকর করতে হবে। এর পাশাপাশি, এসেনশিয়াল ডায়াগনস্টিক লিস্ট এর টেস্টগুলোর জন্য খরচভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে, যেখানে সেবার খরণ ও অঞ্চলের ভিত্তিতে যুক্তিসঙ্গত ভিন্নতা অনুমোদিত থাকবে—কিন্তু শহরাঞ্চলে অতিরিক্ত মূল্যের অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে। বিশ্বব্যাপী উদাহরণ থেকে দেখা গেছে, এই খরনের উদ্যোগ কার্যকরভাবে বৈষম্য কমায় ও অপ্রয়োজনীয় ব্যয় রোধ করে। ভারতের ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্টস অ্যাস্ট্রেল আওতায় অনেক রাজ্যে নির্দিষ্ট ডায়াগনস্টিক পরীক্ষার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। WHO-এর Essential Diagnostics List ইতোমধ্যেই ২০টিরও বেশি দেশ গ্রহণ করেছে, যার ফলে ডায়াগনস্টিক সেবার প্রবেশাধিকার বেড়েছে এবং ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যয় হাস পেয়েছে। বাংলাদেশেও এই ব্যবস্থা দ্রুত চালু করতে হবে। এতে প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলোর আওতা বাঢ়বে, জনগণের ওপর আর্থিক চাপ কমবে, এবং ডায়াগনস্টিক সেবায় অপচয় কমে দক্ষতা বাঢ়বে—যা একটি সাশ্রয়ী, ন্যায্য ও সমতাভিত্তিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৯.২৮ সুপারিশ: মেডিকেল ডিভাইস উৎপাদনে দেশীয় শিল্প গড়ে তোলা, ব্যয় হ্রাস এবং আমদানি নির্ভরতা কমানো

বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী স্থানীয় মেডিকেল ডিভাইস শিল্প গড়ে তোলা উচিত, যেখানে প্রাথমিকভাবে লো-কমপ্লেক্সিটি যন্ত্রপাতি যেমন রাইড প্রেসার মনিটর, প্লুকোমিটার, থার্মোমিটার ইত্যাদি উৎপাদনের ওপর জোর দিতে হবে। এই লক্ষ্যে সরকারকে টার্গেটেড ট্যাক্স ইনসেন্টিভ, স্বল্পসুদের অর্থায়ন ও আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি হস্তান্তর সহযোগিতা দিতে হবে। উৎপাদন যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানিতে কম শুল্ক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি খণ্ডের সুযোগ দিতে হবে, যাতে দেশীয় শিল্পে বিনিয়োগ টেকসই হয়। পাশাপাশি,

জটিল যন্ত্রপাতি তৈরিতে আন্তর্জাতিক উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ গড়ে তোলা দরকার। ভিয়েতনাম ধাপে ধাপে উৎপাদন কেশল ব্যবহার করে স্থানীয় মেডিকেল ডিভাইস শিল্প গড়ে তুলেছে, আর ব্রাজিল তাদের “প্রোডাকচিভ ডেভেলপমেন্ট পলিসি”—এর মাধ্যমে ৭০ শতাংশ ডায়াগনস্টিক ও থেরাপিউটিক যন্ত্রপাতির স্থানীয় উৎপাদন নিশ্চিত করেছে। বাংলাদেশে এই সংক্ষার সেবা সরবরাহ ব্যয় করবে, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করবে, সরকারি ক্রয়ের দক্ষতা বাড়াবে এবং স্বাস্থ্যখাতে স্থানীয় অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী করবে।

৯.২৯ সুপারিশ: জরুরি সেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে একটি জাতীয় অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা

বাংলাদেশে সমগ্র দেশের জন্য একটি কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত ‘ন্যাশনাল অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস নেটওয়ার্ক’ গড়ে তোলা জরুরি, যা শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত এলাকাতেও সময়মতো, মানসম্পর্ম এবং সমতাভিত্তিক জরুরি পরিবহন সেবা নিশ্চিত করবে। এই নেটওয়ার্কে থাকবে GPS-সক্ষম যানবাহন, কেন্দ্রীয় কল সেন্টার ও ধাপে ভাগ করা যানবাহন বহর, যার অর্থায়ন হবে সরকার, কপোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি (CSR) ফাস্ট ও স্বেচ্ছা অবদানের মাধ্যমে। সামাজিক ব্যবসা মডেল—ভিত্তিক বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কাভারেজ বাড়ানো যেতে পারে, যাতে অর্থনৈতিকভাবে টেকসই একটি কাঠামো গড়ে ওঠে।

ভারতের “১০৮ এমারজেন্সি মেডিকেল রেসপন্স সার্ভিস” এবং বুয়ান্তার “সামু (SAMU)” সিস্টেম এই ধরনের সরকারি সমষ্টিত অ্যাম্বুলেন্স সেবার কার্যকর উদাহরণ, যা প্রাণ বাঁচায় এবং ব্যক্তিগত পরিবহন খরচ কমায়।

বাংলাদেশে এটি চালু হলে, চিকিৎসা পেতে দেরি করবে, জরুরি সেবা পৌছাবে সবার কাছে, এবং প্রাইভেট পরিবহনের কারণে সৃষ্টি বিপর্যয়কর স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে ব্যক্তি-পর্যায়ের খরচ হাস পাবে—একটি আরও সংবেদনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক স্বাস্থ্যব্যবস্থার পথ খুলে যাবে।

৯.৩০ সুপারিশ: ওষুধ ব্যবস্থাপনা, যুক্তিসংগত ব্যবহার ও ব্যয়-সশ্রদ্ধিতা নিশ্চিত করতে সার্বিকভাবে ‘ই-প্রেসক্রিপশন’ ব্যবস্থা চালু করা
বাংলাদেশে সব সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্রে একটি কেন্দ্রীয় ‘ই-প্রেসক্রিপশন’ ব্যবস্থা চালু করতে হবে, যা প্রেসক্রিপশনের অপব্যবহার, ঔষধ ক্রয়ে অনিয়ম এবং আর্থিক অপচয় রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। এই ব্যবস্থা জাতীয় স্বাস্থ্য তথ্য অবকাঠামোর সঙ্গে সমষ্টিত হতে হবে এবং ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত করতে হবে। ই-প্রেসক্রিপশন প্ল্যাটফর্মে রিয়েল-টাইম প্রেসক্রিপশন মনিটরিং, অতিরিক্ত প্রেসক্রিপশনের জন্য স্বয়ংক্রিয় সতর্কতা, এবং ঔষধ ক্রয়ের পূর্বাভাস ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
প্রেসক্রাইবারদের জন্য ধাপে ধাপে বাধ্যতামূলক ব্যবহার এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বলছে—ই-প্রেসক্রিপশন ব্যবস্থার মাধ্যমে ঔষধ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও সাশ্রয় নিশ্চিত করা সম্ভব। এস্তেনিয়ায় এখন ১০০% প্রেসক্রিপশন ইলেক্ট্রনিকভাবে হয়, যার ফলে ঔষধের অপব্যবহার ব্যাপকভাবে কমেছে। ভারতের “National Digital Health Mission (NDHM)”—এও ই-প্রেসক্রিপশন সিস্টেম চালুর মাধ্যমে ঔষধ সরবরাহ ও স্বাস্থ্য বিমা দাবির প্রক্রিয়া একীভূত করা হয়েছে।

বাংলাদেশেও এই ব্যবস্থা দ্রুত চালু করতে হবে। এর মাধ্যমে ঔষধ খাতে সাশ্রয় নিশ্চিত হবে—যা দেশের সবচেয়ে ব্যয়বহুল স্বাস্থ্যব্যয়ের খাতে (ঔষধ) বড় পরিবর্তন আনবে। একইসঙ্গে চিকিৎসার গুণগত মান, জবাবদিহিতা ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে।।

৯.৩১ সুপারিশ: সকল সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ব্যক্তি-পর্যায়ে সেবা দানকারী চিকিৎসকদের মধ্যে প্রেসক্রিপশন নিরীক্ষা চালু করা এবং নিরীক্ষার ফলাফল ব্যবহার করে আর্থিক অপচয় রোধ ও সেবার মান উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা

সকল সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী চিকিৎসকদের (প্রাইভেট প্ল্যাকটিস) মধ্যে প্রেসক্রিপশন নিরীক্ষা (Prescription Audit) চালু করতে হবে এবং এটিকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার একটি নিয়মিত ও কাঠামোবদ্ধ কার্যক্রম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নিরীক্ষার মাধ্যমে অপয়োজনীয়, অকার্যকর বা অনর্থক ঔষধ ব্যবহারের প্রবণতা চিহ্নিত করতে হবে এবং ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। এই নিরীক্ষার ফলাফল ব্যবহার করে চিকিৎসক ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নবায়ন, অর্থায়ন, পেমেন্ট এবং ক্রয় সিন্ক্লান্টে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

দক্ষিণ কোরিয়ার HIRA (Health Insurance Review and Assessment Service) ও যুক্তরাজ্যের NHS Business Services Authority জাতীয় পর্যায়ে প্রেসক্রিপশন ট্রেন্স বিশ্লেষণ করে ঔষধ ও চিকিৎসা খাতে বহু বিলিয়ন ডলারের অপচয় রোধ করেছে। এসব অভিজ্ঞতা দেখায়—যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও তথ্যভিত্তিক সিন্ক্লান্ট স্বাস্থ্য খরচে সাশ্রয় আনে এবং চিকিৎসা সেবায় গুণগত পরিবর্তন ঘটায়।

বাংলাদেশেও এই ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু করতে হবে। এতে ঔষধ ও ডায়াগনস্টিক ব্যবহারে যুক্তিসঙ্গততা আসবে, অপব্যবহার ও অতিরিক্ত খরচ রোধ হবে, এবং একটি জবাবদিহিমূলক ও ব্যয়-কর্মক্রম চিকিৎসা সংস্কৃতি গড়ে উঠবে—যা স্বাস্থ্য খাতে সাশ্রয় ও কার্যকারিতার জন্য অপরিহার্য।

৯.৩২ সুপারিশ: জনগণের সেবা প্রাপ্তি বাড়াতে, প্রাইভেট সেবার উপর নির্ভরতা কমাতে এবং ব্যয়-সাশ্রয় নিশ্চিত করতে সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোর কার্যকাল সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত (সপ্তাহে পাঁচদিন) বর্ধিত করা।

জনগণের স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকারের সুযোগ বাড়াতে এবং প্রাইভেট সেবা গ্রহণের প্রয়োজন কমাতে, সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোর দৈনিক কার্যক্রম সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত (পাঁচদিন) বর্ধিত করতে হবে।

এই সময়সীমা প্রযোজ্য হবে আউটডোর বিভাগ, ফার্মেসি ও ডায়াগনস্টিক ল্যাবের ওপর, যাতে রোগীরা কর্মসংক্রান্ত বাইরেও চিকিৎসা নিতে পারেন। এর ফলে চিকিৎসাসেবা নিতে ছুটি নেওয়ার প্রয়োজন কমবে, ভিড় ও দীর্ঘ অপেক্ষা সময় হ্রাস পাবে, এবং কর্মজীবী মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা আরও সহজলভ্য হবে।

কেনিয়া ও তানজানিয়ায় করা গবেষণায় দেখা গেছে, সরকারি সেবার সময়সীমা বাড়ানোর ফলে প্রাইভেট সেবার উপর নির্ভরতা কমেছে এবং বিদ্যমান অবকাঠামো ব্যবহারে দক্ষতা বেড়েছে।

বাংলাদেশে এটি বাস্তবায়িত হলে, অপয়োজনীয় ব্যক্তিগত ব্যয় কমবে, সেবাদান হবে আরও মানুষ-কেন্দ্রিক, এবং সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত হবে, যা স্বাস্থ্যখাতে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করবে।

৯.৩৩ সুপারিশ: মহামারি, জলবায়ুজনিত দুর্যোগ ও অন্যান্য জরুরি পরিস্থিতিতে দুট সাড়া দিতে একটি স্বতন্ত্র ‘ইমারজেন্সি হেলথ ফান্ড’ গঠন করা।

ভবিষ্যতের মহামারি, সংক্রামক রোগের বিভাগ কিংবা অন্য যেকোনো জনস্বাস্থ্য জরুরি পরিস্থিতিতে দুট, সমন্বিত ও আর্থিকভাবে সুরক্ষিত প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করতে বাংলাদেশে একটি ‘ইমারজেন্সি হেলথ ফান্ড’ গঠন করতে হবে। এই তহবিল পূর্বনির্ধারিত ঝুঁকির মাত্রা অতিক্রম করলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সক্রিয় হবে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ দুট ছাড় করা যাবে। এই তহবিল যৌথভাবে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হবে। অর্থ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত থাকবে পূর্বপৰ্যন্ত নির্দেশিকা, জবাবদিহিমূলক নজরদারি ব্যবস্থা এবং সংক্রামক রোগের নজরদারি তথ্য বা WHO ঘোষণার ভিত্তিতে অর্থ ছাড়ের স্বচ্ছ প্রক্রিয়া।

ভিত্তেনাম তাদের "National Contingency Fund for Disease Outbreaks"—এর মাধ্যমে নজরদারি তথ্য অনুযায়ী দুট অর্থ বরাদ্দ করতে সক্ষম হয়েছে, যা তাদের সংকট মোকাবেলায় কার্যকর প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আফ্রিকান ইউনিয়নের "Africa CDC" ইতোমধ্যে একটি “Emergency Preparedness and Response Authority” প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছে, যার নিজস্ব পূর্ব-প্রস্তুত তহবিল রয়েছে।

বাংলাদেশেও এই তহবিল গঠন করতে হবে। এতে জনস্বাস্থ্য সংকটে প্রতিক্রিয়ার সময় কমবে, প্রাণহানি ও অর্থনৈতিক ক্ষতি হ্রাস পাবে, এবং দেশের স্বাস্থ্য খাতে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক স্থিতিশীলতা ও ঝুঁকিপ্রতিরোধ সক্ষমতা নিশ্চিত হবে।

৯.৩৪ সুপারিশ: পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, বাজেট ব্যবস্থাপনা ও সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে দক্ষতা জোরদারে জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে PFM-প্রোকিউরমেন্ট সহায়ক দল গঠন করা

জনস্বাস্থ্য খাতে কার্যকর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও বাজেট ব্যবহারে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো মাঠপর্যায়ের ব্যবস্থাপক ও জাতীয় পর্যায়ের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অনেকেই সরকারি ক্রয় বিধিমালা (Public Procurement Rules - PPR) এবং সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা (Public Financial Management - PFM) সম্পর্কিত পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতার অভাবে ভোগেন। ফলস্বরূপ, অনেক সময় বাজেট সময়মতো ব্যয় হয় না, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিলম্ব হয় এবং অডিট আপত্তির সংখ্যা বেড়ে যায়। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রতিটি বিভাগে এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটি বিশেষায়িত ‘PFM–Procurement Support Team’ গঠন করতে হবে। এই টিমে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় (CAG) থেকে প্রেরিত বিশেষজ্ঞ অর্থ ও ক্রয় কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকবেন। টিমটি মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ, হাসপাতাল ব্যবস্থাপক, সিভিল সার্জন এবং সংশ্লিষ্ট পরিচালকগণকে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত, বাজেট রিলিজ ও ব্যয়, টেন্ডার আন্দোলন, দরপত্র মূল্যায়ন ও চুক্তি বাস্তবায়ন পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে।

এই সহায়ক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করলে মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য বাজেট বাস্তবায়নের সক্ষমতা বাড়বে, স্বাস্থ্য পরিকল্পনার গতি ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে এবং অপ্রয়োজনীয় অডিট আপত্তি ও আর্থিক জটিলতা কমবে। একইসঙ্গে এটি স্বাস্থ্য খাতে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও অপচয় রোধে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করবে। এটি অপচয় হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং ক্রয় ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমাবে।

৯.৩৫ সরকারি হাসপাতালে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত প্রাথমিক সেবা চিকিৎসকের রেফারেল বাধ্যতামূলক করা

রেফারেল ব্যবস্থাকে কাঠামোবদ্ধ, বাধ্যতামূলক এবং কার্যকর করতে হবে। সরকারি হাসপাতালে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত প্রাথমিক সেবা চিকিৎসকের (Primary Care Provider) রেফারেলপত্র বাধ্যতামূলক করতে হবে—জরুরি চিকিৎসা ছাড়া অন্যান্য সব ক্ষেত্রে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সেকেন্ডারি ও টারিশিয়ারি হাসপাতালগুলোতে কেবল প্রয়োজনীয় রোগীদের সেবা নিশ্চিত করা যাবে, স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় দক্ষতা বাড়বে, এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে।

অনেক দেশেই রেফারেল ব্যবস্থাকে স্বাস্থ্যখাতে দক্ষতা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। যুক্তরাজ্যে NHS-এর e-Referral Service এবং NHS Pathways সিস্টেমের মাধ্যমে রেফারেল ছাড়া উচ্চতর পর্যায়ের সেবা সীমিত করা হয়েছে, যার ফলে সেবার গুণগত মান উন্নত হয়েছে এবং সম্পদের অপচয় কমেছে। থাইল্যান্ডের Universal Coverage Scheme (UCS)-এ প্রাথমিক সেবা প্রদানকারীর রেফারেল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যা সিস্টেমকে আরও দক্ষ করেছে এবং স্বাস্থ্য ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। বুয়াভায় ২০২০ সালে "Integrated National Health Sector Referral Guidelines" চালু করে রেফারেল ব্যবস্থাকে আনুষ্ঠানিক ও কার্যকর করা হয়েছে, যার ফলে স্বাস্থ্য বিনিয়োগে আরও বেশি রিটার্ন (value for money) নিশ্চিত হয়েছে। এসব অভিজ্ঞতা দেখায়—একটি শক্তিশালী রেফারেল ব্যবস্থা স্বাস্থ্যসেবার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং সম্পদের অপচয় কমায়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও রেফারেল ব্যবস্থার জন্য শক্তিশালী জনসমর্থন রয়েছে। বিবিএস পরিচালিত জাতীয় জনমত জরিপে ৭১ শতাংশ মানুষ মত দিয়েছেন—হাসপাতালে বিশেষায়িত সেবা গ্রহণের আগে প্রাথমিক সেবা চিকিৎসকের রেফারেল বাধ্যতামূলক করা উচিত। রেফারেল ব্যবস্থা কাঠামোবদ্ধ ও বাধ্যতামূলক করা হলে সরকারি হাসপাতালের সীমিত সম্পদ আরও দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহৃত হবে, অপ্রয়োজনীয় সেকেন্ডারি ও টারিশিয়ারি সেবার চাপ কমবে, এবং সেবার গুণগত মান উন্নত হবে। একইসঙ্গে স্বাস্থ্য খাতে অপচয় কমবে এবং বিনিয়োগ থেকে আরও বেশি মূল্য ফেরত (value for money) পাওয়া যাবে।

৯.৩৬ স্বাস্থ্য গবেষণায় জাতীয় স্বাস্থ্য বাজেটের কমপক্ষে ২.৫% বরাদ্দ দিতে হবে—যাতে উন্নাবন, খরচ-সাধায়িতা ও স্থানীয় সমাধান উৎসাহিত হয়

স্বাস্থ্যখাতে গবেষণা ও উন্নাবনের জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য বাজেটের অন্তত ২.৫% নির্ধারিতভাবে বরাদ্দ দিতে হবে। এই বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশে একটি গবেষণাভিত্তিক সংস্কৃতি (research-oriented culture) গড়ে উঠবে, যা স্বাস্থ্যের সকল শাখায় বিজ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত, উন্নাবনী সমাধান এবং প্রযুক্তিনির্ভর সেবা মডেল তৈরি করতে সহায়ক হবে। এই তহবিলের মাধ্যমে স্থানীয় প্রেক্ষাপটে উপযোগী ও ব্যয়-সাধায়ী স্বাস্থ্যসেবা মডেল, নতুন প্রযুক্তির সম্ভাব্য ব্যবহার, চিকিৎসা পদ্ধতির ফলাফল বিশ্লেষণ, এবং ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্ৰীৰ খরচ কমানোর উপায় খুঁজে বের করা সম্ভব হবে। উন্নাবনী চিত্তাভাবনা ও ক্লিনিক্যাল রিসার্চের জন্য উৎসাহ তৈরির পাশাপাশি, গবেষণার ফলাফল স্বাস্থ্য নীতিনির্ধারণ ও বাজেট পরিকল্পনায় কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যাবে।

বিশ্বের অনেক দেশেই গবেষণাভিত্তিক বিনিয়োগের ফলে স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ভারত, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো উদীয়মান অর্থনীতিগুলো স্বাস্থ্য গবেষণায় জাতীয় বাজেটের একটি বড় অংশ বরাদ্দ করে স্থানীয় উন্নাবন এবং প্রযুক্তিনির্ভর সাধায়ী সমাধান তৈরিতে সফল হয়েছে।

বাংলাদেশেও গবেষণায় এই বরাদ্দ চালু করতে হবে। এতে তরুণ গবেষকদের অংশগ্রহণ বাড়বে, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্বাস্থ্য বিষয়ক নীতি নির্ধারকদের কার্যকর সমন্বয় গড়ে উঠবে, এবং একটি তথ্য-ভিত্তিক, ব্যয়-কর্মক্ষম ও ভবিষ্যতমুখী স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার তিতি তৈরি হবে।

৯.৩৭ সুপারিশ: নারীর স্বাস্থ্যকে জাতীয় স্বাস্থ্য অর্থায়নের অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করে, বাজেটের একটি নির্দিষ্ট অংশ (অন্তত ৫%) নারীর জীবনচক্রভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবায় বরাদ্দ করতে হবে এবং একটি বিশেষ 'নারী স্বাস্থ্য তহবিল' গঠন করতে হবে।

নারীর স্বাস্থ্য কেবল চিকিৎসা বা একটি খাতভিত্তিক বিষয় নয়—এটি মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। এটি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ (SDG) ৩ (সবার জন্য সুস্থান্ত্রণ), SDG ৫ (লিঙ্গ সমতা) এবং SDG ১০ (অসমতা হাস)-এর সরাসরি সঙ্গে সম্পর্কিত। নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য ছাড়াও কৈশোর, গর্ভকাল, প্রসব-পরবর্তী সময় ও বার্ধক্যকালীন প্রতিটি ধাপে উপযুক্ত

সেবা নিশ্চিত না হলে স্বাস্থ্যখাতে বৈষম্য বাড়ে এবং দেশের উৎপাদনশীলতা ও প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, নারীর স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ করলে শিশু মৃত্যুহার কমে, পরিবারে স্বাস্থ্য আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে এবং নারীর আয়োজন ও কর্মসংস্থান বাড়ে। UNFPA ও WHO-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, নারীর স্বাস্থ্য সমস্যা প্রতিরোধে প্রতিটি ডলারে ৮–৯ ডলার পর্যন্ত আর্থিক সুফল পাওয়া যায়, যা এই খাতে বিনিয়োগকে অত্যন্ত লাভজনক ও টেকসই করে তোলে। অনেক দেশ, যেমন থাইল্যান্ড, কলম্বিয়া ও বুয়ান্ডা, নারী ও শিশুস্বাস্থ্যে পৃথক তহবিল বা যৌথ অর্থায়ন কাঠামো চালু করেছে। বাংলাদেশও এখন সময় এসেছে একটি পৃথক 'নারী স্বাস্থ্য তহবিল' গঠনের, যা কিশোরী স্বাস্থ্য, মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, মাতৃত্বকালীন ও প্রসব-পরবর্তী সেবা, গাইনোকলজিক ক্যান্সার প্রতিরোধ এবং বার্ধক্যকালীন যন্ত্রে ব্যয় হবে। তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গবেষণাভিত্তিক পরিকল্পনা নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে, নারীস্বাস্থ্যকে প্রজননের বাইরে এনে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনচক্রভিত্তিক কাঠামোয় রূপান্তর করা জরুরি—যা কিশোরী থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করবে। এর জন্য একটি জাতীয় নারীস্বাস্থ্য ইনসিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা গবেষণা, জনবল উন্নয়ন, নীতিনির্ধারণ এবং সেবাদানকে সমন্বিতভাবে পরিচালনা করবে। এটি শুধু নারীর মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করবে না, বরং দেশের স্বাস্থ্যবস্থাকে আরও সাশয়ী, কার্যকর ও টেকসই করে গড়ে তুলবে।

পরিচ্ছেদ ১০

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বৃপ্তির ও উন্নয়ন পরিকল্পনা

স্বাস্থ্যখাত বর্তমানে এক সংকটাপন্ন ও বৃপ্তিরকালীন পর্যায়ে রয়েছে। বৃপ্তির প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে প্রায় ২ বছর সময় লাগবে এবং একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন আন্তঃমন্ত্রগালয় কমিটির মাধ্যমে এটির বাস্তবায়ন প্রয়োজন হবে। প্রস্তাবিত পদক্ষেপগুলো (যেমন BHC কমিশন গঠন এবং BHS) স্বাস্থ্যব্যবস্থার কাঠামোগত উন্নয়ন, জবাবদিহিতা ও সমষ্ট বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। নতুন আইন প্রণয়নও জরুরি। সেক্ষেত্রে, এগুলো অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে গঠন করা অত্যন্ত যুক্তিসংগত ও জরুরি। এই উদ্যোগটি পরবর্তীতে নবগঠিত সংসদে বিল আকারে উপস্থাপন করে তার আইনগত ভিত্তি প্রাপ্ত করা যেতে পারে, যা স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায় করবে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য জরুরী ভাবে একটি পৃথক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা আইন অর্ডিন্যান্স আকারে জারি করতে হবে যা নাগরিকদের বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবে। গ্রাম পর্যায়ে ইউনিয়নে ও শহর পর্যায়ে ওয়ার্ডে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ও প্রাথমিক সেবা চিকিৎসক বা জিপি নেটওয়ার্ক তৈরী করতে হবে। এই কাজে সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/ ব্যক্তিখাত যুক্ত হতে পারবে। রেফারেল ব্যবস্থাকে কাঠামোবদ্ধ ও কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বাধ্যতামূলক ও কার্যকর করতে হবে।

বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন (BHC) গঠন : স্বল্প-মেয়াদি পদক্ষেপ হিসেবে একটি স্বাধীন ও স্থায়ী “বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন (BHC)” গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা সরকার ও সংসদকে কৌশলগত পরামর্শ প্রদান করবে এবং জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির মানদণ্ড ও গাইডলাইন প্রণয়ন করবে। কমিশন স্বাস্থ্যব্যবস্থার কার্যকারিতা, গুণগত মান ও ব্যয়-সাধায়িতা পর্যালোচনা করে উন্নয়নমূলক সুপারিশ দেবে এবং প্রধানমন্ত্রীকে জবাবদিহি করে সংসদে বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করবে। এটি ১৭টি বিভাগে বিভক্ত থাকবে, যেমন: চিকিৎসা শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, ক্লিনিক্যাল মান তদারকি, ক্লিনিক্যাল গাইডলাইন উন্নয়ন (BICE), স্বাস্থ্যসেবা মানোন্নয়ন (BHCI), নিয়ন্ত্রক সংস্থা পর্যবেক্ষণ, ল্যাব ও ডায়াগনস্টিক, ওষুধ ও খাদ্য নিরাপত্তা, বেসরকারি হাসপাতাল তদারকি, বিশেষায়িত সেবার উন্নয়ন (CASH), সহযোগী স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের উন্নয়ন, প্রথাগত চিকিৎসা, আন্তঃমন্ত্রগালয় সমষ্ট, স্বাস্থ্য প্রযুক্তি মূল্যায়ন, দুর্নীতি বিরোধী তদারকি, সেবাগ্রহীতার অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং স্বাস্থ্য আইন সংস্কার। এই কমিশনের কার্যক্রম বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও জনগণমুখী করতে সহায় করবে।

বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস (BHS) গঠন: স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি পদক্ষেপ হিসেবে স্বাস্থ্যখাতে পেশাদারিত, দক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে “বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস (BHS)” নামে একটি নতুন প্রশাসনিকভাবে স্বায়ত্তশাসিত সিভিল সার্ভিস গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এটি বিদ্যমান স্বাস্থ্য ক্যাডারসহ সংশ্লিষ্ট সব ইউনিট একীভূত করে পরিচালিত হবে এবং এর অধীনে ১১টি আঞ্চলিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ থাকবে। BHS-এর নেতৃত্বে থাকবেন একজন চিকিৎসক মুখ্য সচিব (Chief of BHS) এবং তিনজন উপপ্রধান (DCH)। প্রতিটি খাতে (জনস্বাস্থ্য, ক্লিনিক্যাল সেবা, শিক্ষা) একজন করে সচিব-সমমানের মহাপরিচালক থাকবেন। পৃথক চাকরি বিধি ও বেতন কাঠামো প্রণয়ন করা হবে। বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস (BHS) গঠনের লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত কাঠামো আইনগত ভিত্তি দিতে পারে। এই অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে বিদ্যমান স্বাস্থ্য ক্যাডার ও ইউনিটসমূহ (যেমন: DGHS, DGME, FP, Nursing, Tobacco Control, Health Economics ইত্যাদি) একীভূত করে পৃথক সচিবালয়বিহীন, Chief of BHS-এর নেতৃত্বাধীন একটি নতুন প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এতে বিভাগীয় ও মেট্রোপলিটনভিত্তিক ১১টি আঞ্চলিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, আলাদা চাকরি বিধি ও বেতন কাঠামো প্রণয়ন এবং যোগ্য BCS ক্যাডারদের BHS-এ যোগদানের বিকল্প ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

আইনের সংস্কার: রোগী সুরক্ষা, আর্থিক বরাদ্দ ও ধারাবাহিকতা, জবাবদিহিতা ও জরুরি প্রস্তুতি নিশ্চিত হবে। সকল সংশ্লিষ্ট পুরাতন আইন পর্যালোচনা ও মুগোপযোগী করা, এবং নতুন আইন প্রণয়ন জরুরি। এতে প্রস্তাবিত নতুন আইনসমূহ হল: বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন আইন; বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস আইন; প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা আইন; ঔষধের মূল্য নির্ধারণ ও প্রবেশাধিকার আইন; স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী ও রোগী নিরাপত্তা আইন; এ্যালায়েড হেলথ প্রফেশনাল কাউন্সিল আইন; হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক এক্রেডিটেশন আইন; স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন; ক্যাপ্সার নিয়ন্ত্রণ আইন; নারী স্বাস্থ্য আইন; শিশু বিকাশ কেন্দ্র আইন; বাংলাদেশ ফুড, ড্রাগ ও আইভিডি-মেডিকেল ডিভাইস আইন; ও বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল আইন। এছাড়াও নিয়লিখিত আইনসমূহের সংশোধন প্রয়োজন: বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, মেডিকেল শিক্ষা এক্রেডিটেশন আইন, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন, বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল আইন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন, পৌর ও সিটি কপোরেশন আইন ইত্যাদি।

অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের প্রাপ্যতা: সকল নাগরিকের জন্য ঔষধের সর্বজনীন প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। এই ঔষধ ক্ষেত্র বিশেষ বিনামূল্যে (যথা প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা পর্যায়ে এবং অতি দরিদ্রের ক্ষেত্রে) বা ভর্তুকি মূল্যে সরবরাহ করতে হবে। অ্যান্টি-ক্যান্সার, অ্যান্টি-ডায়াবেটিক, অ্যান্টি-হাইপারটেনসিভ ও অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের তালিকাভুক্ত অ্যান্টিবায়োটিকের ওপর ভ্যাট এবং প্রযোজ্য অন্যান্য শুল্ক ও কর শূন্য করতে হবে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের (স্বাপকম) উন্নয়ন পরিকল্পনায় পদ্ধতিগত পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ প্রস্তাব করেছে। সেক্টর ওয়াইড পরিকল্পনা (HPNSP) পরিত্যাগ করে আপৎকালীনভাবে দুই বছর মেয়াদী সীমিত প্রকল্পভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। একইসঙ্গে, দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন নিশ্চিত করতে একটি নতুন পাঁচ বছরব্যাপী পরিকল্পনা প্রণয়ন জরুরি, যাতে বর্তমান বাস্তবতা ও অগ্রাধিকারগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ১৯৯৮ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত চারটি সেক্টর প্রোগ্রামের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে পিছিয়ে থাকা অংশগুলো চিহ্নিত করে বাস্তবভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা প্রয়োজন। কমিশন মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা চিহ্নিত করে তা কাটিয়ে ওঠার জন্য নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধা গ্রহণের সুপারিশ করেছে, যাতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দক্ষতা বাড়ানো যায়। একইসঙ্গে কমিশনের সদস্যদের পরামর্শ ও সম্পৃক্ততা বজায় রাখা, এবং দেশি-বিদেশি সংস্থার কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করে কার্যকর তদারকি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এসব পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়ন প্রক্রিয়া আরও কার্যকর, সুসংগঠিত ও টেকসই হবে।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার